প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন; ১৩৬৭। প্রকাশক : জয়দেব ঘোষ, মডেল পাবলিশিং হাউস। ২এ; শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩। প্রচ্ছদ : কুমার অজিত।
মুদ্রাকর : বাবাই-পাপাই প্রেস, ৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩।

মাদ্‌মোয়াজেল দ্য মপ্যাঁ

তেওফিল গতিয়ে

ভাষান্তর

গণেশ বসু



তেওফিল গতিয়ে (১৮১১-১৮৭২ খ্রীঃ) উনিশ শতককে ফ্রান্সের শিল্প সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। এই শতকের অন্যতম বিশিষ্ট সাহিত্য-সাধক তেওফিল গতিয়ে। তাঁর জন্ম ১৮১১ সালের ৩১শে আগস্ট, ফ্রান্সের গ্যাসকনি অঞ্চলের তার্বে'তে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন গতিয়ে। তিনি একাধারে কবি, ছোট গল্পকার, ঔপন্যাসিক, ভ্রমণ-কাহিনীর রচয়িতা,

নাট্যকার, সাংবাদিক এবং সাহিত্য-চিত্রকলার সমালোচক। এমনকি ব্যালে রচনাতেও দক্ষ ছিলেন। প্রথম জীবনে গতিয়ে ছিলেন রোমাণ্টিক সাহিত্যাদর্শের কট্টর সমালোচক। পরবর্তীকালে সৌন্দর্যবাদ বা কান্তিবাদ এবং স্বভাববাদের জয়গানে মুখর হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন কলাকৈবল্যবাদের অন্যতম প্রবক্তা। মাত্র তিনবছর বয়সে গতিয়ে মা-বাবার সঙ্গে রাজধানী পারীতে চলে আসেন এবং সেখানেই জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন।

জীবনের সূচনা-পর্বে চিত্রকলা ছিল গতিয়ের শিক্ষণীয় বিষয়। পারীর শার্লমাগনে কলেজে পড়ার সময় কবি-ঔপন্যাসিক গেরাদ দ্য নারভ্যাল (১৮০৮—১৮৫৫ খ্রীঃ) এবং বোরিল (১৮০৯—১৮৫৯ খ্রীঃ)' এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। এঁদের সংস্পর্শে এসেই গতিয়ে রোমাণ্টিক সাহিত্য-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হন। এবং ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে কবিতা-রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তখন পারীতে চলছে রোমাণ্টিকপন্থী এবং ক্লাসিকপন্থীদের মধ্যে তুমুল বিরোধ-বিতণ্ডা। রোমাণ্টিক-পন্থীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জগদ্বিখ্যাত কবি-ঔপন্যাসিক-নাট্যকার ভিক্টর হুগো (১৮০২—১৮৮৫ খ্রীঃ)। গতিয়ে হুগোকে গুরু বলে মেনে নেন এবং ১৮৩০ সালে অভিনত হুগোর বিখ্যাত নাটক 'হারন্যানি'র সাফল্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। হুগোর প্রতি গতিয়ে'র শ্রদ্ধা তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অবিচল ছিল।

রোমাণ্টিক সাহিত্যাদর্শে গতিয়ে যে কতখানি বদ্ধ হয়ে ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় এসময়কার দুখানি গ্রন্থে (যথাক্রমে 'লে জেউনে ফ্রাঁস—'১৮৩৩ খ্রীঃ এবং 'লে গ্রোতেস্কু' ১৮৩৪-৩৬ খ্রীঃ)। রোমাণ্টিসিজমের প্রতি তাঁর দুর্বলতা আমরণ ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে 'হিস্তোরি দু রোমান্তিসিজম' এবং 'পোয়েতস কনতেমপোরিএমস' (উভয় গ্রন্থই প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীঃ) য়ে। ফ্রান্সের রোমাণ্টিক সাহিত্যান্দোলনের দলিল হিসেবে গ্রন্থদুটির মূল্য অপরিসীম। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি আরও একটি কারণে মূল্যবান। সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০ খ্রীঃ) ছিলেন গতিয়ে'র ঘনিষ্ঠ সুহৃৎ। এই গ্রন্থে গতিয়ে বালজাকের অন্তরঙ্গ জীবনের নানা ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন।

গতিয়ে'র প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পয়েজি'র প্রকাশকাল ১৮৩০ সাল। এর পরবর্তী দুখানি কাব্যগ্রন্থের নাম 'অ্যালবারতাস' (১৮৩২ খ্রীঃ) এবং 'কমেদি লা মোর' (১৮৩৮ খ্রীঃ)। 'অ্যালবারতাস' ভীতিপূর্ণ উদ্ভট কাহিনীতে ঠাসা। আর 'কমেদি লা মোর'-এ গতিয়ে'র মৃত্যুবিষয়ক ধারণা-কল্পনার স্ফূর্তি ঘটেছে। উদ্দেশ্যমূলক রচনা হলেও এই দুই কাব্যগ্রন্থের বর্ণনাভঙ্গিতে প্রথম শ্রেণীর কবি প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

'অ্যালবারতাস' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গতিয়ে'র সাহিত্য-ভাবনার পালা বদলের আভাস লক্ষ্য করা যায়। নাস্তিক এবং অবিশ্বাসী গতিয়ে ক্রমশ ভেতরে ভেতরে রোমাণ্টিক সাহিত্যাদর্শের লক্ষ্যহীন তাড়নায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন। 'অ্যালবারতাস'-এ পৌঁছে তিনি এক নতুন পথের সন্ধান পেলেন। এই কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাংশে তিনি ঘোষণা করলেন যে, কলাকৈবল্যই হল শিল্প-সাহিত্যের একমাত্র অভিপ্রেত। তাঁর এই

মতাদর্শ আরো সুস্পষ্ট হল তাঁর সুবিখ্যাত উপন্যাস 'মাদমোয়াজেল দ্য মোপ্যাঁ' (১৮৩৬ খ্রীঃ) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। এই উপন্যাসের মুখবন্ধে তিনি জানালেন, শিল্প-সাহিত্য কোন উদ্দেশ্যের কাছে দায়বদ্ধ নয়। তাই সাহিত্যে দুর্নীতি-সুনীতির প্রশ্ন অবান্তর। শিল্প-সাহিত্যের কাজ শুধুই বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের অকপট উন্মোচন। কলাকৈবল্যই তার মোক্ষ। উপন্যাসটির বিষয়-বিন্যাসেও এই প্রত্যয় সমর্থিত হয়েছে। পেশায় গতিয়ে ছিলেন সাংবাদিক। ১৮৩৬ সালে সুহৃৎ বালজাকের চেষ্টায় তিনি 'ক্রনিক দ্য পারী' পত্রিকায় সাংবাদিকের কাজ পান। তখনকার বিখ্যাত দুটি শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা 'লা প্রেসে' এবং 'লে মনিত্যু'তে তিনি দীর্ঘকাল ধরে নিয়মিত-ভাবে লিখতেন। ১৮৫১ সালে গতিয়ে 'রিভ্যু দ্য পারী' পত্রিকার সম্পাদক-পদে বৃত হন। ১৮৫৬ সালে 'এল আর্তিস্তে' পত্রিকায় যোগ দেন। এ ছাড়া তাৎকালিক আরো অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় তিনি নিয়মিত ভাবে সাহিত্য, শিল্প-কলা এবং নাটক-বিষয়ে প্রবন্ধ আলোচনাদি করতেন। গতিয়ে প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিক হলেও সাংবাদিকতাকে মৌলিক রচনা বিশেষ করে কাব্যসৃষ্টির পরিপন্থী বলে মনে করতেন। তিনি ছিলেন বাক্‌পটু এবং আড্ডাবাজ। সমকালীন প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। প্রথমশ্রেণীর প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও কালজয়ী রচনার সংখ্যা তাঁর খুবই কম। প্রতিভার সঙ্গে যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায় থাকা দরকার তা তাঁর ছিল না। থাকলে তিনি হ্যুগো বা বালজাকের মত সফল কবি এবং কথাসাহিত্যিক হতে পারতেন।

গতিয়ে ছিলেন ভ্রমণ-পিয়াসী শিল্পী। কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন স্থান পর্যটন করেন। বলাই বাহুল্য, দেশ ভ্রমণ তাঁর শিল্পী-মনকে নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছিল। তাঁর প্রথম দেশভ্রমণ ১৮৪০ সালে। এই সময় তিনি স্পেনে মাত্র পাঁচ মাসের জন্য বেড়াতে যান। স্পেনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁর স্পর্শকাতর কবি-মনে গভীর প্রভাব ফেলে। এই প্রভাবের ফসল 'এস্‌পনা' (১৮৪৫ খ্রীঃ)। এই কাব্যগ্রন্থে গতিয়ে'র বেশ কয়েকটি অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা আছে।

অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না বলে গতিয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাংবাদিকের জীবিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তাঁর পোষ্য ছিল অনেক। ইউজিন ফোর্ত নাম্নী এক মহিলার সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ কাল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ইউজিন গতিয়ে'র ছেলে তেওফিলের জননী। আরনেস্তা গ্রিসি গতিয়ে'র আরেক প্রেমিকা। গ্রিসির ছিল দুই মেয়ে। এদের সকলের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহন করতে হয়েছিল গতিয়ে'কেই। ফলে স্বাধীনভাবে সারস্বত সাধনার সুযোগ কখনো তিনি পাননি।

স্পেন ছাড়াও গতিয়ে ইংলণ্ড, ইতালি, আলজিরিয়া, গ্রীস, তুর্কি, রাশিয়া ইত্যাদি দেশ পর্যটন করেন। ফলতঃ তার ভ্রমণ-কাহিনীর সংখ্যাও খুব কম নয়। এ জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে 'ক্যাপ্রিসেস য়েৎ জিগজ্যাগস্‌' (১৮৪৫ খ্রীঃ), 'ভয়েজ য়ে ইতালিয়ে' (১৮৫২ খ্রীঃ), 'কনস্তান্তিনোপল্‌' (১৮৫৩ খ্রীঃ), 'ভয়েজ য়ে রাশিয়া' (১৮৬৬ খ্রীঃ) বিখ্যাত। গ্রীস দেশের ভ্রমণাভিজ্ঞতা তাঁর শিল্পী মনে সবচেয়ে বেশি ছাপ ফেলে। গ্রীস দেশের

শিল্পকলা তাঁর সাহিত্যিক মতাদর্শকে সমৃদ্ধতর করে। 'মাদমোয়াজেল'-এ যে সৌন্দর্যবাদের জয়গান তিনি করেছিলেন গ্রীসদেশের শিল্পকলা সন্দর্শনে তা আরো দৃঢ়মূল হয়। গ্রীসদেশ থেকে ফিরে গতিয়ে সরাসরি ঘোষণা করেন—শিল্পের কাজ শিক্ষাদান নয়, নয় কোন মতবাদের প্রচার। সেই শিল্পকীর্তিই হল সফল এবং শ্রেষ্ঠ যা হবে বিশুদ্ধ, নৈর্ব্যক্তিক এবং অনভিপ্রেত। শিল্পীর প্রধানতম লক্ষ্য হল আঙ্গিকের চরমোৎকর্ষ অর্জন করা। তাঁর এই বক্তব্য অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে তাঁর সুবিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'এমায়ুক্স এৎ ক্যামি' [১৮৫২ খ্রীঃ]'র সুবিখ্যাত কবিতাবলীতে। এই গ্রন্থের অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে অসংখ্য ছোট ছোট গীতিকবিতা। এগুলির প্রতিটি স্তবক অত্যন্ত সুগ্রন্থিত এবং বর্ণাঢ্য। প্রসঙ্গত 'এল আর্তি' কবিতাটি উল্লেখ্য। কবিতায় সৌন্দর্যের স্ফূর্তি যে কতখানি অমলিন হতে পারে তার বিস্ময়কর উদাহরণ কলাকৈবল্যবাদী গতিয়ের এই কবিতাটি। 'এমায়ুক্স এৎ ক্যামি'র কবিতাবলী সমকলীন কবিকুলচিত্তে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে লেকোন্ত দ্য লিসলে (১৮১৮-১৮৯৪ খ্রীঃ) এবং থিওদোর দ্য ব্যানভিল (১৮২৩-১৮৯১ খ্রীঃ) ছিলেন গতিয়ের মন্ত্রশিষ্য। এমনকি উনিশ শতকের ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শার্ল বোদলেয়ারও (১৮২১-১৮৬৭ খ্রীঃ), গতিয়ে'র কাব্যভাবনায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন (স্মরণীয়-বোদলেয়ার তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'লে ফ্লুয়ের দু ম্যাল' প্রকাশকাল ১৮৫৭খ্রীঃ, উৎসর্গ করেছিলেন গতিয়েকে)। সেকালের অপর এক কালজয়ী কবি-সমালোচক-ঔপন্যাসিক সেইন্ত বুভেও (১৮০৪-১৮৬৯ খ্রীঃ), ছিলেন গতিয়ে'র গুণমুগ্ধ। নানা কারণেই 'এমায়ুক্স য়েৎ ক্যামি' ফ্রান্সের কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ মর্যাদার আসনের দাবীদার। মহত্তম চিত্রকলার যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের আভাষ পাওয়া যায় তাকেই ছন্দোবদ্ধ শব্দের শৃংখলে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন গতিয়ে। শুধু বহিরঙ্গ নয়, সেই সঙ্গে সৌন্দর্যের অন্তর্লগ্ন সত্তাটিও আভাসিত হয়েছে গতিয়েয় কবিতায়। ফলে কবিতাগুলিতে দ্যোতিত হয়েছে এক সুদুর্লভ অধ্যাত্মবাদ। গতিয়ের সৌন্দর্যসৃষ্টির অনন্য ক্ষমতা এবং অসামান্য খেয়ালি-কল্পনা শুধু কবিতায় নয়, তাঁর উপন্যাসগুলিতেও সম্প্রসারিত। মানবচরিত্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা গভীর ছিল না। কিন্তু রূপচিত্রময় দৃশ্যের বর্ণনায় তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। যার পরিচয় ছড়িয়ে আছে 'লা ক্যাপিতেইনে ফ্রাকাসে' (১৮৬৬ খ্রীঃ) উপন্যাসে এবং অজস্র ছোট গল্পে। এই প্রসঙ্গে 'ফরচুন্যাতো' (১৮৩৬ খ্রীঃ) 'য়ুনে নিউত দ্য ক্লিওপাত্রে' (১৮৪৫ খ্রীঃ), 'এ্যারিয়া মারসেলা' (১৮৫২ খ্রীঃ)র উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশেষ করে 'লামোর্তে অ্যামোরউসে' (১৮৫৭ খ্রীঃ) গল্পসংকলনের অতিপ্রাকৃত গল্পগুলিতে তাঁর সৌন্দর্য-সন্ধানী খেয়ালি কল্পনা চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে।

ছোট বড় মাঝারি মিলিয়ে অসংখ্য গদ্য রচনার জনক গতিয়ে। এসব লেখার বেশির ভাগই প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। তিনি চিত্রকলা এবং নাটকের প্রথম শ্রেণীর সমালোচক ছিলেন।

এইসব আলোচনার একটা বড় অংশ 'লে বিউএক্সার্ত য়ে ইউরোপ' (১৮৫৫খ্রীঃ) এবং

'হিস্তোরি দ্য এল'আর্ত ড্রামাতিক য়ে ফ্রাঁস' (ছয়খণ্ডে-প্রকাশকাল ১৮৫৮-১৮৫৯ খ্রীঃ) গ্রন্থদু'টিতে স্থান পেয়েছে। নাট্যকার হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন না করলেও গতিয়ে বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্টশ্রেণীর নাটকের রচয়িতা। তিনি শুধু শ্রেষ্ঠ ব্যালে-সমালোচক ছিলেন না, ব্যালে রচনাতেও যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন।

'লে ব' থিও' ছদ্মনামে তিনি অজস্র প্রবন্ধ, রসরচনা ইত্যাদি লেখেন। শেষ জীবনে রাজকুমারী ম্যাথিলডের সঙ্গে গতিয়ে'র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাঁরই চেষ্টায় গতিয়ে গ্রন্থগারিকের কাজ পান এবং আর্থিক অনটন অনেকটাই লাঘব হয়। তিনি ছিলেন জাতশিল্পী। ফলে রাজনীতি থেকে শতহস্তে দূরে থাকবার চেষ্টা করতেন। রাজনীতি করার মত সময়ও তাঁর ছিল না। অথচ দুর্ভাগ্য হল এই যে, জীবন-সায়াহ্নে ১৮৭০ সালের যুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন এবং তারই ফলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৮৭২ সালের ২৩শে অক্টোবর নিউইলিতে দেহ রক্ষা করেন।

'মাদমোয়াজেল দ্য মোপ্যাঁ' উপন্যাসে দেহবাদকে উচ্চমূল্য দেওয়া হয়েছে। কোন নীতি নৈতিকতার রেয়াৎ না করে যৌনলিপ্সা এবং সৌন্দর্য-তৃষ্ণাকে গতিয়ে উপন্যাসের পাতায় প তায় অকপটে চিত্রিত করেছেন। ফলে একশ্রেণীর নীতিবাগীশ পাঠক 'মাদমোয়াজেল'কে অশ্লীলতাপূর্ণ রচনা বলে নিন্দাবাদ করেছেন। প্রকাশের অব্যবহিত পরেই রাশিয়ায় গ্রন্থটি নিষিদ্ধ বই হিসেবে ঘোষিত হয়। এমনকি এই সেদিনও (১৯১৭খ্রীঃ) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে 'মাদমোয়াজেল' বেআইনী গ্রন্থ হিসেবে বাজেয়াপ্ত হয়।

প্রলয় সেন

জনৈক বন্ধুকে

বন্ধু, আমার চিঠির বিরলতা নিয়ে প্রায়ই অভিযোগ তোলো। অথচ, আমি ভাল আছি, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা অটুট—এরকম একঘেয়ে কথা ছাড়া তুমি আর কি আশা করো, বলতো? তুমি আমাকে ভাল করেই জানো; এবং এও জানো এগুলো আমার বয়সের পক্ষে এতই অস্বাভাবিক আর হাস্যকর যে তার জন্য চিঠি লিখে শ'খানেক মাইল দূরে এক টুকরো কাগজ পাঠাতে মন সরে না। তাছাড়া এসব ছেলেমানুষি এখন আর পোষায় না। চারদিক থেকেই আমি ব্যর্থ। আমার জীবনে এমন কিছুই ঘটে নি যা বলতে পারি বা লিখতে পারি। কিন্তু গতানুগতিক, একঘেয়েমিতে ঠাসবুনোট এ জীবনটা বড় ক্লান্তিকর। না ঘটল নতুন কিছু, না পেলাম অভিনব আস্বাদ। গত কাল যেমন করে বয়ে এনেছিল আজকের ইঙ্গিৎ তেমনিভাবে আজকের দিনটার মধ্যে দেখতে পাই আগামী দিনের পূর্বাভাস। বন্ধু, আমি ভবিষ্যৎবাণী করতে জানি না, তবু সকাল বেলাতেই আমি নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারি সন্ধ্যাবেলায় কি ঘটবে, কি ঘটতে পারে।

সারাটা দিন আমি যেভাবে কাটাই সে হল: চিরাচরিতভাবেই আমি সকাল-সকাল ঘুম ভেঙে উঠি, প্রাতঃরাশ সারি, ব্যায়াম করি, বাইরে বেরোই, ঘরে ফিরি, খাই, কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করি অথবা পড়াশোনা করি—এবং তারপর একসময় আগের দিনের রাতের মতই বিশ্রাম নিতে যাই। ঘুমোনোর চেষ্টা করি। স্বপ্নের ঘোর লাগে, কিন্তু তা নিত্য নতুন নয়, এবং আমার বাস্তব জীবনের মতই তা জরাজীর্ণ, একঘেয়ে। নিশ্চয়ই এসব শুনতে তোমার ভাল লাগছে না, লাগতে পারে না। অথচ এভাবেই কাটছে আমার দিনগুলি রাতগুলি। এভাবেই মানিয়ে নিচ্ছি সব, যেমন খাপখাইয়ে চলতাম ছ'মাস আগেও। এখন আমি ক্লান্ত, সত্যি সত্যিই তিক্ত-বিরক্ত। তবু বলব, এর মধ্যেও রয়েছে অদ্ভুত প্রশান্তি, রয়েছে বশ্যতা স্বীকারের ঝোঁক। না, এই ক্লান্তি

একেবারে নীরস নয়, এর ভিতরেও রয়েছে মাধুর্য, সৌন্দর্য। এর সঙ্গে হেমন্তের ক্লান্ত ধূসর দিনগুলির তুলনা চলতে পারে—যে ক্লান্তি ও ধূসরতার মধ্যে আমরা গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের শেষে একটা গোপন আকর্ষণ অনুভব করি।

বহিরঙ্গ পরিচয়ে যে জীবন আমি মেনে নিয়েছি সে জীবন আমার নয়। এ-রকম জীবন যাপন করতে আমি চাই নি, এর জন্যে তৈরীও হই নি। আমার স্বপ্ন কখনো ধরা দিল না, আমার আবেগ কখনো ভাষা পেল না ওতে। অন্ততঃ আমার যে অস্তিত্ব আমি কল্পনা করি তার সঙ্গে বর্তমান জগতের কোনো মিল নেই। চারদিক বর্ণবৈচিত্র্যহীন, সংক্ষিপ্ত ও সংকীর্ণ গণ্ডিতে শুধু হতাশা আর বেদনার গান। ভবিষ্যৎ দুঃস্বপ্নে শূন্যতার হিজিবিজি, স্মৃতি শুধু শোক। ঘরে-বাইরে শূন্যতার কাতর গোঙানি, ক্লান্তিকর দিন আর রাতের শরীর কেটে টপ্ টপ্ করে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে, আর আমার চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে জল। না, এ পৃথিবীতে আমি বড়ো একা, বড়ো নিঃসংগ। হয়ত সবই আমার মনের ভুল, হয়তো এরকম জীবন যাপনের জন্যই আমি উপযুক্ত—কিন্তু আমার পক্ষে এরকম কোন সিদ্ধান্তে আসা সতিই বড় কঠিন। যদি তাই-ই আমার অদৃষ্ট হত, তাহলে আমি নিশ্চয়ই আরো সহজে এই জীবনের সংগে মানিয়ে নিতে পারতাম—নিশ্চয়ই আমাকে এত অন্তর্জ্বালা নিয়ে, বুকের ভেতর জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে এই জীবনের সংগে যুঝতে হত না।

বন্ধু, তুমি তো বরাবরই জানো আসাধারণ অভিযানের প্রতি আমার আকর্ষণ কত প্রবল—যা কিছু অভিযান, তা সে ভয়ংকর বা সুন্দর যাই হোক তার প্রতি আমার দুর্বলতা গভীর। তুমি ভাল করেই জানো কি প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে আমি ভ্রমণ কাহিনী আর উপন্যাস গোগ্রাসে গিলি। আমার মত সাংঘাতিক এবং বিচিত্র কল্পনা বোধহয় পৃথিবীতে কেউই আর করেন না। কিন্তু হায়, আমি জানি না কোন কপালদোষে আমার কখনো কোন অভিযানে বেরুনো হল না। না, কোথাও যাওয়া হয় নি। ফলে আমার কাছে এই শহরটা চরকি দেওয়া আর পৃথিবী ঘুরে আসা একই ব্যাপার। চারদিকেই আমি যেন স্পর্শ করি আমার দিগন্ত, প্রতিটি মুহূর্তে হই বাস্তবের মুখোমুখি, ক্ষণে ক্ষণে ধাক্কা মারি তাকে। আমার জীবন অনেকটা সাগর সৈকতের ঝিনুকের মতো, গাছ-জড়ানো আইভি লতার মতো, অগ্নিকুণ্ডের চারধারে ঘোরা পতংগের মত। সত্যি সত্যিই আমি অবাক হয়ে ভাবি আমার পায়ের নীচে কোন মাটি নেই, হ্যাঁ বন্ধু, যথার্থই আমি ছিন্নমূল।

জানি ভালবাসা অন্ধ করে দেয়। হ্যাঁ, অন্ধতায় মূর্ত হয় প্রেম, অথচ এটাইতো অলঙ্ঘ্য নিয়তিরই প্রাপ্য, তারই অন্ধ হওয়া দরকার।

আমার সংগী, আমার ভৃত্য, আর এক নিরেট গবেট চাষা। ঘুরেছে সে অনেক দূরের দেশে, দেখেছে অদ্ভুত জিনিস, আর যা আমার কল্পনায়, যে সৌন্দর্য আমার মানস নয়নে মেলে দেয় অপরূপ শোভা, তার বেশীরভাগই সে দেখেছে চর্মচক্ষে। তার কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করে, রাগে কাঁপতে থাকি, আর দুঃখ হয় এই ভেবে যে এক নিরেট নির্বোধের জীবনে এমন সব অদ্ভুত জিনিস সহজদৃশ্য হল যে তার

মর্ম বিন্দুবিসর্গও বোঝে না।

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে ঐ হতভাগাটার জীবনটাই আমার জীবন হওয়া উচিত ছিল। সে নিশ্চয়ই ভাবে যে আমি সুখী মানুষ—কিন্তু আমি যে কত বিষণ্ণ তা কাকে বা বোঝাই? আর আমার মন-মরা ভাব দেখে সে তাজ্জব বনে, অবাক হয়ে যায়।

এসব কথা শুনতে নিশ্চয়ই ভাল লাগে না এবং তা বলার জন্য শুধু শুধু চিঠি লেখার ঝামেলা পোয়ানো প্রায় অর্থহীন—তাই না বন্ধু? কিন্তু তুমি যখন মনে-প্রাণেই চাও আমি তোমায় চিঠি লিখি, তখন আমার মনের ভাবনা-চিন্তা দিয়েই ভরিয়ে তুলতে হবে সেই চিঠি, কারণ বলবার মত ঘটনার পুঁজি আমার নেই। হয়ত আমার বক্তব্যের মধ্যে কোন নতুনত্ব কিংবা সংলগ্নতা থাকবে না—আর এ জন্যে কাকে দোষ দেবে? নিশ্চয়ই আমাকে নয়; কেননা তুমিই তো চিঠি লিখতে তাগিদ দাও, বারবার অনুরোধ করো।

তুমি আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু; ছেলেবেলার মত রঙীন দিনের সংগী। একসঙ্গে কেটে গেছে আমাদের কত দিন, কত রাত। বহুদিন একই রকম জীবনযাপন করেছি দুজনে। নিজেদের মধ্যে চলত কত চিন্তা-ভাবনার আদান প্রদান। কত শলাপরামর্শ না করতাম, আজগুবি ভাবনায় ভরিয়ে নিতাম আমাদের ভুবন; স্বপ্নে হতাম মশগুল। কারো কাছে কেউ রেখে ঢেকে কথা বলতে পারতাম না, সবই ছিল খোলাখুলি; কি তাই না? সেজন্যে, কোনরকম সঙ্কোচ না রেখেই; আমার মাথায় যত অর্থহীন চিন্তাধারা ঘোরাফেরা করে, তার সব কিছুই পুংখানুপুংখভাবে তোমাকে জানাতে পারি।

যে উদ্যম উত্তেজনাহীন ক্লান্তির কথা তোমাকে কিছুক্ষণ আগে শুনিয়েছি, মাঝে মাঝে সেই বিরক্তির মধ্যেও একটি চিন্তাধারা ঘোরা ফেরা করে যা সুপ্ত—মৃত নয়। সবসময়ই আমার মনে সেই বিষণ্ণ নীরব ক্লান্তরাগিনীর করুণ সুর বাজে না, ক্ষণে ক্ষণে আমি যেন পুরনো দিনের সেই অস্থির মনকে ফিরে পাই। এই সকল অর্থহীন, লক্ষ্যহীন ক্ষণিক উত্তেজনার মত অবসাদকারী বোধহয় আর হয় না। সেই রকম দিনগুলিতে আমি খুব সকালে উঠি, এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ি যেন আমার হাতে আর সময় সেই—তাড়াহুড়ো করে জামাকাপড় পরি যেন বাড়িতে আগুন লেগেছে—মুহূর্তখানেক সময় নষ্ট হলেই আমার আক্ষেপ হয়। সেই অবস্থায় যে কেউ আমাকে দেখলে নিশ্চিতরূপে মনে করবে যে আমি বোধহয় অভিসারে চলেছি অথবা কোনো সোনা খোঁজার অভিযানের অভিযাত্রী। নিজেই জানি না আমি কোথায় যাব, তবু আমাকে যেতেই হবে। আমার মনে হয় কেউ যেন আমাকে বাইরে থেকে ডাকছে, মনে হয় আমার ভাগ্য বুঝি সেই মুহূর্তে সামনের রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে এবং সেই সত্য উপলব্ধি করি যে আমার জীবনের প্রশ্নের উত্তর বুঝি কিছুক্ষণের মধ্যেই স্থির হয়ে যাবে।

এই সব কথা চিন্তা করতে করতে আমি বেরিয়ে আসি, এক উদভ্রান্ত পথিকের বেশে; আমার বেসামাল পোষাক-আশাক; আমার অবিন্যস্ত চুল দেখে রাস্তার লোকেরা উপহাস করে—তারা ভাবে আমি হয়তো কোনো লম্পট—রাতের ক্লাবে অথবা অন্যত্র আনন্দ

লুটে এখন বাড়ি ফিরছি। মদ না খেয়েও আমি যথার্থই মাতাল, আমার চলার ভঙ্গি তাই টাল-মাটাল। বেওয়ারিস কুকুরের মত আমি এপাড়া-ওপাড়া ঘুরে বেড়াই, খুবই চিন্তিত এবং অতিমাত্রায় সজাগ—সামান্যতম শব্দেও আমি ঘুরে দাঁড়াই, লোকের ধাক্কা খেতে খেতে আমি এক আশ্চর্য স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি নিয়ে যেন সবকিছু দেখতে পাই। তারপর হঠাৎই আমার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে আমি ভুল করেছি আমাকে আরও দূরে যেতে হবে, বোধহয় শহরের শেষ প্রান্তে। আবার আমি ব্যস্ততার সঙ্গে যাত্রা শুরু করি, যেন শয়তান আমার পিছে ধাওয়া করেছে। আমি যেন পাখির মত উড়ে চলি, আমার ভয়ঙ্কর মুখশ্রী দিয়ে কত কিছু বলতে বলতে প্রথমে হাতদুটো উন্মত্তভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে আমি এগিয়ে যাই। ঠান্ডা মাথায় যখন আমি এইসব চিন্তা করি, তখন সত্যিই নিজের কাজে নিজে লজ্জিত না হয়ে থাকতে পারি না, কিন্তু তা সত্ত্বেও, বিশ্বাস করো বন্ধু, আমি আবার একই কাজ করা থেকে বিরত থাকতে পারি না।

যদি কেউ কোনদিন আমাকে আমার এই উদ্‌ভ্রান্ত গতিবিধির কারণ জিজ্ঞেস করে, তখন উত্তর দিতে নিশ্চয়ই আমি খুব বিব্রত বোধ করব। গন্তব্যস্থলে পেঁছনোর কোন তাড়া আমার নেই, কারণ আমার কোন গন্তব্য নেই—দেরি হবার নেই আশঙ্কা; কেননা আমার নেই কোনো সাক্ষাৎকারের সূচী। কেউই আমাকে আশা করে না, আমারও তাড়াহুড়ো করার নেই প্রয়োজন।

এটা কি তাহলে কোন প্রণয় ঘটনা, কোন অভিযান, কোন রমণী, কোন চিন্তা, কোন সৌভাগ্য, বা এমন কিছু-যা আমার জীবনে নেই, অথচ যাকে আমি এক অনুজ্জ্বল আবেগের নির্দেশে খুঁজে চলেছি? এটা কি তাহলে আমার নিজেরই সত্তার পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবার বাসনা মাত্র? এটা কি ঘর ছাড়বার, পুরনো ব্যক্তিত্ব বদলাবার কোন ইচ্ছা? নাকি এ আমার বর্তমান অবস্থাহেতু এক অনিবার্য অবসাদ এবং সেই অবসাদ থেকে মুক্তি পাওয়ার উদগ্র বাসনা? হয়তো বা একসঙ্গে সব কিছুই। তবু এ ইচ্ছা বা বাসনা; নিঃসন্দেহে মনের এক অস্বস্তিকর অনুভূতি, এক জ্বরাতুর বিরক্তি, ক্রমে যা পরিণত হয় অবসন্ন দুর্বলতায়।

অনেক সময় আমার মনে হয়েছে যদি আরো আগে শুরু করতে পারতাম আমার জীবন, বা যদি বাড়িয়ে দিতে পারতাম আমার গতি তাহলে হয়ত আমি সময়মত পেঁছে যেতাম। মাঝে মাঝে মনে হয়, যখন আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছি তখন হয়ত অন্য কেউ ভিন্ পথে হেঁটে গিয়ে ট্রাফিক জ্যাম করিয়ে আমার চলার পথে তৈরী করছে বাধা, বিঘ্ন ঘটাচ্ছে ইষ্ট সাধনে। কি রকম হতাশা আর বিষাদ যে আমাকে ঘিরে ধরেছে তা কল্পনাও করতে পারবে না। প্রতিটি মুহূর্তে আমার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে; যেন ফালা ফালা করে দিচ্ছে বুক, চোখের সামনে মাতালের মত টলছে পৃথিবী। শরীরের পাকে পাকে ক্লান্তি, শিরায় শিরায় হতাশ্বাস গোধূলি শোনিমা। ভাবি, অন্ধকারে ডুবতে ডুবতে ভাবি, আমার কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আর নেই; আমার যৌবনের দিনগুলি ফুরিয়ে আসছে, কামনা-বাসনা বুকের মধ্যে নিষ্ফল ব্যর্থতায় গুমরে গুমরে

ফিরছে আর ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। হাঙরের মতো হাঁ করে ছুটে আসছে হাহাকার। বাতাসে বাতাসে ঝরা ফুলের কান্না, হতাশা, ক্লান্তি, বিষাদ, অন্ধকার সব মিলে মিশে তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে আমার অস্তিত্ব; আমার স্বপ্ন; আমার ইচ্ছা, তবু বুঝতে পারি, অন্ধকারের ভেতর দিয়ে কে যেন এগিয়ে আসছে জীবনের গান গাইতে গাইতে। প্রাত্যহিক হতাশার মধ্যেও কে যেন সঞ্জীবনের কথা বলে, আমার ভেতর থেকে কি একটা উঠে এসে আমাকে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়, মরতে দিতে চায় না। আমার নিজস্ব কোন আশা নেই, কেননা আশা থাকতে হলে প্রথমে থাকা দরকার একটা আকাঙ্ক্ষা, আর সেই সঙ্গে চাই জীবনের অনন্ত ঘটনাপ্রবাহে নিজেকে মানিয়ে নেবার এক সহজাত প্রবৃত্তি। আমার কোন অভীপ্সা নেই, কারণ আমি সব কিছুই ইচ্ছা করি, আমি আশা করি না, আশা করা আমি ছেড়ে দিয়েছি—কোন জিনিস থাক আর নাই থাক আমার তাতে কিছুমাত্র আসে যায় না। সবকিছুই আমার কাছে সমান। তবু আমি অপেক্ষা করি, ধৈর্য ধরি। কিন্তু কেন, কিসের জন্য ? আমি জানি না, তবুও অপেক্ষা করি, আশা করি।

আমার এই প্রত্যাশা অধীর, চঞ্চল, ক্ষণিক স্নায়বিক দুর্বলতায় আত্মপ্রকাশিত। প্রেমিক যেমন তার প্রেমিকার জন্য আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করে; আমার অবস্থাও সেরকম। কিছুই ঘটেনা, প্রচণ্ড রেগে যাই; নয়তো বাঁধনভাঙা চোখের জল নিয়ে আমি বাড়ি ফিরি। স্বর্গের দরজা খুলে যাবে বলে অপেক্ষা করি, অপেক্ষা করি সেই দিনের জন্যে যেদিন স্বর্গের পরী এসে আমাকে বলবে, বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে, আর এগিয়ে দেবে আমায় সিংহাসন। স্বপ্নে দেখি রাফায়েলের ক্যানভাসের সেই অনন্যা কুমারী চিত্রপট ছেড়ে এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে, আলিঙ্গনের উষ্ণতায় করেছে বন্দী। আমার স্বর্গত আত্মীয়-স্বজন আমার জন্য অনেক অর্থ রেখে গেছেন, যা দিয়ে আমি স্বর্ণতটিনীর তরঙ্গে নেচে নেচে কল্পনার জগতে অবাধে ভেসে যেতে পারি। মাঝে মাঝে মনে হয় উপাখ্যানের হিপোগ্রিফ এসে আমাকে এক অজানা দূর দেশে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ যা কিছু আমি কল্পনা করি, তা সবই 'অভিনব'।

এ রকম ভাবনা আমাকে এত বেশী পেয়ে বসে যে বাড়ি ফিরে কোন দিন জিজ্ঞেস করতে ভুলি না, 'কেউ কি এসেছিল ? আমার কোন চিঠি আছে, বা নতুন কিছু ঘটেছে কি ?' অথবা খুব ভাল করেই জানি আমি যে সেরকম কিছুই ঘটে না; ঘটতে পারে না। তবুও যখন রোজকার মত একই উত্তর পাই 'না', তখন অবাক না হয়ে পারি না। প্রতিদিনের মতই ভেঙে পড়ি হতাশায়।

কখনো কখনো, অবশ্য খুব কম সময়েই, আরো অভিনব চিন্তা মাথায় খেলে। চমকপ্রদ বিস্ময়কর ভাবনা এত বেশী ঘুরপাক খায় যে কি বলব তোমায় ! সেই সব চিন্তা থেকে কখনো কখনো মনে ভেসে ওঠে এক তরুণীর ছবি। যৌবনোচ্ছল এক রূপসী তরুণী। তাকে আমি চিনি না, আর সেও আমাকে চেনে না। অথচ আমরা বহুবার নাটক দেখতে গিয়ে মুখোমুখি হয়েছি; কথাবার্তা বলেছি। হ্যাঁ, সেই সুন্দরীতমার সঙ্গে

মিলেছি আমি থিয়েটারে অথবা গীর্জায়। এর কথা ভাবতে ভাবতে রোমাঞ্চিত হই, বুকের ভিতর উথলে ওঠে আবেগ। খুঁজে বেড়াই তখন, শেষ ঘরটার সামনে না পেঁছুনো পর্যন্ত সারা বাড়িটা আমি তন্ন তন্ন করে দেখি—যদি তাকে পাই। কিন্তু পাই না। অথচ সেই সর্বশেষ দরজাটার সামনে পেঁছে—বন্ধু, ঘটনাটা তোমাকে বলতে আমার নিজেকেই এত উন্মাদ উন্মাদ মনে হচ্ছে—আমি আশা করি সে এসেছে এবং সে ওই ঘরটির মধ্যেই আছে। এটা আমার কোনো আত্মশ্লাঘা নয়। মহিলা সম্বন্ধে আমি এতই উদাসীন যে তাদের মধ্যে কেউ কেউ যে আমার প্রতি সত্যিই আকৃষ্ট (অন্তত অন্যরা আমাকে তাই বলে), যাদের আমি ভেবেছিলাম আমার প্রতি উদাসীন তারাই যে আমাকে ভালবাসে, এ কথা আমি কখনই বুঝতে পারি না। অবসাদ এবং হতাশায় আমি যখন হতবুদ্ধি হই না, তখন আমার সুপ্ত অনুভূতিটি আবার আগের সব উদ্যম নিয়ে জেগে ওঠে। আমি আশা করি, ভালবাসি, আশঙ্কা করি এবং আমার আশঙ্কাগুলি এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে আমার মনে হয় সেগুলি নিশ্চয়ই প্রচণ্ড শক্তিশালী চুম্বকের মত সবকিছুকে নিজের দিকে টেনে নেবে। এই জন্য, যা আমি চাই, তা খুঁজতে না বেরিয়ে আমি তার জন্য অপেক্ষা করি এবং প্রায়শঃই আমার আশার অনুকূল বহু সুযোগই হেলায় উপেক্ষা করি। অন্য লোক হলে প্রিয়তমাকে প্রণয়-পত্রে প্রেম-নিবেদন করত এবং তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সুযোগ খুঁজত, আমি সেখানে কোনো অজ্ঞাত দূতকে বলব এক না-লেখা চিঠির জবাব এনে দিতে এবং আমার অফুরন্ত সময় কাটিয়ে দেব প্রিয়তমার সাথে মিলিত হবার অদ্ভুত, অস্বাভাবিক এবং অবাস্তব সব স্বপ্নে। সেই স্বপ্নময়ী প্রণয়িনীর কাছে কিভাবে নিজেকে উপস্থিত করব এবং আমার মনের সব-সব গোপন ইচ্ছা তাকে জানিয়ে বলব—'আমাকে সেই মহিলাটির কাছে নিয়ে চলো।' বন্ধুদের অনেক সময় এইটুকু বলেই বাকি আলাপটা আমি কল্পনা করে নিতে পারি—যেন দেখতে পাই উপাখ্যানের মতনই দৃষ্টি বিনিময় করে আমাদের আলাপ শেষ হচ্ছে।

এত কিছু শোনার পর হয়তো তুমি আমাকে নিরস্ত করতে চাইবে—অবশ্য এ ব্যাপারে আমি যথেষ্ট বিচারশীল আমার অর্থহীন চিন্তাভাবনাকে কাজে রূপান্তরিত করার দুঃসাহস আমি করি নি—সেই সব চিন্তার স্থান আমার ফাঁকা মনটির ভেতরে—লোক চক্ষুর অন্তরালে। ঠাণ্ডা মাথার যুবক বলে লোকসমাজে আমার খ্যাতি আছে। আছে এই প্রচলিত বিশ্বাস যে আমি স্ত্রীলোক সম্বন্ধে উদাসীন অথবা আমার বয়সে যা যা ইচ্ছা থাকা উচিত, তার কোনটারই প্রতি আকৃষ্ট নই। পৃথিবীর বিচার যেরকম ভ্রান্ত আমার সম্বন্ধে বিশ্বাসগুলিও তেমনি ভুল।

তবু আমার এই ধারাবাহিক হতাশার মধ্যেও কিছু কিছু ইচ্ছা পূরণ হয়েছে, এবং তা থেকে আমি যে আনন্দ লাভ করেছি, সেই আনন্দই আমাকে অন্যান্য ইচ্ছাপূরণের সম্পর্কে আশাবাদী করে তুলেছে। তোমার কি মনে পড়ে বন্ধু নিজস্ব একটা ঘোড়া পাওয়ার জন্য আমার কি রকম একটা ছেলেমি-ইচ্ছা ছিল? কয়েকদিন আগে মা আমাকে একটা ঘোড়া দিয়েছেন। তার গায়ের রঙ আবলুস কাঠের মতো কালো, মাথায়

উপর ছোট্ট একটা সাদা তারা, ঝলমলে কেশর, চকচকে চামড়া আর সুন্দর পা—ঠিক যেরকমটি আমি চেয়েছিলাম, এ হল তাই। যখন আমি প্রথম তাকে পেলাম, তখন এমনই হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম যে প্রায় পনেরো মিনিট আমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপর একসময় ওর পিঠে চড়লাম, এবং কোন কথা না বলে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে সারা শহরটা ঘুরে বেড়ালাম। কী এক অব্যক্ত অনুভূতিতে যে আমি সময়টা কাটিয়েছিলাম, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে রোজই আমি একই কাজের পুনরাবৃত্তি করতাম এবং এখনো আমি ঠিক বুঝতে পারি না, সে কেন তখন খোঁড়া হয়ে গেল না অথবা ভেঙে পড়ল না। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার উৎসাহে ভাঁটা পড়তে লাগল। প্রথমে আমি লাফ দিইয়ে নিতাম ঘোড়াটাকে, তারপর হাঁটাতাম, এবং তারপর ওর পিঠের উপর এতই উদ্যমহীনভাবে উঠে বসতাম যে ও সেটা লক্ষ্যও করত না। আমার আনন্দ এত অল্প সময়ের মধ্যে অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল যে আমি তা বিশ্বাসই করতে পারি না। ঘোড়াটার নাম দিয়েছি ফারাগস। আমার কাছে ওর চেয়ে আকর্ষণীয় প্রাণী আর পৃথিবীতে নেই। সে হরিণের মতো ক্ষিপ্রগতি এবং ভেড়ার মতই শান্ত। এখানে এলে তুমি ওর পিঠে চড়ার আনন্দ উপভোগ করতে পারবে। যদিও ঘোড়ায় চড়ার উৎসাহ আমার আগের চেয়ে এখন অনেক কম, তবু ফারাগসকে আমি এখনো খুবই ভালবাসি। অনেক লোকের চেয়েও ওকে আমি বেশী ভালবাসি। তুমি যদি জানতে কী উল্লাসে সে ডাক পেড়ে আমাকে অভিনন্দন জানায়। যখন ওকে আমি দেখতে যাই, তখন যে কী প্রদীপ্ত চোখ তুলে সে আমাকে দেখে। আহ্, এ ভোলা যায় না; বর্ণনা সাধ্যাতীত। স্বীকার করতে আমার বাধা নেই যে তার প্রভুভক্তির নিদর্শন দেখে আমি সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়ি এবং তাই আমি ওর গলায় হাত বুলোতে বুলোতে ওকে এমন চুমু খাই যেন সে কোন সুন্দরী মেয়ে।

এ ছাড়াও আমার আরেকটা জোরালো অথচ জ্বলন্ত ইচ্ছা ছিল। সেই ইচ্ছা আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়, সব সময়েই মনে উঁকি ঝুঁকি দেয়। এবং নিজের মনের নিভৃত কোণের সেই ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে আমি কত রঙিন স্বপ্নজালই না বুনেছি, গড়েছি কত তাসের ঘর। বারবার সে ঘর ভেঙে গেছে—প্রতিবারই অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সেই ঘর আমি আবার তৈরী করেছি। সেই ইচ্ছা কি হল—আমার একজন প্রণয়িনী চাই—হ্যাঁ, ফারাগাসের মত যে সম্পূর্ণরূপে শুধু আমার হবে। জানি না, এ স্বপ্নের রূপায়ণে আমি প্রথমবারের মতন হতবুদ্ধি হয়ে যাব কিনা—তবে মনে হয় আমার এ আশংকা অমূলক ঃ খুব শীঘ্রই সে হয়ত আমাকে ক্লান্ত করে দিত। আসলে আমার আশংকার মাত্রা এতই প্রবল এবং আমি কোনোরকম চেষ্টা না করেই অভীষ্টকে এত প্রবলভাবে পেতে ইচ্ছা করি যে যদি কোনক্রমে তাকে পেয়ে যাই তাহলে এমন মানসিক অবসাদ আমাকে ঘিরে ধরে যে আমি ঈপ্সিতকে ভোগ করবার শান্তিটুকুও হারিয়ে ফেলি। সেইজন্য যে সব জিনিস আমি পাওয়ার ইচ্ছা না করতেই পেয়ে যাই তারাই আমাকে বেশী আনন্দ দেয়—আর যাদের আমি সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে কামনা করি—তারা আমাকে বিন্দুমাত্র সুখ দেয় না।

আমার বয়স এখন বাইশ। এখনও অবধি আমার কোনো প্রণয়িনী নেই এবং আমার খুব ইচ্ছা হয় আমার একজন প্রণয়িনী হোক! আশ্চর্যজনকভাবে, তার চিন্তা আমাকে বিব্রত করে, এ তো কোনো প্রবৃত্তির ফেনিল আত্মপ্রকাশ নয়—নয় বয়ঃসন্ধির অভিলাষ। আমি কোনো নির্দিষ্ট প্রণয়িনীকে চাই না, আমি চাই একজন মহিলা। এক গোপন প্রিয়াকে। আমি চাই—এবং আমি তাকে পাব। যদি না পাই, তবে স্বীকার করি, এই চেয়েও না পাওয়া আমার জীবনে তার নৈরাশ্যব্যঞ্জক প্রতিলিপি রেখে যাবে। এই হতাশাকে আমি একদিক দিয়ে আমার ব্যর্থতা বলেই মনে করব—আমার হৃদয় এবং মন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে—কেন না আমার দাবী তো খুবই নগণ্য—প্রত্যেক মানুষই তা প্রকৃতির কাছে আশা করতে পারে। যদি আমি আমার অভীষ্ট না পাই, তাহলে আমি নিজেকে শিশু বলেই মনে করব এবং আমার যে আত্মবিশ্বাস থাকা উচিত তা হয়ত হারিয়ে ফেলব।

আমি এমন অনেক পুরুষ দেখি যাদের স্বভাব চরিত্র কোনদিক থেকেই ভাল নয়। একেবারে হতচ্ছাড়া গোছের; স্ত্রীরা এত সুন্দরী যে সেই সব লোক তাদের চাকর হবারও যোগ্য নয়। তাদের এবং অবশ্যই আমার কথা চিন্তা করে আমার চিবুক লাল হয়ে ওঠে। এই সব মহিলারা যে কেমন করে কোন দায়িত্বশীল এবং যথার্থই প্রেমিকের পত্নী না হয়ে কতগুলো দুশ্চরিত্র লম্পটের কাছে ধরা দিয়েছেন—ভাবলে নারীজাতির প্রতিই আমার ঘৃণা জন্মায়। প্রশ্ন জাগে, যারা তাঁদের সত্যিই ভালবাসতে পারে, নতজানু হয়ে তাঁদের রূপ পূজো করতে চায়, তাদের কাছে কি এঁরা আসতে পারেন না? এ কথা হয়তো সত্য যে প্রথম শ্রেণীর পুরুষেরা যখন ঘন ঘন বৈঠকখানায় গিয়ে কৌচের পেছনে হয় দৃপ্ত পদচারণা করেন, নয়ত তাতে গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নেন, তখন আমি হয়তো ঘরের কোণায় একাকী জানালায় মাথা ঠেকিয়ে কুয়াশার উত্থান লক্ষ্য করি। সেই সঙ্গে আমার হৃদিকন্দরের নিভৃততম কোণে স্বর্গীয় সুরভিতে আমোদিত হয়ে আমার মানসী প্রতিমার ছবিটিও ধীরে ধীরে ঘুম থেকে জেগে ওঠে। সে হয়ে ওঠে আমার তখন ঘুম ভাঙানিয়া, সুখ জাগানিয়া। আমার এরকম ভাবনা কাব্যিক হলেও, মনে রেখো, এর প্রতি নারীর কোন আকর্ষণই নেই।

যারা চিন্তাশীল, তাদের প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ খুব কম হয় এবং যারা তাদের চিন্তা-ভাবনাকে কাজে রূপ দেয় তাদের বেলাতেও মেয়েদের কোন টান থাকে না। আসলে মেয়েরা মনন-টননের ধারই ধারে না। অবশ্য এটা তাদের ভুলও নয়। সমাজের রীতি-নীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের চিরকাল চুপ করে থাকতে, অপেক্ষা করতে শিখিয়েছে। তাই যে পুরুষ গায়ে পড়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করে তাদেরই ওরা পছন্দ করে বেশী। তোযামুদে লোকদেরই ওরা আমল দিতে চায়। এ সব আমি বুঝি, ভালমতই জানি মেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, তবু জীবনে আমি কখনো, সেই রকম লোকের মত, বৈঠক-খানার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে হেঁটে গিয়ে স্তাবকের মত, উপবিষ্টা কোনো তরুণীকে বলতে পারি না—"তোমার পোষাকটা বেশ সুন্দর", অথবা, "আজ রাতে তোমায় সত্যিই অপূর্ব লাগছে।"

কিন্তু এই সব, আমার মনে, একজন প্রণয়িনী পাবার ইচ্ছাকে কখনই পরিবর্তন করতে পারে না। আমি জানি না সে কে হবে, কিন্তু যাদের দেখা আমি পাই, তাদের মধ্যে কাউকেই আমি আমার মনের সিংহাসনে বসাতে পারি না আমার কল্পনার মেয়েটির সঙ্গে এদের মিল খুব সামান্য। এদের মধ্যে যারা অল্পবয়সী, তারা হয় সুন্দরী নয়—যারা যুবতী এবং সুন্দরী তারা নীচ এবং কুচরিত্রা অথবা লাজুক—সেই সব কিছু না হলেও এদের প্রত্যেকরই হয় স্বামী, নয় ভাই, নয়তো অত্যন্ত সতর্ক একজন মাসী-পিসী আছেন। পুরুষের পক্ষে তার রূপসুধা পান করতে হলে সবচেয়ে আগে এই অতি সাবধানী অভিভাবকের বেড়াজাল থেকে প্রণয়িনীকে মুক্ত করতে হবে। এটা আমার খুবই অস্বস্তিকর বলে মনে হয়, এবং এত কিছু করার মত ধৈর্যও আমার নেই।

মায়েদের আমার ভাল লাগে না, ছোট মেয়েদের আরও কম। আমাকে এ কথাও অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের প্রতি আমার আকর্ষণ খুবই সামান্য। যে নারীর স্বামী আছে, তার সঙ্গে প্রণয়-সম্পর্ক করতে আমার মনটা কিরকম বিদ্রোহ করে ওঠে। স্বামী অথবা প্রণয়ী—যে কোন একজনের কাছে সেরকম নারী নিঃসন্দেহে গণিকা—হয়ত বা দু'জনের কাছেই। তাছাড়া আমি কখনই নিজে থেকে অপর ব্যক্তিকে আমার জায়গা ছেড়ে দিতে স্বীকৃত হব না। সেরকম অপমান আমার স্বাভাবিক দম্ভ সহ্য করতে পারবে না। সেরকম স্ত্রীলোকের কাছে আমি কখনই যেতে পারব না। এমনকি যদি সেই নারীর দেহের উপর পা রেখে দু'জনে তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হই, তাহলেও আমি বিরত থাকব। লুকোনো সিঁড়ি, আলমারি, সাক্ষাতের গোপন ঘর—অর্থাৎ ব্যভিচারের সব রকম উপকরণই আমার পক্ষে অনুপযুক্ত।

কুমারীর সারল্য, নিষ্কলঙ্ক জীবন, হৃদয়ের পবিত্রতা—কথাগুলির প্রতি আমার আকর্ষণ যৎসামান্য—তাদের প্রয়োগ কবিতার স্বপ্নময়তায় সার্থক। আমি তাদের বলি—অর্থহীন, বোধহীন, অন্ধতা। যে কুমারীর সারল্য বলতে বোঝায় কোচের কোণে চুপ করে, শরীরের সাথে হাত সেঁটে, একদৃষ্টিতে অন্তর্বাসের দিকে তাকিয়ে থাকা এবং পিতামহের কাছে অনুমতি নিয়ে কথাবলা, যে নিষ্পাপ জীবনের প্রকাশ ঘটে সোজা চুলের একচ্ছত্র আধিপত্যে, সাদা পোষাকের বহুলতায়, সরু গলা এবং স্তনের অনুন্নততা ঢাকতে উঁচু, প্যাড লাগানো কাঁচুলি পরাই যেখানে হৃদয়ের পবিত্রতা বোঝায়—সেরকম সারল্য, নিষ্কলুষতা অথবা পবিত্রতা আমাকে তেমন আনন্দ দেয় না।

তাই তাদের মাধ্যমে ভালবাসার বর্ণপরিচয় পড়ার মত নির্বোধ অন্তত আমি নই। আমি এখনও এমন কামুক বা লম্পট হইনি যে তাদের থেকে প্রভূত আনন্দ লাভ করব। সেরকম করার চেষ্টা করলেও আমি যে খুব সাফল্য অর্জন করতে পারতাম তা বলতে পারি না। কেননা কখনো কোনো বিষয়ই ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি না, যদি সেই বিষয়ের উপর আমার পুরো দখল থাকে তাহলেও পারি না। আমি সেরকম মেয়েই পছন্দ করি যারা স্বচ্ছন্দে সব কিছু পড়তে পারে,—কারণ তাহলেই অধ্যায়ের

শেষ পর্যায়ে তড়িঘড়ি পেঁছুনো যায়—এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই—বিশেষ করে ভালবাসার ক্ষেত্রে—সেটাই সবচেয়ে জরুরি। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আমি হলাম সেই রাজ্যের মানুষ যারা কোন বই শেষ থেকে অর্থাৎ উল্টো দিক থেকে পড়তে শুরু করে, দরকার হলে গোড়ায় ফিরে যায়। এইভাবে পড়ার বা ভালবাসার একটা আলাদা মেজাজ আছে, অদ্ভুত আকর্ষণ রয়েছে। গল্পের শেষেও যদি পাঠকের মন সহজ থাকে, তবেই পাঠক গল্পের খুঁটিনাটি আরো পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেন—এই নিয়ম উল্টে গিয়ে অভাবিতের প্রতি নির্দেশ করে।

আপাতত আমি সরিয়ে রাখছি খুকিদের কথা, তুলে রাখছি বিবাহিতা মহিলাদের। তাদের কথা এখন নাই বা বললাম। সুতরাং বিধবাদের মধ্য থেকেই আমার প্রাণেশ্বরীকে এখন বেছে নিচ্ছি। হায়! আমার এই আশংকা বড় বেশী যে তাদের ভিতর থেকেও হয়তো আমি আমার মনের মত মহিলা খুঁজে পাব না।

সদ্য বিগত স্বামীর মার্বেল পাথর গ্রথিত স্মৃতিস্তম্ভের উপর বিষণ্ণ মুখে হেলান দিয়ে অশ্রুর উষ্ণ আভাস যাদের চোখে মুখে পরিস্ফুট, সেরকম সদ্য ফোটা ধূসর নারসিসির একজনকে যদি আমি ভালবাসতাম, তাহলে নিশ্চিতভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমি সেই বিধবা পত্নীটির মতই অসুখী হয়ে উঠতাম। যতই তরুণী এবং আকর্ষণীয়া হোক না কেন বিধবাদের জীবনে একটা ভীষণ অসুবিধা আছে, যা অন্য কারো নেই। ভালবাসার উজ্জ্বল নীল আকাশে কিছুমাত্র মেঘের সঞ্চার হলেই তারা তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে এমন বিশেষণ আরোপ করে, অত্যন্ত অনুযোগ করে বলবে—'ওগো! আজ তুমি আমাকে আমার বিগত মানুষটির কথা বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছ। যখন আমরা ঝগড়া করতাম তখন সেও ঠিক তোমার মতনই ব্যবহার করত—এটা খুবই বিস্ময়কর যে তোমার কথাবার্তায়, এমন কি ছবিটিতে পর্যন্ত আমি তার প্রতিচ্ছায়া দেখতে পাচ্ছি। তুমি যখন রেগে যাও, বললে বিশ্বাস করবে না গো, কিরকমভাবে তুমি আর আমার হারানো স্বামী এক হয়ে যাও।' অন্যের মুখে এরকম কথায় মিষ্টতা আছে বটে। এদের মধ্যে কয়েকজন আবার আরও এগিয়ে যায়—তোমার সামনেই তারা স্মৃতিস্তম্ভের উপর উৎকীর্ণ লিপির মতন বিগত স্বামীর গুণগান গাইতে আরম্ভ করবে, তোমার হৃদপিন্ড এবং হাত-পা'র মধ্যে তাঁর হৃদয় এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গের তুলনা করবে। এ কথাটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে নারীর এক বা একাধিক প্রেমিক ছিল, তার স্বামীকে অন্তত সেই সকল পূর্ব প্রণয়ীর কথা শুনতে হয় না। এটা কিন্তু একটা বিরাট সুবিধা। আসল কথা স্বামীদের প্রতি নারীর এক অতিরিক্ত শ্রদ্ধা আছে, যার ফলে তারা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে স্মৃতিচারণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই সব ঘটনা ভুলে যাওয়া যায় ততই ভাল। এটা ভাল করেই বোঝা যায় যে পুরুষ সবসময়ই নারীর প্রথম প্রেমিক।

এরকম সুপ্রতিষ্ঠিত (বিরূপ) সত্যের বিরুদ্ধে কোনো তর্ক থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। ব্যাপারটা এরকম নয় যে আমি ক্রন্দনরত যুবতী ও সুন্দরী বিধবার প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করি না। তাদের অবসন্নতা সাময়িক, তাদের কাঁধ ঝোলানো

সাজানো, মাথা হেঁট করা শৈল্পিক—তাদের আচার-আচরণ ঠিক যেন সাথীহারা ঘুঘু পাখিটির মত। তাদের আকর্ষণীয় দেহসৌষ্ঠব আত্মগোপন করে ক্রেপের স্বচ্ছতার আড়ালে ; তাদের হতাশার ছিনালি, দীর্ঘশ্বাস ফেলার দক্ষতা এবং সময়োপযোগী অশ্রু-পাত তাদের চোখকে এত উজ্জ্বল করে তোলে। সত্যি, মদের পরে (তার আগে না হলেও) আমি যে পানীয় পান করতে সবচেয়ে ভালবাসি তা হল যুবতীর সোনালী অথবা কালো চোখের তারায় মদির বিহ্বল একবিন্দু পরিষ্কার, স্বচ্ছ অশ্রুজল। এর বিরুদ্ধে কি কোন বাধা দেওয়া যায় ? কিছু না ; তাছাড়া কাঁদলে নারীদের এত সুন্দর মানায়। শ্বেতবর্ণ দেহ একটি কবিতাতেই রূপান্তরিত হয়ে যায়—আইভরি, তুষার এবং অবশেষে স্ফটিকবর্ণে। বিলাপ নারীদের সৌন্দর্য। এবং আমার বিয়ে না করার অন্যতম কারণ হল এই যে আমার আশংকা আমার স্ত্রীকে হয়তো আমার জন্য বিলাপ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অবশ্য এমন অনেক মহিলাও আছেন যাঁরা তাঁদের শোকের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারেন না এবং কেঁদে কেঁদে নাকের ডগা লাল করে ফেলেন, মুখশ্রী করে ফেলেন বিকৃত। এটা কিন্তু তাঁদের পক্ষে প্রচণ্ড বিপদ। মনোরম ভাবে কাঁদতে হলে নারীর যথেষ্ট মোহিনী শক্তি আর শৈল্পিক নৈপুণ্য থাকা প্রয়োজন। এসব না থাকলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে সান্ত্বনা দেবার লোক না থাকতেও পারে। এ ধরনের কোনও মহিলা তোমাকে ভালবাসলে তোমার যত আনন্দই হোক না কেন, আমি কখনোই ওই বঞ্চিতাদের মধ্যে থেকে কোন মহিলাকে বেছে নেব না এবং হৃদয়-বিনিময় করার প্রস্তাবও করব না।

আমি প্রায়ই শুনতে পাই তুমি বলছ ; 'তাহলে তুমি কাকে নেবে ? ছোট মেয়েদের তুমি চাও না, বিবাহিত নারী অথবা বিধবাতেও তোমার অরুচি। মায়েদের তুমি ভালবাস না, সুতরাং আশা করতে পারি ঠাকুরমা দিদিমাদের প্রতিও তোমার কোন আকর্ষণ নেই। আচ্ছা, তুমি তাহলে সত্যি সত্যিই কাকে ভালোবাস ?'

এখনো পর্যন্ত কোন রমণীকেই ভালবাসিনি, কিন্তু আমি ভালবেসেছি এবং এখনো ভালবাসি—"ভালবাসা"কে। যদিও অদ্যাবধি আমার নেই কোন প্রেমিকা, এবং যে সব মহিলার সঙ্গে হয়েছে আমার প্রণয়-সম্বন্ধ তারা আমার কামনাকেই অধিকতর উজ্জীবিত করে তুলছে মাত্র, তবু আমি বিশ্বাস করি, আসল ভালবাসাকে আমি চিনতে পারব। আমি কখনো এই মহিলা কখনো ঐ মহিলা, এক ছেড়ে আর এক—এরকম কাউকে ভালবাসি নি। অথচ আমার ভালবাসার পাত্রী নিশ্চয়ই আছে, কোথাও না কোথাও তাকে খুঁজে পাবই। যদিও তাকে দেখিনি এখনো, দেখার সুযোগ আসে নি, তবু বিশ্বাস করি সে আছে, সে আছে। তার সঙ্গে দেখা হলে তাকে আমি চিনতে পারব, চিনবই তাকে।

অনেক সময়েই তাকে মনে মনে ভাবি, কাছে পেতে চাই। চোখের সামনে দেখি তার অবস্থান, তার পোষাক-আশাক। মনে মনে এঁকে নেই তার চুলের গোছা। শুনতে পাই ওর কণ্ঠস্বর—যে স্বরে খেলে জলতরঙ্গের সুরমূর্ছনা, হ্যাঁ হাজার লোকের ভিড়েও আমি ওকে আলাদা করতে পারি, ওকে চিনতে পারি, এবং যদি কোন কারণে ওর নাম

উচ্চারিত হয়, আমি ঘুরে দাঁড়াব—স্বপ্নে আমি তাকে যে পাঁচ-ছটা নাম দিয়েছি, তার যে কোন একটি তার না থাকা অসম্ভব।

তার বয়স হবে ছাব্বিশ বছর, বেশীও না, কমও নয়।

সে খুব সরল হবে না, হবে না আনন্দক্লান্তও।

তার বয়স হচ্ছে ভালবাসার শ্রেষ্ঠ সময়—সে ভালবাসা নয় অপরিণত, নয় তা কামুকের ভালবাসা। তার উচ্চতা হবে মধ্যম—দীর্ঘাঙ্গিনী অথবা ক্ষুদ্রাঙ্গিনীদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। আমি আমার প্রিয়তমাকে সোফা থেকে খাট পর্যন্ত যেন বয়ে নিয়ে যেতে পারি: অবশ্য তাকে সেখানে দেখলে আমি অসন্তুষ্টই হব। পায়ের উপর দাঁড়ালে তার মুখ যেন আমার চুম্বনের আয়ত্তে আসে। তাকে অবশ্যই সুন্দর দেহের অধিকারিণী হতে হবে—রোগার চেয়ে মোটা হলেই আমি বেশী পছন্দ করব। এই ব্যাপারে আমার ধারণাগুলি কিছু মাত্রায় তুর্কীদেশীয়—এবং যেখানে আমি ভাঁজ আশা করি, সেখানে হাড় পেলেও আমি বেশী কিছু মনে করব না। নারীর দেহ হবে পরিপূর্ণ, তার মাংসকে হতে হবে অপক্ক ন্যাশপাতির মত শক্ত ও দৃঢ়—ঠিক সেরকম-ভাবেই আমার প্রণয়িনী গঠিত হবে। সে হবে সুন্দর—কাজলকালো চোখে, স্বর্ণসুন্দরীর মত, সে হবে সত্যিই এক ব্রুনেট। তার হাসিতে থাকবে এক উজ্জ্বল লালিমা। তার অধরোষ্ঠ হবে পূর্ণ, তার গ্রীবা ছোট এবং গোল, তার কব্জি হবে সরু; আজানুলম্বিত হবে দুই হাত। তার চলনে থাকবে সাপের গতির সৌন্দর্য; তার কোমর হবে শক্ত এবং চলনশীল। তার হবে চওড়া কাঁধ, এবং কোমল পালকে ঢাকা থাকবে তার গলার পশ্চাদ্দেশ। একাধারে সে হবে অনুপমা, অন্যদিকে হবে শক্ত সমর্থ, সুচারু, প্রাণময়ী, কাব্যিক এবং বাস্তব—ঠিক যেন রুবেনের চিত্রপট।

আমি তাকে কোন আংটি অথবা বালা দিয়ে কখনই সাজাব না—তার পোষাক হবে ভেলভেট অথবা কিংখাব এবং খুব কমই আমি তাকে সাটিনের কাপড় পরতে অনুমতি দেব। কাপড়ের চেয়ে আমি সিল্কের স্কার্টই বেশী পছন্দ করব—তার মাথায় আমি ফুল অথবা সাধারণ 'বো' না দিয়ে দেব চুণী কিম্বা পালকের বাহার। আমি জানি, সুতী-কাপড়ের অন্তর রেশমী কাপড়ের অন্তরের মতনই রুচিকর, তবু আমি রেশমী কাপড়ই বেছে নেব। তাই আমার স্বপ্নে অধিকাংশ প্রেমিকাই হয়েছে রাণী, সম্রাজ্ঞী, রাজকুমারী, সুলতানা; অথবা বেশ্যারা কিন্তু কখনোই দরিদ্র স্ত্রীলোক অথবা ভেড়াচরাণীরা নয়। আমার সবচেয়ে উদভ্রান্ত বাসনার মধ্যেও আমি কখনো দারিদ্র্যের কথা কল্পনা করি নি। সৌন্দর্যকে আমি সেই হীরের সঙ্গে তুলনা করি যাকে সোনা মুড়ে রাখতে হয়। আমি এমন কোন সুন্দরী যুবতীর কল্পনা করতে পারি না যার গাড়ি নেই, ঘোড়া নেই, চাকর নেই। বিশ্বাস করি সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলে ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য ছাড়া রূপের কোন দাম নেই, আবার রূপ ছাড়া নেই ঐশ্বর্যের মূল্য। ঐশ্বর্য আর সৌন্দর্য হাত ধরাধরি করে চলে, একে চায় অপরকে। একজোড়া সুঠাম কোমল পায়ের জন্য দরকার শোভন পাদুকার, তার জন্য আবার চাই মনোরম কার্পেট, একটি গাড়ি প্রভৃতি। বস্তির মধ্যে ছেঁড়া পোষাক পরা সুন্দরী মেয়েকে দেখলে

আমার দুঃখ হয়, মনে হয়, সবচেয়ে কুৎসিত দৃশ্য দেখছি। নাহ্‌, এরকম দৃশ্যের কথা ভাবলেই শিউরে উঠি। একমাত্র ঐশ্বর্যময়ী সুন্দরীরাই হতে পারে প্রেমিকা। তারা আমার কাছে কখনোই ঘৃণ্য নয়, হাস্যকর নয়। বিশ্বাস করো, বড়লোক সুন্দরীদেরই আমি প্রণয়পরায়ণা বলে ভাবতে পারি, আর কাউকে নয়। এবং এদিক থেকে খুব কম লোকেই, আমার বিচারে, সত্যিকারের প্রেমিক। এবং সেই বিচারে আমি নিজেই বাতিল হয়ে যাব প্রথমে, তবু আমার এই হল অভিমত।

এক সুন্দর সূর্যাস্তের সময়, গোধূলি-পূর্ণিমায় আমরা মিলিত হব, যখন সারা আকাশ জুড়ে, আগেকার দিনের ছবির মত, ছড়িয়ে থাকবে কমলা-হলুদ অথবা হালকা-সবুজ রঙের বিদায়ী অস্তরাগ, মনোরম বীথিপথের দুধারে থাকবে ফুটন্ত চেস্টনাট, গাছে গাছে বনপায়রার বাস; নতুন গাঢ় সবুজের আভাস দ্যোতিত করে মোহিনী গাছগুলোয় সঞ্চারিত হবে মায়াময় ছায়া, বাতাসে থাকবে করুণ শঙ্খের মত দুধের আর্দ্রতা। তাদের সঙ্গে চিত্রপটে থাকবে কয়েকটি প্রস্তরমূর্তি, বরফের শুভ্রতার ভেতর সবুজের আভাস ছুঁয়ে জেগে উঠবে কিছু মার্বেলের ফুলদানী, জলে দেখা যাবে কেলিপরায়ণ রাজহংসের অপরূপ লীলাবিলসন, দূরে মাথা তুলে জেগে থাকবে চতুর্থ হেনরীর সময়ের বিরাট বিরাট বাসগৃহ, যার থাকবে লম্বা লম্বা চিমনি, থাকবে প্রত্যেক ছাদের উপর একটি করে বায়ু নিশান, আর সরু লম্বা জানালা। ঠিক এরকমই একখানা বাড়ির বারান্দা থেকে বিষণ্ণ-নীরব ভঙ্গিমায় আমার প্রাণেশ্বরী থাকবে দাঁড়িয়ে, পরিধানে থাকবে তার আমার কল্পনার রঙে রাঙানো পোষাক, যার বর্ণনা করেছি আগেই। তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকবে একটি নিগ্রো ছেলে, হাতে থাকবে তার পাখা আর আমার প্রিয়ার টিয়া। দ্যাখো কোন কিছুই আমি বাদ দিইনি, যদিও এ ধারণা নিছক কল্পনাই, বাস্তব নয়। সুন্দরীতমা খুলবে তার দস্তানা, ফেলে দেবে নীচে আর সেটি আমি তুলে নেব, গন্ধ শুঁকবো, চুমু খাব, পরে একসময় আবার সেটি ফিরিয়ে দেব আমার রাণীকে। শুরু হবে আমাদের কথাবার্তা, স্বভাববিরুদ্ধ চাতুর্য আর প্রত্যুৎপন্নতা দেখাতে আমি হয়ে উঠব ব্যাকুল। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলব, এক কথায় স্তাবকতা করব, এবং মিলবে আমার যোগ্য প্রত্যুত্তর। দেখতে দেখতে সেই সব কথা মেলবে ডানা, হয়ে উঠবে প্রজাপতি, কিংবা শব্দের ফুলঝুরি।

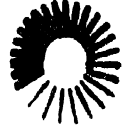
ক্রমশ নৈশভোজের সময় এগিয়ে আসবে—আমি নিমন্ত্রিত হব এবং নিমন্ত্রণ গ্রহণ করব। বন্ধু, কী সেই নৈশভোজ, এবং কি মেনুই না আমি স্বপ্নে ভেবে দেখেছি। গ্লাসে গ্লাসে ঝলমল্‌ করবে পানীয়, প্লেটের উপর সাজানো থাকবে ধূমায়িত সাদা এবং সোনালী পাখীরা। ভোজন অবশ্যই অনেক রাত পর্যন্ত গড়াবে এবং তুমি নিশ্চয়ই এটা আন্দাজ করতে পারছ যে আমি সেই ভোজনকে দ্রুত শেষ করবার মত নির্বোধ ব্যক্তি হব না। এটা কল্পনার এক সুন্দর প্রয়াস নয় কি? পৃথিবীতে এর চেয়ে সহজ আর কিছু হতে পারে না এবং এটা খুবই আশ্চর্যের যা এরকম ঘটনা একবারের জায়গায় কেন দশবার ঘটেনি।

কখনো কখনো দৃশ্যপট পাল্টে হয় এক বিশাল বনভূমি। মৃগয়ায় চলেছেন এক সুন্দরী,

তার শিঙার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ; শিকারী কুকুরগুলো বিদ্যুৎবেগে ছুটে বেড়াচ্ছে; শাদা, ক্ষিপ্র তুর্কী ঘোড়ার উপর এক বীর অ্যামাজন রাজকুমারী উঠে বসেছেন। যদিও তিনি উত্তমরূপে ঘোড়া চালাতে পারেন, তবুও এক্ষেত্রে তাঁর বাহন লাফাচ্ছে; ঝাঁপাচ্ছে এবং তাকে সামলাতে তিনি হিমসিম খাচ্ছেন। মুখের ভেতর বল্গা চেপে ধরে ঘোড়াটা যেন সোজা কোনো খাড়া পাহাড়ের দিকে ছুটে চলেছে। আমি যেন ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশ থেকে পড়ি, ঘোড়াটাকে থামাই ; প্রায় অজ্ঞান রাজকুমারীকে কোলে তুলে নিই; তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনি এবং তাঁকে তাঁর অট্টালিকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাই। আশা করি কোনও উঁচু বংশের মহিলা নিশ্চয় তাঁর জীবনদায়কের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে; এবং রাস্তার এপার থেকে ওপারে গেলেই কৃতজ্ঞতা ভালবাসায় পরিণত হবে।

তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবে যে আমি কখনও আধা-আধিভাবে রমন্যাস করি না এবং আমি যতটা পাগল হওয়া সম্ভব, ততটাই। আমি চিঠি লিখি—সহজ সরল কথার পরিবর্তে লিখি অধ্যায়ের পর অধ্যায়। সবকিছুতেই আমি অস্বাভাবিকতাকেই ভালবাসি। সেইজন্যই তো আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি যা কিছু আবোল-তাবোল লিখলাম তা পড়ে অট্টহাসি হেসে উঠো না, কিছু সময়ের জন্য আমি পেনটাকে মুক্তি দিয়েছি। আমি ফিরে এসেছি আমার প্রথম বাসনায়—আমার একজন প্রণয়িনী চাই। সে পার্কের এবং ব্যালকনির মহিলা হবে কিনা; সে বিষয়ে আমি সতর্ক নই। তবে আমি তোমাকে বিদায় জানিয়ে তার খোঁজে বের হচ্ছি। আমার সব তৈরী হয়ে গেছে। যেখানেই সে লুকিয়ে থাকুক আমি তাকে খুঁজে বের করবই। তবে তোমাকে আমি সবই জানাব। জানাব আমার উদ্যোগের সফলতার কথা, মেলে ধরব ব্যর্থতারও পেখম। আশা করি সাফল্য আসবে। শুভেচ্ছা জানিও আমায়, বন্ধু, আমার সাফল্য চেয়ো। এখন সবচেয়ে সুন্দর আর দামী পোষাক পরেছি, মনে মনে স্থির করেছি; এই যে বেরুব, একেবারে সঙ্গে করে আনব আমার প্রাণ-প্রিয়তমাকে। হ্যাঁ, হৃদয়েশ্বরীকে না নিয়ে আর ঘরে ফিরছি না। যাক্, অনেক স্বপ্ন দেখেছি, দেখছিও, এখন কাজের পালা।

পুনশ্চ ঃ ছোট্ট ডি'র খবর কি ? তার কি হয়েছে ? এখানে কেউই ওর সম্পর্কে কিছু জানে না। তোমার যোগ্য ভাইটিকে এবং পরিবারের সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানিও।



রক্তিম বসনা সুন্দরী

শেষ পর্যন্ত ঘরেই ফিরলাম। বন্ধু, অনেক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলাম বাড়ি। তবু মানতে হবে, হ্যাঁ, খোলাখুলি স্বীকার করছি, আজ অব্দি কোন মিসট্রেস জুটল না। অথচ, নিজেকে হাতের মুঠোয় পুরে নিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম; দেখে নেব দুনিয়ার শেষ সীমা। হলো না, বন্ধু, তা আর হয়ে উঠলো না। শুধু পৌঁছেছি আমি উপান্তেই।

বলব, তোমাকে বেশ রসালো করেই বলব আমার অভিযানের কথা। টানা দুঘণ্টা টয়লেটে কাটল। বিশ্বাস করো, সেখানের সব কিছুই কিন্তু খারাপ নয়। সেখানে নানাভাবে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করেছি; সত্যি সত্যিই কতখানি আমি সুন্দর। ভাল করে দেখতে চেয়েছি আমার কেশবিন্যাস কেমন কেতাদুরস্ত হয়ে উঠেছে, আর যতই দেখি ততই অবাক হই, মুগ্ধ হই, বিজয়ী সম্রাট বলে নিজেকে ভেবে বেশ গর্ব অনুভব করি।

সেদিন, নিজের রূপ দেখে নিজেই মোহিত হয়েছি। নিজেকে মনে হল দ্বিতীয় জেসান। সোনালী পশম তাই আমার চাই-ই-চাই। নাহ্; জেসান হয়ে ওঠা আর আমার হবে না। সে শুধু স্বর্ণকান্ত পশমই পায় নি সঙ্গে সঙ্গে জয় করেছিল তিলোত্তমা রাজকন্যাকেও। আর আমি? থাক, সে কথা আপাতত তোলাই থাক।

রাস্তায় ঘুরতাম উদভ্রান্তের মতো। ঘুরতে ঘুরতে আমি চোখ দিয়ে চাখতাম মেয়েদের। একটু উষ্ণ শ্বাসের লোভে, উত্তাপের আকাঙ্ক্ষায় ওদের কাছে যেতাম। এমন ভাবে গায়ে পড়া ভাব দেখাতাম যাতে তাদের কাজে লেগে নিজেকে ধন্য মনে করতে পারি। পাশ দিয়ে চলে যেত অনেকে, বয়ে যেত সুরভিত বাতাস; অথচ ভুলেও চোখ তুলে আমার দিকে কেউ চাইত না। কেউ কেউ আমায় অন্য কিছু ভাবতো, আলতো করে তাকাত আর এমন ভাবে তাকাত তারা যেন ভুল করে ফেলেছে।

ঠোঁটে জাগত ওদের হালকা হাসি; কারো কারো ঝকঝকে দাঁতের রূপ ফুটে উঠত। এখানে চারিদিকে লোকজনের ভিড় থাকলেও বেশ ঝলমলে, বাতাসে কিসের নেশা, খেলাধুলায় উৎসবের আমেজ, খুশির রোশনাই।

কোন কোন কর্মিনী যুবতী ছাড়া কাউকে আমার ভাল লাগত না। ইচ্ছে করত থুতু ছিটোই। কিন্তু ঐ যুবতী-শ্রমিককেও তেমন চোখে ধরত না কেননা তারা কেউ 'সিল্ক স্কার্ট মার্কা' নয়। প্রজাপতি দেখলেই যেমন তার ডানা ছিঁড়তে হাত নিসপিস করে তেমন কোন ভাব জাগে না। ফলে ওদের দিকে তাকাতেও ঘেন্না হয়। সত্যি কথা বলতে কি, যেসব পুরুষ বা মেয়েছেলের দিকে তাকালে গা ঘিন ঘিন করে তাদের মতো কুৎসিত জানোয়ার আর কী আছে? সিংহ বা বাঘ ঢের বেশী সুন্দর ঐসব জঘন্য দেখনেওয়ালা মেয়ে পুরুষের চেয়ে। শুধু বাঘ বা সিংহ কেন অন্যান্য বহু জন্তুই দেখতে সুন্দর, কিন্তু কদাকার পুরুষ বা মেয়েছেলেকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।

আমার ভয় করে; বন্ধু, আমি কখনোই আমার স্বপ্নের জগত ফিরে পাব না। জানি, স্বপ্নের ভুবনেও সব আহা মরি কিছু নয়, তবু একেবারে কদাকারও কিছু নয়। বিশ্বাস করো, আমার আদর্শ হল সারল্যে একেবারে সাধারণ, অতি সাধারণ। কনস্তানতিনোপল অথবা স্মার্নার বাজারে আমি হয়তো আমার স্বপ্নের মত সুঠাম সুবেশ সুন্দর পুরুষ বা রমণীকে দেখতে পাই। সেসব মহিলার হাতে থাকে একটা কারুকার্য খচিত ব্যাগ, ট্যাঁকে দু-একটা রৌপ্যমুদ্রা। এদের পেতে আমায় যা খরচা করতে হবে তা নেহাতই তুচ্ছ, কুকুরকে খাওয়াতেও তার চেয়ে বেশী খরচা করতে হয়। কিন্তু হায়, আমার ভাবনা চিরকালই ভাবনা থেকে যাবে। জানি, বাস্তবে তাকে পাব না। সব কিছুই হয়ে যাবে নিরর্থক। ফলে রাগে রি রি করে শরীর, দাঁতে দাঁত চেপে বসি; আবার থুতু ছিটিয়ে ঝেড়ে ফেলি একরাশ বিরক্তি। ক্ষেভে দুঃখে ব্যর্থতায়, বন্ধু, ঘরে ফিরে এলাম, সঙ্গে রইল নিজের ভাগ্যের বিরুদ্ধে নিজের প্রচণ্ড অভিমান আর ধিক্কার ক্ষোভ আর ক্রোধ।

তুমি সুখী। বন্ধু, আমার মত উন্মাদ নও বলেই তুমি সুখী। জীবনকে মেনে নিয়েছ তুমি স্বচ্ছন্দে, যা খুঁজে পেয়েছ তাকেই গ্রহণ করেছ সানন্দে। সুখের পিছনে কখনো তুমি ছোট নি, তাই সেই খুঁজে নিয়েছে তোমাকে। পেয়ে গেছ তুমি ভালবাসা, আর ভালবাসা পেয়েছে তোমাকে। না, বন্ধু, তোমায় আমি হিংসা করি না অন্তত সেরকম আমায় ভেবে বসো না। তবে তোমার সুখের কথা ভেবে আমি নিজের মধ্যে নিজে গুটিয়ে যাই; দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলি, আমিও যেন তোমার মত আনন্দ উপভোগ করতে পারি।

আমার সুখ বোধহয় আমার পাশ দিয়ে চলে গেছে আর এখন আমি অন্ধ, কিছুই দেখতে পাইনে। যে সুখ একদিন কাঁপিয়ে দিয়েছিল আমার বোধ, বলে উঠেছিল কথা সেই স্বর সেই ধ্বনি প্রচণ্ড কলরবে গেছে ডুবে, গেছে উড়ে।

দৈবাৎ কোন বিনীত হৃদয় আমায় হয়তো ভালবেসেছে কিন্তু আমি তা ধরতে

পারি নি, হয়তো ভুল বুঝেছিলাম; ফলে ভেঙে গেছে স্বপ্ন; সম্ভবত আমি আর এক স্বপ্নে ছিলাম বিভোর, কোন রাতের স্বপ্নে মগ্ন, দিনের চিন্তায় আচ্ছন্ন। যদি একবার ফিরে তাকাতাম তাহলে হয়তো দেখতাম কোন লীলায়িত দেহরেখার মাধুরী দীর্ঘায়িত বিশ্বাসের আবেগে উতলা সুরভিত কেশগুচ্ছ; সুন্দরীতমা ম্যাডেলিনকে, হয়তো তার গন্ধের ফলে খুঁজে পেতাম মোহন মণ্ডল। যদি স্বর্গের দিকে উত্তোলিত হত আমার বাহুযুগল তাহলে বন্দী করে নিতাম উন্মীলিত জ্বলজ্বলে তারার দীপালি আর যদি তুলে নিতে চাইতাম ফুল তবে শিশিরস্নাত ঘাসে ফুটে উঠত কোমল হৃদয়; মুখর হত মরুকাননের অস্ফুট কুসুম। হ্যাঁ; আমার পাশ দিয়ে হয়তো গেছে কোন মৌন ভালবাসা। ভুল; বড় ভুল করে ফেলেছি। সেদিন বুঝি নি, ভালবাসা কারে কয়। প্রেমের কাছে সেদিন হয়তো ভালবাসা ছাড়া অন্য কিছু চেয়েছিলাম আর তাই সে ফিরিয়ে নিয়েছে মুখ, দেয় নি কিছুই। ভুলে গিয়েছিলাম ভালবাসার উলঙ্গ আদল; ধরতে পারি নি এমন আকর্ষণী প্রতীকের মর্ম। তার কাছে দাবী করেছিলাম বুটিদার পোষাক; পালকগুচ্ছ; হীরকপুঞ্জ, মহান মনন, প্রখরজ্ঞান, কাব্যিকতা, শোভন সৌন্দর্য যৌবন; সর্বোত্তম ক্ষমতা, আরো অনেক— অনেক কিছু; অথচ ভালবাসা শুধু নিজেকেই নিজে দেয়; আর যে তা চায় সে কেবল ভালইবাসে; সে শুধু প্রেমিকই হয়, হয়ে ওঠে সে অন্যের ভালবাসারই সামগ্রী।

সন্দেহ নেই; আমি খুব ব্যস্তবাগিশ। এখনো আমার সময় হয়নি। যে ঈশ্বর আমায় ধার দিয়েছেন আমার জীবন; আমার বাঁচার আগেই তিনি তা কেড়ে নেবেন না। তার ছেঁড়া বীণায় কবির কি এসে যায়; প্রেম ছাড়া জীবনেই বা মানুষের কি থাকে? না ঈশ্বর, এমন পারম্পর্যহীন নন, হতে পারেন না তিনি বেসামাল। সন্দেহ নেই; তিনি ঠিক আমার কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তেই আমার জীবনে এমন নারী এনে দেবেন যাকে আমি ভালবাসব আর যে আমায় ভালবাসবে। কিন্তু মিসট্রেসকে পাবার আগেই কেন প্রেম এল? যে ঝর্ণার জলে মিটবে আমার তৃষ্ণা তা না পেতেই কেন এমন তৃষ্ণার্ত হলাম? অথবা মরুভূমির যেখানে জল পাওয়া যাবে সেখানে কেন পাখির মত আমি উড়ে যেতে পারিনা? মরুদ্যান আর খর্জুরবীথি ছাড়া সাহারাই হল আমার ভুবন তখন। আমার জীবনে এমন কোন ছায়াময় কোণা নেই যেখানে সূর্যের তেজ থেকে রক্ষা পেতে সাময়িক আশ্রয় নিতে পারি; মোহমদিরতা ও অনবদ্য রম্যতা ব্যতিরেকেই সংরাগের সুতীব্র উত্তাপে আমি সতত আক্রান্ত, আমি জানি এর যন্ত্রণা, কিন্তু তার থেকে সামান্যতম আনন্দও নিংড়ে নিতে পারিনি। যা নেই তার প্রতি আমি বারবারই অসূয়াপরায়ণ, আমি পৃথিবীতে সেরকম চোখের জলই ফেলি যা কোনদিন ধুয়ে মুছে যাবে না, বাতাসকে দিই চুমু যে আমাকে তা কখনো ফিরিয়ে দিতে পারবে না, তার জন্যই আমায় অপেক্ষা যে কোনদিন আসবে না, আর এমন ব্যাকুলতায় প্রতিটি মুহূর্ত গুণতে থাকি যেন কারো সঙ্গে রয়েছে গোপনে দেখা করার কথা।

তুমি যাই হও, দেবদূতী অথবা শয়তানী; অপাপবিদ্ধা কুমারী বা বারবণিতা, রাখালনী বা রাজকন্যা—যাই হও; আমি তোমায় জানি না; হে নারী; তুমি উত্তর থেকেই আস

কিংবা দক্ষিণ থেকেই আস, দেখবে আমার হৃদয়ে আর যাই থাক তা হল অঙ্গার। অঙ্গার আর অঙ্গারই হল আমার হৃদয় এখন! এসো, এসো, হে আমার উজ্জ্বল উদার, হে আমার ভালবাসার নারী, তোমাকে বেঁধে ফেলি আমার বাহুতে, আমার সেই বাহুতে যা দীর্ঘকাল ধরে শুধু খোলাই রইল, থাকল উন্মুক্ত।

হে আমার স্বপনচারিণী, যদি তুমি অনেক, অনেক কাল বাদে আস, তাহলে হয়ত আমার বাহুতে সেই জোর থাকবে না যা দিয়ে তোমায় পিষতে পারি, ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে ফেলতে পারি। হায়! আমার মন যেন এখন ঠাসা পায়রার খোপ। ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমার এক একটা ইচ্ছা ডানা মেলে উড়ে যায়; খোপে তবু ফিরে আসে পায়রা, হৃদয়ে ফেরে না কোন ঈপ্সা। হে আমার স্বপ্নলগ্না, তোমার দ্রুততর চরণচিহ্ন, অথবা শূন্য নীড়ে যা কিছু পড়ে থাকে তা যে শুধু চলে যাওয়া পাখির পালক!

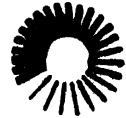
বন্ধু, যৌবনের সঙ্গী আমার, তোমাকে, শুধু তোমাকেই আমি বলতে পারি এসব কথা। লিখে দিয়ো আমাকে, তুমি আমাকে করুণা করো, অন্তত রাগী বলে আমাকে মনে করো না; সান্ত্বনা দাও, কেননা এমনভাবে আমার আর কখনো কাউকে দরকার মনে হয়নি। মাতাল, কামুক, জুয়াড়ি সবাই যে যার আবেগ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারে, কিন্তু আমার বেলায় তা যে অসম্ভব, একেবারে অবিশ্বাস্য!

এ ভাবনা আমাকে এমনভাবে বেঁধে ফেলল যে আমি শিল্পকলা ও কবিতার মাদকতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলতে শুরু করি। আমার আগেকার ভালবাসার উপকরণ এখন আর তেমন করে আমায় নাড়া দেয় না, মন টানে না।

বুঝতে পারছি, আমার বোধগুলো যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, সমাজের বা প্রকৃতির কাছ থেকে এমন কিছু চাইছি যা তাদের দানের অতীত। খ্যাপার মতো আমি যাকে খুঁজে বেড়াই তার হয়তো কোন অস্তিত্বই নেই, আর তার জন্য কাউকে অভিযোগ করেও কোন লাভ নেই। কার বিরুদ্ধেই বা অভিযোগ করব? তবে, যে আমার স্বপ্নের অধিবাসী, সে হয়তো রক্তমাংসের কোন মানবীই নয়, কিন্তু প্রশ্ন হল কেন তাকে ভালবাসি, কেন আর কেউ নয়, নাকি আমি মানুষ বলেই আমার আবেগ-অনুভূতি-প্রবৃত্তি এমন ভুলপথে আমাকে চালিত করছে? কে ছড়িয়ে দিয়েছে আমার চেতনায় এমন এক স্বপ্নিতা নারীর কল্পনা? কি সেই বিমূর্ত সৌন্দর্য, যা আমি অনুভব করি, অথচ সঞ্চারিত করতে অক্ষম? সামনে দাঁড়ানো কোন মহিলা যখন ঝলমল করেন তখন পর মুহূর্তেই কেন আবার তাঁকে ভয়ংকর বিশ্রী বলে মনে হয়। কোন্ আদর্শ নারীর সঙ্গে আমি আমার ঈপ্সিতাকে তুলনা করি? জানি, সৌন্দর্যের কোন নির্দিষ্ট ধারণা নেই, তা শুধু বিপ্রতীপেই বাঞ্ছনীয়। আর তাকে কি আমি ইতালি কিংবা স্পেনে; এখানে-ওখানে, কাল কিংবা ঢের ঢের আগে আকাশে, নক্ষত্রে, বল নাচের আসরে, বা মায়ের আঁচলে দেখেছি? সে কি প্রেমপটিয়সী গণিকা, না বিখ্যাত গায়িকা, না রাজকন্যা? সে কি আমার আনন্দবর্ধক রাফায়েলের আঁকা মুখ আর ক্লিমেন্সের উজ্জ্বল মার্বল? সে কি তাহলে ম্যাডোনা অথবা ডায়ানা? সে কি আমার আদর্শ দেবদূতী, না পরী, না যথার্থ মানবী?

হায় ! তাদের সবার চেয়ে যে আমার আদর্শ সে অনেক ছোট। ভাবি, শুধু ভাবি, কেমন করে সত্যিকারের এক মেয়ে, যে সকলেরই মত খায় দায়, ভোরে উঠে রাতে ঘুমোয়, তাকে এ'সব সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করি ! এসব করবার হেতু কি ? কেন তাকে আমি বৃথাই খুঁজে বেড়াই ! সত্যিই এ-এক দারুণ অন্ধতা ! আর অবাক হয়ে ভাবি এ কোন্ নির্মমতা যে আমি আমার প্রেমিকা খুঁজি।

আহ্, যদি কবি হতাম তাহলে ছন্দে ছন্দে ফুটিয়ে তুলতাম তাদেরই স্বপ্ন আবেগ ভালবাসা আর নির্মম বেদনা। যারা শুধু ব্যর্থ হল, যাদের পঞ্চশর গিয়ে পেঁছিল না আকাঙ্ক্ষিত স্থানে, যারা বলতে পারল না প্রিয়তম কথাগুলো তাদের প্রিয়-তমাকে, কোমল হাতের উপর মৃদুতম চাপ দিয়ে পেল না বাঞ্ছিত উষ্ণতা, যারা শুধু মরল, দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে হতাশ্বাসে মরল, হায় ! যদি পারতাম এদের বেদনাকে ভাষা দিতে, তাহলে কি মহৎ কাজই না হত।



বন্ধু, আমরা আমাদের কাজের থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি। অথচ হে আমার আত্মার সুহৃদ, আসল গল্প যে নেহাতই জোলো।

আগেই বলেছি, রাস্তায় রাস্তায় আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। আর ঘুরতে ঘুরতেই, আমার মনে পড়ল এক বন্ধুকে, সে আমায় এমন এক বাড়িতে নিয়ে যেতে পারে, যেখানে, আমি শুনেছিলাম, দেখতে পাব অনেক সুন্দরী মহিলা, অন্তত বিশজন কবির স্বপ্ন প্রিয়তমা সেখানে রয়েছেন রক্তমাংসের শরীর নিয়ে। সবরকম মানসিকতার উপযোগী সুন্দরীদের দেখা মিলবে সেই বাড়িতে। অনেকগুলো ফ্ল্যাট, অনেকগুলো ঝকমকে ঘর নিয়ে সুন্দরীর সমাবেশে বাড়িটা সবসময়েই ঝলমল করছে। সেখানে নেই নপুংসকদের ভিড়, আছে শুধু প্রাণের ফোয়ারা। আমার সেই বন্ধুর দেখাও পেলাম। কথায় কথায় বললাম আমার মনের নিঃসঙ্গ অবস্থা। বললাম সে আমাকে বাড়িটায় নিয়ে যেতে পারে কিনা। বন্ধুটি গদ গদ হল। চোখে মুখে লাগল রঙ। জানাল, সেখানে পাঁচ-ছটি প্রেমের ঘটনায় সে জড়িত হয়ে পড়েছিল। শুনছিলাম ওর কথা,

শুনতে শুনতে নিজের ভিতর ডুবে যাচ্ছিলাম, কুঁকড়ে যাচ্ছিলাম। আর যাই হোক ওর মত সফল প্রেমিক হওয়া আমার কাম্য নয়। অবশ্য বন্ধুটি আমার সম্পর্কে বড়ই উৎসাহী, সে মনে করে আমি সফল হবই, জুটবে আমার স্বপ্নের প্রেমিকা। তার মতে আমি যা চাই তার থেকে অনেক বেশী পেয়ে যাব আমি সেখান থেকে। সে মনে করে, আমি শুধু মেয়েদের নিয়ে কল্পনার ফানুস বানাই, বাস্তবে মেয়েদের নিয়ে কিছু করার সাহস আমাদের নেই। এর জন্য সে দায়ী করে অবশ্য সমাজকেই; সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতিতেই রুচিমাফিক মেয়েদের আমি পাই না। অথচ সত্যিকারের প্রেমিক হবারই যোগ্য আমি, বিশেষ করে যখন একবার ব্যর্থ হয়েছি তখন প্রেমের রহস্যটি আমার কাছে আর দুর্জ্ঞেয় হবে কেন? তবে তাই হোক, মহিলারা অন্তত একটি বারের জন্য যেন ভাবে যে আমি সত্যি সত্যিই ওদের স্তাবক।

সেই বাড়িটায় নিয়ে এল আমার বন্ধু। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বাড়ছিল আমার বুকের ধুকপুকুনি। তোলপাড় করছিল বুক। আমার আশংকা ঠেলে উঠছিল গলায়। উথলে উঠছিল আবেগ, রুদ্ধবাক্ আমি। নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না, কেমন যেন অচেনা-অচেনা লাগছিল। এক সময়, কনুই দিয়ে বন্ধুটি আমাকে গুঁতো মারল; সচেতন হলাম আমি।

সামনেই দেখি এক মহিলা। বয়স তিরিশ হবে তার। ছিমছাম চেহারায় রজনীগন্ধার লাবণ্য। পোষাক-আশাকে বিলাসের মধুরিমা, অথচ গাড়ির টায়ারের ভেতর যেমন থাকে লালরঙা টিউব তেমনি রক্তরাঙা অঙ্গরাগে ঢেকে রেখেছে তার অনুপম তনুলতা, কিন্তু লুকোতে পারেনি শিশুর সারল্য, অপরূপ হাসির উচ্ছ্বাস। শুনলাম ইনিই এ-বাড়ির প্রধানা, রক্তিম-গর্বিণী অধিনায়িকা।

গ-তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। লক্ষ্য করলাম ওর স্বরে কেমন স্তাবকতার সুর, ফিসফিসিয়ে গদগদ হয়ে কি সব বলল। অবাক না হয়ে পারলাম না। সে বলল, 'যার কথা তোমাকে আরেকদিন বলেছিলাম, এই সেই লোক। চমৎকার ছেলে, অভিজাতও বটে। আশা করি তুমি ওকে সানন্দেই বরণ করে নেবে, আর সেজন্যই তোমার কাছে ওকে আমি নিয়ে এসেছি।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আপনি ঠিকই করেছেন স্যার।' অদ্ভুত বিলোল ভঙ্গিমায় মহিলা উত্তর দিল। তারপর চোখ টেরিয়ে আমায় একবার নিরীক্ষণ করে নিল। তাকাল এবার সোজাসুজি, যেন দীপ্ত ধাতুর ঝলকে মধুর নয়নে খেলে গেল রূপকরঙ্গ। তার তাকানোর বঙ্কিম ভঙ্গিটি এমনই মদালস যে আমি রোমাঞ্চিত হলাম। সে বলল, 'এখানে নিজেকে আপনি স্বচ্ছন্দে সবসময়ের জন্যে আমন্ত্রিত অতিথি বলেই মনে করবেন স্যার। যখন ইচ্ছে হবে চলে আসবেন, দ্বিধা না করেই কাটিয়ে যাবেন সন্ধ্যা।'

সম্মতি জানলাম নীরবে। একটু বেশীই বোধহয় মাথাটা নীচু করে ফেলেছিলাম, পাশ থেকে বন্ধুটি যেন কি বলে উঠল, বিন্দু বিসর্গও কাণে ঢুকল না। মেয়েটিকে ভাল লাগলেও আমার স্বপ্নের নারী এ নয়। বুঝলাম, এ আমার যোগ্য নয়। গ-এসব লক্ষ্য করছিল। সে একটা জানালার ধারে কোণে টেনে নিয়ে গেল আমাকে; তারপর

গুরুর মত কিছু নির্দেশ দিল শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনমাফিক।
'সাবাস! সত্যিই তুমি অদ্ভুত! আমাকে ভুল বুঝো না, মানিয়ে নিও। বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত লোক বলেই এদের কাছে বর্ণনা করেছি। আবেগসর্বস্ব লোক বলেই করেছি চিত্রিত, অসম্ভব কল্পণাপ্রবণ গীতিকার হিসেবেই তোমার পরিচয় দিয়েছি। আর তুমি কিনা একটা কথাও বলছ না! একেবারে বোবা হয়ে গেলে! উঁহু, এভাবে তো চলবে না। চলো ওখানে, কথা বলবে, বক বক করবে। এসব জায়গায় এলে কথা বলতে হয়, বুঝলে! আর অত ভেবে চিন্তে কথা বলার কোন দরকার নেই। নিজেকে মেলে ধরো, আকর্ষণীয় করে তোল ওদের কাছে। বুঝিয়ে দাও তোমার প্রতিভা। ভয়ের কি আছে বল তো? মনে রেখো, যারা এখানে আসে, তা কেউই তোমার চেয়ে খুব একটা চালাক চতুর বুদ্ধিমান নয়। সব বোকা, একেবারে নিরেট নির্বোধ। যাক, মিসট্রেসকে কেমন লাগল?'
'এক কথায় বিরক্তিকর। কিছুমাত্র ভাল লাগেনি। যদিও মিনিটখানেকেরও কম কথা বলেছি তবু মনে হল যদি এর স্বামী হতাম তাহলে জীবনটা একেবারে একঘেয়ে করে ফেলত।'
'অ্যাঁ! ও সম্পর্কে এই তোমার অভিমত?'
'হ্যাঁ।'
'তাহলে ওকে তোমার ভীষণ অপছন্দ? নিঃসন্দেহেই খুব খারাপ। তবু বলি, এক মাসের মতোও যদি তুমি ওর প্রেমিক হতে তাহলে হয়তো তোমার মতের বদল ঘটত বা বলতে পারি, মতটা বদলে ফেলতে। ওদের সমাজে ঢোকার ক্ষেত্রে ওর মত সহায়ক আর কেউ নয়, বুঝলে?'
'যেহেতু আমারও বোঝা দরকার, তাহলে তাই করব।' বেশ করুণভাবেই আমি বললাম।
'মাদাম থেমিনসই হল এখানকার ফ্যাশন। একালের সবরকম আচার আচরণের সেরা রূপটি দেখতে পাবে ওর কাছে, শুধু বর্তমানের নয়, আগামী দিনেরও অনেক কিছু; তবে যা গত তার কিছু নয়। ও সত্যি সত্যিই একেবারে হালফ্যাশনের। ও যে পোষাক পরে মেয়েরা তাই অনুকরণ করে; কিন্তু যা পুরনো হয়ে গেছে ওর কাছে তা চিরকালের জন্যই বাতিল। যে গাড়ি ও চড়ে তাহল সবচেয়ে দামি, সেরা রুচির পরিচায়ক। অবশ্য মন বলতে ওর কিছু নেই, কিন্তু ওর মত কখনও কেউ নয়। অনেকেই ওকে দেখলে পাগল হয়ে যায়, কিন্তু ওর ভিতর কোন চাঞ্চল্য নেই; বড়ো নিরুত্তাপ ওর হৃদয়। ওকে খুশী করা যায় কিন্তু স্পর্শ করা যায় না। হৃদয় ওর শীতল; অথচ মগজে লাম্পট্য। আর ওর মন? যদি সে জিনিসটা আদৌ ওর থাকে বলতেই হবে সেটি খুব কালো, সবরকম নিষ্ঠুর কাজেই ও পারঙ্গমা; কিন্তু সে প্রচণ্ড চালাক, আদবকায়দাও চমৎকার। ফলে তার বিরুদ্ধতা করবারও কোন হেতু নেই। এবং ঠিক এ কারণেই; ওর এমন একজন প্রেমিক চাই, যাকে ও একছত্রও কোনদিন লিখবে না। সব দিক দিয়েই বোঝা যায় ওর শত্রুরাও ওর বিরুদ্ধতা করার ধৃষ্টতা

দেখায় না; কেননা তাদের এমন কিছু নিদর্শন থাকে না যা দিয়ে ওকে ঘায়েল করা যায়।'

'কেমন করে এসব জানলে তুমি ?'

'কি অদ্ভুত প্রশ্ন করলে; বলতো! আরে; ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা পর্যবেক্ষণ না করলে কি এসব বলতে পারি ?'

'তাহলে তুমিও তার প্রেমিক ?'

'আলবৎ! কেন হব না বলতে পারো ? ও আমার জন্য যা করেছে তার জন্য ওর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ বৈ কি!'

'বুঝতে পারি না সে তোমার জন্যে এমন কি করল ?'

তুমি কি সত্যি সত্যিই বোকা ?' আমার দিকে মস্করা করার ভঙ্গিতে গ-বলল; 'ভাবতে দাও আমাকে। তারপর ধীরে ধীরে সব বলছি। মাদাম দ্য থেমিনস অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে, এবং সঠিকভাবেই অনেক কিছু মিলিয়ে দেয়। তাছাড়া ওর কাছে আসেও নানান জায়গার নানান খবর। মাদাম যদি কাউকে পক্ষপুটে আশ্রয় দেয় তাহলে তার প্রেমের দরজা যায় খুলে, কেননা সে যাকে জায়গা দেয় তাকে পাবার জন্য অন্যান্য মহিলাও হয়ে পড়ে ব্যতিব্যস্ত; এমনকি তোমায় বিন্দুমাত্র পছন্দ করে না এমন মহিলাও, শুধু মাদামের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে, ভালবাসতে শুরু করবে তোমায়। তুমি তখন পড়ে যাবে বাছাই করার সমস্যায়। আর মাদাম যদি তোমাকে অনুপ্রাণিত করে, উদ্দীপিত করে, সাবধান! ভুলেও তাকে জয় করবার চেষ্টা করো না। বরং তুমি অন্য মহিলাকে নির্বাচন করে ফেলো, যার কাছে বাঁধা দিতে পার হৃদয়, যে তোমায় খুশী করতে পারবে, দিতে পারবে আনন্দ, তাতে তোমারই লাভ; আর যদি তা না পারো তাহলে তোমাকে হারাতে হবে অনেক কিছুই; হারাতে হবে মাত্র কিছুদিনের জন্য প্রাপ্ত এখানকার রাজকীয় সেবা-আদর-আপ্যায়ণ, যা অন্যান্য সব পাণিপ্রার্থীই এখানে পেয়ে থাকে। আর এই যে সব মহিলা দেখছো এদের নিজস্ব বলতে কিছুই নেই, আবেগ-প্রেম ইত্যাদির ধারণাটুক পর্যন্ত এদের নেই, এরা শুধু অনুকরণ করে এবং তারপর ধীরে ধীরে বাড়িয়ে তোলে শ্রদ্ধাবোধ। খরচপাতির দিক দিয়ে সময় হিসেবে এসব মহিলা কম খরচে।

এসব মহিলার মধ্যে তিন চারজনতো এরই ভেতর তোমাকে অন্যভাবে দেখতে শুরু করেছে, তারা তোমার আচরণেই মোহিত হয়েছে; আর আমি তোমাকে বন্ধু হিসেবেই বলছি, এগোও বন্ধু, এগোও, আমার সঙ্গে এই জানালার ধারে বক বক করে তোমার অবস্থানে কিছু বদল আনতে পারবে না; লাভও হবে না।'

'কিন্তু গ, আমি তো একেবারে আনকোরা; তাছাড়া আমি তো বুঝতেও পারি না কে আমার প্রতি আকৃষ্ট হল বা হল না; ফলে তোমার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাকে সাহায্য না করলে আমি মারাত্মক ভুলও করতে পারি।'

'সত্যিই তুমি অদ্ভুত; একদম সেকেলে। তোমার অমন টানা টানা কালো চোখ জোড়া দিয়ে, যে চোখে রয়েছে খুন করার আকর্ষণীয় মাদকতা, কি করতে পারো তা যদি

জানতে। দ্যাখো, ঐ কোণটায় যেখানে চুল্লী রয়েছে, সেখানে লাল পোষাক পরিহিতা যুবতীটি তার স্তাবককে নিয়ে কেমন খুনসুটি করছে। একে অনেকেই অপছন্দ করে, ওর মধ্যে অনেকেই খুঁজে পায় বেশ্যাদের চিরপরিচিত চটুল, অগভীর, বিচিত্র বিলোল ভঙ্গিমা। কিন্তু ওর আচরণ সত্যিই হৃদয় হরণকারী চমৎকার। মেয়েটি যেমন চালাক চতুর তেমনি ফূর্তিবাজ, খামখেয়ালি। সংস্কারাক্রান্ত যুবকের পক্ষে ঐ গোলাপ সুন্দরী সতি সত্যিই চমকপ্রদ মিসট্রেস! এই ক্ষুদে মহিলা যেন স্বপ্নের সামগ্রী, উদ্দীপনার উৎস। এই সপ্রাণ রমণীই হল মূর্তিমতী বিলাস। সচ্ছল, সন্নত তার বরতনু রক্তে-মাংসে আত্মনিবেদনে হয়ে ওঠে আসক্ত। এমন কি দরকার মতো শুধরে দেবে সে তোমার আসল ভাবালুতা, কাজে এনে দেবে উজ্জ্বল উল্লাস। এই আনন্দিত মুহূর্তের অতলে ডুবিয়ে দেবে বিশ্বনিখিল।'

গ-এর নিপুণ বর্ণনায় ধীরে ধীরে বিকশিত হল আমার কৌতূহল, বেড়ে উঠল আগ্রহ, ধরল নেশা, সরে এলাম নিঃশব্দে জানালার ধার থেকে। এগিয়ে গেলাম সেই ক্ষুদে রমণীরই কাছে, সযত্নে বিচার করে নিলাম ভাল-মন্দ, রাখলাম ওর কাছে রক্তিম প্রস্তাব। বয়স ওর পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। দীর্ঘাঙ্গী না হলেও গড়নটা মানান সই। এক হিসেবে সুশ্রীই বলা যায়, শুভ্রতায় মোড়া মাখনের মত মখমল মাংসল বাহু দেখলেই কামড় দিতে লোভ জাগে। পায়ের পাতা দুটি ছোট না হলেও রূপময়, হৃষ্টপুষ্ট কাঁধে সোহাগের উজ্জ্বলতা; গ্রীবা একটু খর্ব হলেও তৃপ্তিদায়ক, আর তার তনিমার বাকি অংশ যেন আলোর চয়নে জ্বলে চিরকাল, ছড়িয়ে পড়ে ব্যক্তিত্বের মণিময় দ্যুতি। পাখির ডানার মত প্রগাঢ় কুন্তলে দেখি মনোহর অমার নীলিমা। নাক তার ছোট, তবু চওড়া ফুটো দুটো বড় রহস্যময়, মুখবিবর সতত সিক্ত, ঝরে পড়ছে লালা, আর তাই সে অন্তহীন কামকেলিপারঙ্গমা। নিচের দিকের ঠোঁটটায় একটা তিল জ্বল জ্বল করছে। সবকিছু নিয়ে সে যেন টগবগে জীবন। তার কামুকতা, দীপ্ত স্বাস্থ্য, বলিষ্ঠতা, বিলাস ব্যসন—সব জড়ো করে চিরন্তনের ফাঁদে হয়ে ওঠে সে ক্ষমাহীন মাৎসর্য, অতিশয় লাস্যময়ী। অনায়াসেই অন্যের হৃদয়ে ছড়িয়ে দেয় আবেগের তীব্রতম মদ, আর প্রতিদিনই তা করে করে হয়ে ওঠে কঠিন বিজয়িনী।

বেশ লাগল ওকে। মনেও ধরল। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারি না এই সেই রমণী কিনা যে বুঝবে আমার মন আবেগ ইচ্ছা অনুভূতি, যে আমাকে দিয়ে বলিয়ে নেবে 'শেষ পর্যন্ত আমারও মিসট্রেস এলো।'

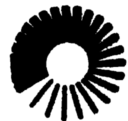
গ-এর কাছে ফিরে এলাম, বললাম, ও আমায় মুগ্ধ করেছে, ওর সঙ্গে মন দেয়ানেওয়ার জন্য বোধহয় রোজই আসতে হবে আমাকে। কিন্তু বন্ধু, তোমার কাছে ঋণী থাকব যদি ওর কাছে নিজেকে সমর্পণ করার আগে আরো কয়েকজন সুন্দরীর মাঝে আমাকে নিয়ে যাও, যারা আমাকে মুগ্ধ করতে পারে, প্রাণিত করতে সক্ষম। এবং তাহলেই আমার নির্বাচন সঠিক হবে। আমার পক্ষে আরো ভাল হয় যদি তুমি এখানকার বাসিন্দা সব সুন্দরীকেই একবার তলব পাঠাও আমার সামনে হাজির হবার জন্য আর আমাকে যদি প্রেমের প্রথম পাঠ একটু শিখিয়ে দাও।

হে বন্ধু, গুরু আমার, শিখিয়ে দাও কি ভাবে কথা বলব, কিভাবে আচরণ করলে অন্যান্য সাহিত্যিক বা রাজকর্মচারীর থেকে আমার স্বাতন্ত্র পুরোপুরি বজায় থাকে।'

'তাই হোক।' গ বলল, 'তুমি কি দেখতে পাচ্ছ ঐ দিব্যকান্তি, বিষাদাতুর রাজহংসীর সুর মূর্চ্ছনাময় গ্রীবা ভঙ্গিমা, আর ডানার মত ছন্দ হিন্দোল নবনীত হস্তযুগল, বিশ্বের যাবতীয় শুভ প্রসন্নতার উজ্জ্বল প্রতিমা এই বারাঙ্গনা যৌবনের বিরল উপমা। ললাট তার তুহিন, হৃদয় তার তুষার, অপাঙ্গ চাহনিতে ম্যাডোনা, অলকে তার কমলা কুসুম নয়তো পদ্মপত্র। ক্ষণিকের জন্য ওকে স্পর্শ করেনি পাপচিন্তা, মানেনি কখনো নারী পুরুষের ভেদ। এমন পবিত্র হয়েও সে নিজেকে আড়ালে রাখতে পারেনি বহু প্রেমাস্পদের ব্যাকুল বাসনা থেকে। একটুও না বাড়িয়ে বলিতে পারি, আমার জানা মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পুরুষই ওকে পেতে চেয়েছে সবচেয়ে কাছে, প্রার্থনা করেছে তার প্রেম। তবু বলব, ওর বাঁদিকের মহিলাটির চেয়ে সে-ও দশগুণ কম সুন্দর। দ্যাখো, কি অনায়াসেই ঐ সাহসিকা মেলে ধরেছে তার যুগল স্তনমণ্ডল, যে দুটি কোনরকমে একত্রিত হলেই পেত ভু-গোলকের আকৃতি। অথবা দ্যাখো ওর ডান পাশের মহিলাটিকে। এমনই স্বল্পবসনা যে অকুতোভয়ে সে তার বিচ্ছুরিত দেহ-লালিমায় সবাইকে বিভোর করে দেবে। যদি না হিসেবে আমার ভুল হয়, তাহলে বলব, এই মেয়েটিও কিন্তু তোমার কালো চোখের মায়ায় মজেছে, তোমাকে দিচ্ছে প্রেমের প্রতিশ্রুতি, বহুবর্ণিল সংরাগ। অথচ সে তোমার দিকে কখনো সরাসরি তাকায়নি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার সুযোগ পায়নি, তবু সে দেখেছে তার বুদ্ধিদীপ্ত বঙ্কিম নয়নে। হ্যাঁ, ওর চোখের আড়াল হবার কারো জো নেই, এমনকি পেছনেও কি হচ্ছে সে তা জানতে পারে, যেন সেদিকেও লাগানো আছে তার একজোড়া চোখ। যদি তুমি ওকে পেতে চাও তাহলে বেড়ালের মত আদর পাবার জন্য ছটফট করবে না, গায়ে-পড়া ভাব ওর একেবারে অসহ্য। হাভাতের মত চোখ দিয়ে ওর রূপনির্যাস গিলে তো খাবেই না, বরং ওর দিকে না তাকিয়ে ভগ্ন-হৃদয় পুরুষের মতো অবিচলিত ভাবেই বিনম্র সহজাত সম্ভ্রমসহ কথা বলবে। হাবে-ভাবে কখনোই বোঝাবে না তাকে 'ভিক্ষা চাই করুণা তোমার'। বরং বুঝিয়ে দেবে তুমিও আত্মমর্যাদা সচেতন পুরুষ। এমনি করেই ধীরে ধীরে ওর কাছে জানতে চাইবে কি করলে সে হবে আনন্দিত। কথার পিঠে আসবে কথা, দেখতে দেখতে সে-ও দেবে তোমায় অবাধ স্বাধীনতা। চাউনির ওঠানামায় যাতে রুচিসিন্ধ নম্রতা বজায় থাকে সেদিকে রাখবে সতর্ক দৃষ্টি; বিশেষ করে যখন সে তার সিল্কের মত মায়াবী স্তনের বসন খসাবে, বাঁধন করবে শিথিল, সে সময় যেন লোভে চকচক না করে তোমার চোখ। অন্তত সে সময়টা সংযমী হবে। ভাব দেখাবে যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছ না। আলোচনায় ফুটিয়ে তুলবে প্রেমের স্বর্গীয় সুষমা, আত্মার গরিমা। জানি, ঐ ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতিতে ওরকম কথা বলা কত অস্বাভাবিক। কিন্তু দেখবে সে-ও কেমন ধীরে ধীরে বদলে যাবে, দেখা দেবে বুকের ভিতরে অরুণের অনুভব, হয়ে উঠবে ইন্দ্রিয় পরবশ। এবার শুরু তোমার

পালা যতক্ষণ পারবে আদর করবে, ঠোঁটে গলায় ভয়ংকর ভাবে খাবে চুমো, হ্যাঁ, চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেবে ওকে গভীরভাবে। কিন্তু ওর সংগে কথা বলার সময় সবসময়েই মাদাম বলতে ভুলবে না। অন্তত প্রতিটি বাক্যের শুরুতে তিনবার মাদাম বলবে। জানো, আমিও ওকে গভীরভাবে ভালবাসতাম। ভালোবাসা সত্বেও সে আমার সংগে ঝগড়া করেছে। আসলে কি জানো, মেয়েছেলেকে তো আর সব সময়েই অর্থহীন সম্ভ্রম করা যায় না।'

'আমি অবশ্য এমন কিছু করব না যা হয়ে উঠবে রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চকর। তবে বলতেই হবে, ব্যাপারটা অদ্ভুত, একই সংগে অভিনয় আর দানবিক।'



'দোস্ত্, পৃথিবীর মতই এসব বড্ড পুরনো। রোজই তো কত কি ঘটে, আর তা যে সব এক নয়, সেটা নিশ্চয়ই মানবে। ওর সংগে নিজেকে না জড়ালে বোধ হয় তুমি ভুলই করবে। তবে, মনে রেখো, ওর আকর্ষণে যে-ই জড়ায়, সে-ই করে ফেলে নিশ্চিত মরণ-কামড় পাপ। এমনকি আলতো চুমোয় ঝরে পড়বে বিষ। আর এসব কারণেই অন্যদের চেয়ে ওর সংগেই আমার দীর্ঘকালের অন্তরংগ অধিবাস। যদি না ও আমাকে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয়, আমি ওর সংগেই থাকব। আমাকে ও মুগ্ধ করেছে, রয়েছে তার সূক্ষ্ম সুকুমার শিল্পবোধ, আনন্দ দেবার নিপুণ কলাও তার করায়ত্ত। ফলে প্রতিবারই ওর সংগে যখন সংগম করবে তখন পাবে নিত্য নতুন স্বাদ। আর এই সব কিছুর জন্যেই ও আদায় করে আমার সম্ভ্রম। সামনের দিকে একটু তাকালেই দেখবে, ওর দশজন প্রেমিকই শপথ করে বলবে যে ও হল বিশ্বের পবিত্রতম সৃষ্টি। অথচ ও এর বিপরীত।'

'এমন মহীয়সীর বয়সটা কত হবে বলতে পারো?' জিজ্ঞাসা করলাম গ-কে। 'কেননা ভালমত খুঁটিয়ে দেখেও ওর বয়স কত অনুমান করতে পারিনি।'

'আরে, সেটাইতো রহস্য। যে আমি মেয়েদের বয়স প্রায় মিনিট সহ হিসেব করে বলতে পারি বলে গর্ববোধ করি, সেও আবিষ্কার করতে অক্ষম ওর আসলবয়স। তবে অনুমান,

আঠাশ থেকে ছত্রিশের মধ্যে হবে। আমি ওকে দেখেছি পোশাক পরিহিতা অবস্থায়, দেখেছি অনাবৃত রূপেও, কিন্তু ধরতে পারিনি ওর বয়স। আমার অভিজ্ঞতা ওর কাছেই খেয়েছে প্রথম ঠোক্কর। ওকে দেখলে অষ্টাদশী বলে ভ্রম হয়, অথচ এত কম বয়স ওর কখনোই হতে পারে না। তনু তার কুমারীর, আত্মা বেশ্যার, এ হল সময়ের কুহেলি-প্রতিভা। আর সে রহস্য উন্মোচন করতে হলে প্রয়োজন ইস্পাতের বুকে ব্রোঞ্জের হৃদয়। এর তো এসব কিছুই নেই। সে কারণেই এর বয়স মনে হয় ছত্রিশ; কিন্তু তা আমি হলফ করে বলতে পারব না। জানতেও চাই না। যে আঁধারে রয়েছি সেই আঁধারেই থেকে গেছি আমি।'

'ওর কি এমন কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই যে এব্যাপারে আলোকপাত করতে পারে?'

'না। মাত্র বছর দুয়েক আগেই ও এখানে এসেছে। কোথা থেকে এসেছিল সঠিক বলতে পারব না। এতে অবশ্য সব মেয়েরই লাভ। এমন এক আশ্চর্য বিভা ছড়িয়ে রয়েছে ওর মুখে যে প্রথম দিন থেকেই ও সব বয়সেই এখানে মানানসই।'

আরো কয়েকজন মহিলার প্রতি সে আমার নজর কাড়ল। দেখলাম তাদেরও। কিন্তু সেই যে চুল্লীর পাশে রক্তিমবসনা সুন্দরীকে দেখেছি তাকেই আমার ভাল লাগল সবচেয়ে বেশী। তার কথা ভাবলেই আমার প্রাণে ছড়িয়ে পড়ে আবেগের কুংকুম আবীর। সকলের মধ্যে থেকেও সে আলাদা, ভিন্ন ধাতুতে গড়া স্বতন্ত্র স্বরাট।

সারাটা বিকেল কাটল এইসব লাস্যময়ীদের সঙ্গে। আরো অনেকের কাছে গেলাম কথাও বললাম কারো কারো সঙ্গে। এক-একজন এমন ভঙ্গিমায় আমাকে আদর করার ইঙ্গিত দিল যা ভাবলে এখন অবাক হই। অনেকেই যথার্থ সুন্দরী, সত্যিসত্যিই কামনা জাগানোর তীব্র বহ্নি। অনেকের সঙ্গে দু-চারকথা বললাম, কিন্তু সবচেয়ে বেশী সময় কাটালাম লাল পরীর সঙ্গে। যে আমাকে প্রায় পাগল করে দিল আর এখন আমি আমার এলোমেলো ভাবনাগুলোকে সংহত করে ছাঁচে ঢালতে চাইলাম; দিতে চাইলাম নতুন মূর্তি। অবশ্য ওর চাউনিতে কোন মদমত্ততা ছিল না প্রথম বরং ছিল বেশ কঠিন, তবু মনে হয়েছিল ও আমার বহু চেনা। বলতে চেয়েছি, 'কোথায় তোমাকে দেখেছি বলতো, কিছুতে মনে না আসে?' ভুরুর বঙ্কিমে তার আলোর প্রসূন; গোলাপী আভায় উদ্ভাসিত মখমল বরতনু, কটিতটে দ্যুতির বিলাস। ধীর স্থির নম্রকণ্ঠ আলাপে ছিল সচেতনতার ছাপ, মাপা কথা মাপা পরোক্ষ উক্তির শোভনতায় সে কথাগুলো আরো সুন্দর বলে মনে হল। কোন কোন শব্দ আবার অর্ধোচ্চারিত; কখনো কখনো থাকত নীরব। প্রতিটি অক্ষরই ওজন করে বলা, প্রতিটি অক্ষরই অর্থময়; তার নীরবতা ছিল ইঙ্গিতবহ; বলার চেয়ে না বলা বাণীই অনেক সময়ে অব্যর্থ হয়ে ওঠে এ ও ঠিক তাই।

প্রথম আলাপ কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। দীর্ঘস্থায়ী না হলেও তা ছিল স্মরণীয়, মোহন মধুর। কিছু কথা হল গান বাজনা নিয়ে, সঙ্গীতের জগত ছেড়ে একসময় সে কথা পেঁছে গেল অপেরায়। আসলে গৎবাঁধা কথা হল না। হয়তো প্রেমের ক্ষেত্রে

এরকমই ঘটে থাকে। যা বলব বলে মনে মনে আগের থেকে জল্পনা করি, মুখোমুখি হলে সেকথা আর মনে থাকে না, অথচ কোথা দিয়ে কেটে যায় সময়। নিরবধি কঠিন সময়। মেয়েরাও চায় তত্ত্বকথা ছেড়ে থিয়েটার অপেরা নিয়েই বেশী কথা বলতে। হাল্কা, ফুরফুরে কথাবার্তায় তারা অনেক বেশী আনন্দ পায়। কিন্তু এ ধরনের হাল্কা কথাবার্তায় যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারব তা কল্পনাও করতে পারি নি। অথচ কি আশ্চর্য ! সময় কেটে গেল তরতরিয়ে। আমার জীবনে এই প্রথম একটি সন্ধ্যে কাটল হাল্কা চালে, আত্মায় নেমে এল মুক্তির হিল্লোল। ভেতরে ভেতরে দারুণ লাগছিল, কিন্তু লুকোতে চাইলাম নিজেকে, আশ্রয় নিলাম ভণ্ডামির। আমার মুখে হয়ত সন্দেহের ছায়া নেমেছিল, যেমন করে স্ত্রীর আচরণে অনেক সময়েই জাগে স্বামীর মনে সংশয়। বুঝি, কপট হওয়া খুব কঠিন। অন্তত, ভণ্ডামি আমার ধাতে সয় না, যা ভাবি তাই বলি সোজাসুজি। তবু বলব, ওর ক্ষেত্রে আমি বিফল।

মেয়েটি সত্যিই চমৎকার। গ-কে ধন্যবাদ যে যে আগের থেকেই আমাকে ওর সম্পর্কে অনেক কিছু সাবধান করে দেয়। ওর খেয়ালী মনকে যে আমি এমনভাবে ছুঁতে পারব তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

বন্ধু, তুমি নিশ্চয়ই এখন ভাবতে পারো সে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে আমার কথা বলার ইচ্ছেটি ছিল আলাদা ধাঁচের। মাঝে মাঝে কথার ফাঁকে ফাঁকে হাসতাম, অন্য কারো উপস্থিতি ভ্রূক্ষেপ না করেই বেশ চালাকি করেই মজা করতাম, খুনসুটি করতাম। এই মহিলা সম্পর্কে আগের থেকেই গ জানিয়েছিল কবিরা এর প্রতি অনুরক্ত নন।

মেয়েটি নিজের চারদিকে এমন বাস্তব পরিবেশ তৈরি করত যা ছিল গাদ্যিক, কখনোই ওর কথাবার্তায় ফুটত না কবিত্ব। কিন্তু সে বুদ্ধিমতী। ভাবভঙ্গিটাও সুস্থ রুচিকর নয়। অঙ্গভঙ্গিতে সে এমন ওস্তাদ যে মনে হবে ওর মাথায় সব সময় নরকের খেলাই ঘুরপাক খাচ্ছে। অবাক কাণ্ড হল, এর সঙ্গেও নিজেকে মানিয়ে নিতে আমার কষ্ট হয় নি। ওকে দেখলেই আমার মাথায় দুনিয়ার যাবতীয় বাজে ব্যাপারগুলো চাগাড় দিয়ে ওঠে। শিরায় শিরায় আগুন জ্বলে, চোখ চক চক করে, জিভ ভিজে যায়। মদের জন্য হাঁপিয়ে উঠছিল গলা, পেলাম তাও। অনেকখানিই গিললাম আর গিলতে গিলতে কখন যে মাতাল হয়ে উঠলাম জানি না। ইচ্ছে হল ওর পুরুষ্টু হাঁটুর ওপর কয়েক ফোঁটা মদ ঢেলে দিই; ঠোঁটে প্রচণ্ড জোরে চুমু খাই। ইচ্ছে হল ওর গাউনটা একটু তুলে দেখি মোজাটা কতদূর রয়েছে, অন্য কিছু তার পরিধানে রয়েছে কিনা; ইচ্ছে হল জোরে জোরে খিস্তি মেশানো গান গাই, শিস দেবার ভঙ্গিতে জিভকে দুভাঁজ করে নিয়ে ওর মুখের ভিতর ঢুকিয়ে সমস্ত আগুন শুষে নিই। একবার পাইপ ধরাতে ইচ্ছে হল, ইচ্ছে হল জানালাটা ভেঙে ফেলি। হ্যাঁ, আমি তখন জানোয়ার বনে গেছি, জান্তব ইচ্ছাই লকলকিয়ে উঠল, থাপ্পড় মারতে চাইলাম কাকে যেন; হোমরকে সঙ্গে নিয়েই নতজানু হতে চাইলাম মাংসল উরুর কাছে। এখন আমি বুঝতে পারি ইউলিসিসের সঙ্গীদের রূপকটির অর্থ, বুঝতে পারি কেন তাদের শুয়োর বানিয়ে দিয়েছিল সার্সী।

সার্সী ছিল উজ্জ্বল প্রাণবন্ত, ঠিক যেমনটি এখানকার এই রক্তিমবসনা সুন্দরী। স্বীকার করতে সংকোচ হয় যে আমি নিজের মধ্যে এমন পিশুন স্বভাবী এক কামার্তের উপস্থিতি দেখলাম যা আমাকে দিল নতুন অভিজ্ঞতা। সেসব ভাবলে এখন শিউরে উঠি, নিজের ভেতরকার লম্পটিকে ভাবলেই কেমন আঁতকে উঠি।

আশ্চর্যের কথা হল, যে দুষ্ট ক্ষত আমাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলেছিল তার বিষয়ে ভীতি ছিল আমার সামান্যতম মাত্র। চাইছিলাম হয়তো লম্পট কামুকীকে ছেড়ে দিতে, কিন্তু পারলাম না। টের পেলাম, নিজের আসনেই নিজে বন্দী। আমি শৃঙ্খলিত।

অবশেষে নিজের মুখোমুখি হলাম, ফালা ফালা করে চিরলাম নিজেকে, সরিয়ে আনলাম ওর খপ্পর থেকে। মুক্তি পেলাম, আমি মুক্তি পেলাম ঐ লম্পট নারীর জ্বলন্ত কামনা থেকে। এক সময় বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তোলপাড় চলছিল, এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল চিন্তাভাবনা, স্থির করতে পারছিলাম না ইতিকর্তব্য। অস্থিরতায় দুলছিলাম বিনয় আর প্রেমাসক্তির মাঝখানে। বিবেকের কাছে দীর্ঘ জবাবদিহির পর বুঝতে পারলাম যে এর মধ্যে পাচ্ছিলাম অমল আনন্দ। আনন্দের ভিতর মিলছিল সুতীব্র মত্ততা। ভালভাবেই আমি টের পেলাম যে উভয়কে সমান ভালবাসি না, বরং একের চেয়ে অন্যকে পছন্দ করি একটু বেশী মাত্রায়।

বন্ধু, ওদের হাবভাব চালচলন বিচার করে স্থির করলাম যে এই রমণীদেরই ভিতর কাউকে নিবেদন করব প্রেম, হয়তো বা দুজনকেই দেব ভালবাসা, কিন্তু জানি পুরো তৃপ্তি আমাকে কেউই দিতে পারবে না। অবশ্য, এ-ও ভাবতে পারি না যে আরো অনেক সুন্দরীর একদিন দেখা পাবো। যাই হোক, গ-এর উপদেশ মেনে চললাম অক্ষরে অক্ষরে। বুঝলাম কাউকে না কাউকে মিসট্রেস হিসেবেই পাব। হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসছে যে গাঢ়তর স্বর তাতে নিজের কাছেই নিজে অবাক হচ্ছি, স্বকৃত চালাকি দেখে তাজ্জব বনে যাচ্ছি। তাহলে কি আমি প্রতারক? প্রেমের ক্ষেত্রে কি ভণ্ডামিই আমার পেশা? অথবা যে মেয়ের আলতো হাসিও আমাকে পাগল করে দেয় তাকে কি আমি সত্যি সত্যিই ভালবাসি না? জানি না, কিছু জানি না। অনেক জায়গায় আমি ঘুরেছি, তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি ভালবাসার পাত্রী, ভগবান আমার জন্যে যাকে তৈরী করেছেন তাকে পাবার জন্যে গিয়েছি মাঠে, বস্তিতে, রাজপ্রাসাদে, শুঁড়িখানায়। সে মেয়ে হতে পারে ঝি বা রাজকন্যে, হতে পারে, সন্ন্যাসিনী বা বারবণিতা।

এসব উদ্ভট ভাবনায় নিজে বুঁদ হলাম। তবে কি পাগল আমি? না, না, না। বুঝলাম এ-মেয়ে না পাই তো অন্য মেয়ে আসবে, পৃথিবীও যেমন চলছে তেমনিই চলবে, দিনের পর আসবে রাত, বদলাবে ঋতু, সবই চলবে স্বাভাবিকভাবে। আসলে আমিই বিচিত্র, আমিই রহস্যময়, কোন কিছু সহজভাবে নিই না, কাউকে সহজভাবে দেখতে পারি না। দৃষ্টিটাই ঘোলাটে হয়ে গেছে, নিজের কাছেই নিজে জটিল,

দুর্জ্ঞেয়।
এর কারণ বোধ হয় নিজেকেই আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসি। জানি, পৃথিবীর সব মানুষই নিজেকে ভালবাসে অধিকতর, তবে আমি বড্ড বেশী আত্মকেন্দ্রিক। অহং বোধটিও তীব্র। শামুকের মতই নিজের খোলসে নিজেকে গুটিয়ে নিই আমি বরাবর। আমাকে ঘিরেই আমার ধ্যানধারণা, ভাবনা চিন্তা, কাজকারবার। নিজের ভাবনাকেই মনে করি ঠিক, আর যা ভাবি তার জন্য সব কিছু ত্যাগ করতেও হই প্রস্তুত। এভাবে যখন বড়ো বেশী ডুবে যাই স্বগত চর্চায় তখন নিজের আত্মাটিকেই ঠিকমত পরীক্ষা করতে পারি না কোন অনুবীক্ষণের সাহায্যে। বরং তার বদলে আমাকে দাঁড়াতে হবে সত্যের মুখোমুখি, লড়তে হবে বাস্তবের সঙ্গে। ওদের কাছে জানব মেয়েদের এমন কী সম্পদ আছে যা তারা আমাকে দিতে পারে। কতটুকু আনন্দ দেবার ক্ষমতা তাদের আছে জানি না। তবে ভাবি এক বুক স্বপ্ন নিয়ে আমি যেন কোনদিন ছায়া না ভালবাসি; ছায়াকে না আলিঙ্গন করি। ভাবগুলো আমাকে এত বেশী উদ্‌ভ্রান্ত করে এত বেশী আগুন ছড়ায় যে দৃশ্য বস্তুও আবছা লাগে, চোখে ঠিক মত দেখতে পাই না। কি আছে আর কি নেই তা আমার কাছে একই হয়ে ওঠে। ফলে যে মেয়েরা অন্যের কাছে অপ্সরী, উর্বশী, রম্ভা আমার কাছে তারা আর তা হয়ে ওঠে না, তাদের আমি স্তাবকের চোখ নিয়ে সেভাবে আমল দিতে পারি না। আবার যে ছবি অন্যের কাছে খারাপ আমার কাছে তা প্রিয়, লোভনীয়। যে কবিতা ভোঁতা আমার কাছে তা হয়ে ওঠে মননদীপ্ত, সূক্ষ্ম অনুভূতির অনুপম কারুকার্যে ভরা। অবাক হই না আর যদি কখনো বুকের ভিতর বহু পূর্ণিমার দীর্ঘশ্বাস নিয়ে তারায় তারায় ঘুরে ফিরে রচনা করি ভাববিভোর শোকগাথা বা স্মৃতিচারণ। যদি কোন বিশ্রী বৃদ্ধা; কুৎসিৎ মেয়েছেলে বা বেশ্যার প্রেমে পড়ি, বরং সেটাই হবে আমার চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক পরিণতি। অথবা এ-ও হতে পারে যে, আমার ভালবাসার দাম দিতে পারে এমন মহার্ঘ মহিলার সন্ধান না পেয়েই আমি হয়ে উঠেছি আত্মমুখী। নিজের ঢাক নিজেই পেটাই। নিদারুণ বিপর্যয়ের হাত থেকে আত্মরক্ষার অছিলায় বারবার আয়নার সামনে দাঁড়াই, নদীতে সাঁতার কাটি। বাস্তবিকই আমার এই স্বপ্নালুতা ও খেয়ালীপনার জন্যে ভিতরে ভিতরে আমি অস্থির হয়ে পড়ি; কোন অস্বাভাবিক ভয়ংকর কিছু ঘটে যাবার সম্ভবনায় হয়ে পড়ি শঙ্কিত। নাহ্; সমস্ত বিষয়টাই আমাকে ভালমত বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। খুব সতর্কতার সঙ্গেই বিচার করে দেখতে হবে কোন দুর্যোগের সম্ভাবনা আছে কিনা। তবে বন্ধু, আজ আর বেশী নয়। বিদায় নিতে চাই আমি। বিদায়, বন্ধু, বিদায়। এখন বেরুতে চাই আমি আমার লোহিতবসনা সুন্দরীর সন্ধানে। ওরই সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় যেতে চাই অভিসারে। ওরই জন্যে ছটফট করছে এখন হৃদয় ; রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মনে ভোর; তাই প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর। আমার মন হারিয়ে যেতে চায় ওর ঐ যৌবনের বনে, ডুব দিতে চায় রূপের সাগরে। আর এভাবেই হয়ত এড়াতে পারব বিপুল বিপর্যয়। যদিও সে 'দেবী প্রতিমা' তবুও মনে হয় না আধ্যাত্মিক আলোচনায় আমরা

কাটাবো বেশীক্ষণ। হ্যাঁ, সযত্নেই এক পাশে সরিয়ে রাখব আমার তত্ত্বকথা, আরেক পাশে রাখব ওকে, রক্তিমবসনা সুন্দরীকে। প্রাণ ভরে উপভোগ করব ওর দেহমাধুরী; আত্মস্থ করব ওর বিভূষণ। জানি না কতদূরে এই ইচ্ছা পূরণ হবে; তবে এর চেয়ে আপাতত কোন সঠিক সিদ্ধান্ত আর আমার জানা নেই। গোলাপসুন্দরীই আমার প্রাণ, আমার স্বপ্ন, আমার ঈশ্বরী। তাই বলি, বন্ধু, বিদায়। আবার বলি, বিদায়।

রসেটি

রক্তিমবসনা সুন্দরীই আমার প্রেমিকা। বিশ্বাস করো এটাই আসল ঘটনা, যা আমার ভেতরে এনেছে স্থিরতা, দিয়েছে জীবনের আর এক মানে বোঝার সুযোগ। না, আমি আর সেই স্কুলের ছাত্র নই যে ঠাকুরমা-দিদিমার কাছে শুনতে চায় গল্প, পেতে চায় রোমাঞ্চকর অভিযানের স্বাদ। না, কোন শর্তায়ু নারীর উদ্দেশে রচিত প্রেমের কাব্যপাঠে আমি অভ্যস্ত নই। বিশ্বাস করো বন্ধু, আমি লক্ষ্য করেছি এখানকার সব লবঙ্গলতিকাই কেমনভাবে যেন আমার দিকে তাকায়, তাদের চোখে খেলে বেড়ায় প্রচ্ছন্ন সম্ভ্রমবোধ, কিন্তু সেই বিশেষ একজনের প্রতি আকৃষ্ট হলাম, দুর্বলতা দেখালাম, অমনি বাকি সব মেয়েই ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠল, বাঁকা চোখে দেখতে শুরু করল; চাল চলনে ফুটে উঠল ছিনালিপনা। অন্যদিকে এখানকার নিত্য অতিথি খদ্দেরদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াটি হল উল্টো। এমনিতেই তারা কম কথার লোক, তা আরো বেড়ে গেল। আসলে তাদের অনেকেই মনে মনে আমাকে যে যার নিজের বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভেবে বসেছিল। বেশ মনে পড়ে, ওরা আমার সমালোচনায় মাঝে মাঝেই মুখর হত, আমার পোষাক-পরিচ্ছদ, হাঁটার ভঙ্গি, কেশবিন্যাস নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করত। কিন্তু মেয়েরা আবার আমার মধ্যে দেখত সপ্রতিভা, তাদের রুচিমাফিক আদর্শ পুরুষের ছায়া। স্বাভাবিকভাবেই আমার প্রতি মেয়েদের ছিল দুর্বলতা, এমনকি কেউ কেউ ওপর-ওপর শ্রদ্ধাও করত।

এ বাড়ির প্রধানাটি প্রথম প্রথম আমার রুচি দেখে আত্মশ্লাঘা বোধ করত, মনে করত তার প্রতি বোধ হয় আমার দুর্বলতা জন্মেছে, অনুরাগ বেড়েছে। ফলে সেও কিছুদিন তার স্ব-কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে যখন-তখন মেজাজ দেখাত। অবশ্য আমার কাছে এসবের কোন দাম ছিল না, আগের মতই সব এক বলে মনে হল। মেয়েরা স্বাভাবিক-ভাবেই মেয়েদের সম্পর্কে একটু ঈর্ষাপরায়ণা; এর বেলাতেও ঠিক তাই। কাউকেই সে

সহজভাবে নিতে পারছিল না। কিন্তু এক সময় সে বুঝতে পারল তার ভ্রান্তি; ধরতে পারল, আশা শুধু মিছে ছলনা। ধীরে ধীরে অবশেষে শান্ত হল, সহজ-স্বাভাবিক হল, চিৎকার-চেঁচামেচি বন্ধ করল। এক কথায় নিজেকে গুটিয়ে নিল।

আগেই বলেছি, রক্তিমবসনা মহিলাটির প্রতিই আমি অনুরক্ত, সেই আমার প্রণয়িনী। কিন্তু জানি শুধু এই তথ্যটুকু তোমাকে খুশী করতে পারবে না। নিশ্চয়ই তার নাম জানতে তোমার মন চনমন করছে। কিন্তু, ওর আসল নামটা এখন বলতে পারব না; বরং সেটা তোলা থাক। তবে ওকে তুমি রসেটি বলে ডাকতে পারো, আমার মনে হয় এই নামটাও সুন্দর। ওর রূপের সঙ্গে মানানসইও বটে।

এবার নিশ্চয়ই আসল কাহিনী জানার জন্যে নড়ে চড়ে বসলে; কি তাই না? বলছি-বন্ধু, ধীরে ধীরে সবই বলছি। নিশ্চয় তোমার ইচ্ছে জাগছে যাতে সবিস্তারে বলি আমার প্রেমের অভিযান। কিভাবে আমার প্রেম হল সঞ্চারিত, সঞ্জীবিত, মুঞ্জরিত—আমি তা বিষদভাবেই বলব। বলব তোমাকে, নিছক দর্শক থেকে আমি কেমন করে অভিনেতা হয়ে উঠলাম, অনেক সুন্দরীর ভিড় থেকে বেছে নিলাম উজ্জ্বলতমা রসেটিকে; ওকে ভালবাসলাম। না, বন্ধু, আমাদের রোমান্সে কোন মেঘের ছায়া পড়েনি, ছিল শুধু গোলাপের বর্ণময় বিভা। ওর চোখের কোলে যখন জলের ফোঁটা দেখা দিত কোন কারণে তখন তা মুক্তোর মত টল টল করত; তাতেও ছিল যেন আনন্দের রেশ, স্বর্গের সুসমা ঘিরেছিল আমাদের দুজনকে। আমরা বড় দ্রুত কাছাকাছি এসেছিলাম, পরস্পরকে ভালবেসেছিলাম। সেখানে ছিল না মন্থরতা; ছন্দের তালে তালে দ্রুত বদলাত পট, সবকিছুই গতিময়, বর্ণময়।

তবে গোড়ার দিকে আমি একটু সচেতন ছিলাম, নিরাপত্তার অভাব বোধ করেছি, কেননা আমার রাজকন্যা ছিল খানিকটা হিসেবী। প্রথম প্রেমে মানুষ সর্বদাই চঞ্চল থাকে, উচ্ছল হয় বেশী, সেটি তার ধাতে ছিল না। সব কিছুই সে বিচার করে নিত; দিত সবকিছুরই কিছু না কিছু দাম। কেমন করে খেলাতে হয় পুরুষকে, কেমন করে ধীরে ধীরে কোমল স্পর্শে কুঁড়ি থেকে ফোটাতে হয় ফুল, চলতে হয় ধীরে সুস্থে। সে জানত প্রয়োজনে কিভাবে দমিয়ে রাখতে হয় উদ্দাম আবেগ। ভিতরে ভিতরে মমতা রাখতে হয় প্যাশনকে প্রতিরোধের। বাস্তবিকই রসেটি ছিল প্রেমে পারঙ্গমা। পছন্দসই পুরুষের কাছেও সে নিজেকে বিকিয়ে দিতে চায় না প্রথম সুযোগে।

যাক্, গোড়া থেকেই বলি ওর কথা। ওকে আমি বহুদিনই দেখেছি একই জায়গাই দাঁড়িয়ে থাকতে। চোখে চোখে কথা হত, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কারো কাছে যাই নি, ডাকি নি। একদিন কি হল কে জানে, ও আমায় ইশারা করল, ডাকল; কাছে গেলাম আমি। খুব সতর্ক ছিলাম প্রথম প্রথম, ভেবে চিন্তে কথা বলতাম। তারপর অনেকবার ওর কাছে গেছি, ঘরে গেছি। দেখতে দেখতে যাবার মাত্রা আমার বাড়ল; এমনকি দিনে তিন-চারবার ওর ঘরে গেছি, কি যে কথা বলতাম সব মনে নেই। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ওর সম্পর্কে অনেক কিছু কল্পনা করতে শুরু করলাম; আমার শিরায় শিরায় ও ছড়িয়ে দিল কিসের নেশা। আর তার মাত্রা দিনকে দিন বাড়তে লাগল। বুঝলাম

রূপে মুগ্ধ, আসক্ত। আর আশ্চর্য মেয়েটিও প্রতিবারই এমনভাব দেখাত, এমন আচরণ করত যেন এইমাত্র প্রথম আমি ওর কাছে গেছি। সবসময়েই সে যেন টাটকা গাছ থেকে সদ্য তুলে আনা তাজা ফুল। হয়তো দুপুরে ওর কাছে ছিলাম, তারপর একসময় বাইরে বেরোই। ফিরে আসি বিকেলে মাঝখানে ওর কাছে আমি ছিলাম না। কিন্তু বিকেলে যখন আবার যাবো তখন সে এমন ভাব দেখাবে যেন এই মাত্র আমি ইষ্ট-ইণ্ডিজ ঘুরে ওর কাছে এসেছি। আর আমিও তাতে এত বেশী অভিভুত হয়ে পড়তাম যে ভেবে পেতাম না কিভাবে ওকে জানাব আমার কৃতজ্ঞতা। সত্যি সত্যিই ও আমাকে ভালবাসত, গ্রহণ করত তার সর্বোত্তম উষ্ণ উল্লাসে।

রসেটি, হ্যাঁ, এ-নামেই ওকে ডাকব এখন থেকে। সে সত্যিকারেরই নিপুণা মহিলা; জানত কেমন করে পুরুষকে বশ করতে হয়, আবার কেমন করে পুরুষের বুকের ভিতর উম্মাদনা জাগিয়ে তুলে ক্ষণিকের জন্যে নিজেকে সরিয়ে নিতে হয়। কখনো দুজনে মুখোমুখি বসে, কিন্তু কারো মুখে কথা নেই; অথচ আমি ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে পড়েছি, সে সবই লক্ষ্য করত, তবু নিত আমার ধৈর্যের পরীক্ষা। সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানো, ওর এরকম ব্যবহারে আমার কখনো রাগ হত না। অবশ্য আমি তো অন্যরকম ছিলাম। তুমি তো জানো বন্ধু, কেউ আমার ইচ্ছাকে বাধা দিলে কেমন ক্ষেপে উঠি; তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলি। অথচ রসেটি, আমার রসেটির উপর রাগ করার সাহসটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলাম। আসলে ওর কাছে আমি ছিলাম নিরাপদ আর আমাকেও সে বুঝিয়ে দিয়েছিল সেই হল আমার আশ্রয়, প্রেমের সঞ্জীবনী। পারস্পরিক বিশ্বাস হল গভীর, আস্থা বাড়ল প্রচণ্ড। ওর ব্যবহারে ছিল আন্তরিকতার আসল স্পর্শ, মুক্তির বাতাস। ফলে ওকে বিশ্বাস করতে শিখেছিলাম প্রচন্ডতায়; বলতে চেয়েছি; রসেটি, তুমিই শুধু চেতনাচেতন। না, ওকে হারাতে পারব না; প্রেমের কঙ্কন আমি লুটাবো না ধুলোয় ধোঁয়ায়। জানি, ওর শরীরেই ফোটে আমার আদিগন্ত স্বপ্নসূর্যমুখী। হ্যাঁ বন্ধু, রক্তের মতনই সে কোলাহলে, নিঃসঙ্গ আমার চেতনায় আবহমানের স্মৃতি গন্ধ স্বাদে ঝলকিত। ওকে আমি ভালবাসি, সকলের কাছে বলি, ভালবাসি, ভালবাসি। অথচ, আমি তো আরো কত মহিলার কাছে গেছি; সঙ্গ পেয়েছি তাদের মধ্যেও দেখেছি কখনো খোলামেলা ভাব, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু তারা আমার প্রাণের ওপর মায়াবী হাত বুলোতে পারেনি, তাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে দেখেছি সংশয়ের মেঘ, অবিশ্বাসের ছায়া। তারা কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি আমার উপর, যে আশ্চর্য আবেগে দুর্মর এ জীবনে আলো চেয়েছি, খুঁজেছি সিন্ধ পটভূমি; তারা তা দিতে পারেনি। উল্টে তাদের উপস্থিতি কখনো আমায় বিচলিত করছে, ছড়িয়ে দিয়েছে উৎকণ্ঠা উদ্বেগ।

সাধারণত যারা আমাকে একটু বিশেষ চোখে দেখত তাদের চেয়ে বরং মনপসন্দ মহিলাদের কাছেই আমি হয়ে উঠি ভালবাসার অযোগ্য। এর জন্যে দায়ী হয়তো আমার সযত্ন আবেগমদিরতা। আর আমার অস্থিরতাই আমার সাফল্যের চাবিকাঠি। ফলে মাঝে মাঝে বড়ো বিষণ্ন হয়ে পড়ি; স্বপ্নে বিভোর হই; নিজের সঙ্গেই শুরু হয়

তখন নিজের প্রতারণা। কখনো কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত, রাগে রি রি করত শরীর; অথচ কামড় দেবার ক্ষমতা পেত লোপ। তবু এমন সব মন্তব্য বেরোত মুখ ফস্কে যা এক কথায় সাংঘাতিক, এমন কি নিজের ইচ্ছাকেও করে দিত বিমূঢ়; বিভ্রান্ত। কিন্তু রসেটিকে নিয়ে এরকম কোন অনুভূতিই আমায় পেয়ে বসে নি; যখন সে তার সর্বশক্তি দিয়ে আমার কোন ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করত তখনো ভাবিনি যে সে আমার ভালবাসার জাল থেকে মুক্তি পেতে চাইছে। তার ছিনালিপনাও আমার বেশ লাগত, বরং এধরনের আচরণ আমার কাছে হয়ে উঠেছিল সহনীয়, কেননা তা আমার আবেগকে করত উন্দাম, উত্তাল। তার দৃঢ়তার মধ্যেও এমন মোহিনী মায়া ছিল যা আমাকে দিত যন্ত্রণার প্রলেপ, আর তার নিষ্ঠুরতার গভীরে এক মানবিক বোধের জোয়ার ছিল যা সব রকম বিপদের সম্ভাবনা করে দিতে অস্তমিত। মাননীয় মহিলারা যখন সামান্যতম তাচ্ছিল্যও দেখান তখন তা আমার কাছে দুঃসহ, দুর্ভর। এঁরা সবসময়েই ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেন; কাজ ফুরোলেই চাকর দিয়ে পর্যন্ত জানিয়ে দেন সময় শেষ। আর আমার বুকের ভেতর তখন দুঃখ জাগে সেই সব পুরুষের জন্য-যারা কোন রমণীকে ভালবাসার জন্য অনায়াসেই বরণ করে নেয় দুর্ভোগ, অথচ তাদের সঙ্গে এঁরা এমন নির্মম ব্যবহার করেন কেন! সেই সব হতভাগ্য পুরুষের তো এমন আচরণ পাওনা ছিল না।

না, তোমাকে আশ্বস্ত করতে পারি এই ভাবে যে আমার প্রিয়তমা রসেটির মধ্যে এসবের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আমার যাবতীয় চাতুর্য আর বুদ্ধি দিয়ে ওকে বাজিয়ে দেখেছি ভাল করে, কিন্তু সে তার বুদ্ধিদীপ্ত ও ঋজু উত্তর দিয়ে হয়ে উঠেছে নয়নের মণি, ছাপিয়ে গিয়েছে সকলকেই। এ কথা সত্য যে আমি কবি-স্বভাবের নই; অন্তত তার কাছে আমি তা হতে চাইনি। গ-এর না বলা সত্ত্বেও আমি কিন্তু খুঁজে পেয়েছি ওর ভেতরে এক কবিমন। জীবনীশক্তি ও প্রাচুর্যে সে এত বেশী ভরপুর যেন সব সময়েই তার চারপাশে রয়েছে সুখের উপস্থিতি আর মেঘের ওপর তাই ওকে কেউ একা একা উড়ে যেতে দিতে চায় না। জীবন বলতে সত্যিকারের যা বোঝায় ও হল তারই উজ্জ্বল উপমা। নিজেকে আর অন্যকেও সে এমন আমোদিত করতে পারে যে দিবাস্বপ্নও তার কাছে হার মানে।

পৃথিবীর সেই সুন্দরতম স্বভাবটি রয়েছে রসেটির ভেতর যা মানুষেরই বোধগম্য; আকাঙ্ক্ষিত। সে হল প্রাণচঞ্চল, হাসিখুশি, সচেতন। যে কোন কাজের জন্য সে সদাপ্রস্তুত। হ্যাঁ, কথা বলার ভঙ্গিটিও তার একান্ত আপন। বাক্‌পটু রসেটির গভীরে রয়েছে দারুণ আকর্ষণী শক্তি, ভুবনমোহিনী মায়া। মিসট্রেসের বদলে সে হতে পারে অনেক বেশী পরমানন্দদায়িনী সঙ্গিনী। আমি যদি আর কয়েক বছরের বড় হতাম আর থাকত আমার কিছু পরিমাণ কম রোমাণ্টিক ধারণা তাহলে নিজেকে মনে করতাম পৃথিবীর সেরা ভাগ্যবান পুরুষ। কিন্তু—হায় আমার পোড়া কপাল। —আমি জরদ্গব, মূর্খ; খাঁটি নির্বোধ; চির অতৃপ্ত আমি তাই দুপুর দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকি; আর পুরো সুখী হতে গিয়ে হয়ে রইলাম অর্ধেক মাত্র।'

অবশ্য এই পৃথিবীর পক্ষে এ-ও যথেষ্ট, তবু মনে হয় এ-যেন কিছুই নয়, কিছুই হল না।

পৃথিবীর চোখে আমার এমন এক প্রণয়িনী ছিল যাকে ঘিরে অনেকেরই আবেগ হয়ে উঠত স্বপ্নিল, ঈর্ষা হয়ে উঠত কুটিল ফণিনী, আর উপেক্ষা করার মতো সাহস ছিল না কারো। উপর উপর আমার বাসনা পেল পূর্ণতা; আর কারো সংগে ঝগড়া বা রাগ করার রইল না কোন কারণ। তবু আমি দেখতে চাইনি এমন নাগরী। যদি কেউ অকস্মাৎ আমায় জিজ্ঞেস করত; আমার কেউ আছে কিনা; বিশ্বাস করি, নির্দ্ধিধায় বলতাম, না। বিশ্বের সব দেশের শ্রেষ্ঠ বারাঙ্গনাদের যা থাকে রসেটির মধ্যে তার সবই ছিল; ছিল ওর যৌবন, সৌন্দর্য; বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা। সব সত্ত্বেও আমার ভিতর ছিল এক ধরনের সন্দেহপরায়ণতা। ওর আচার আচরণে আমার প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি প্রকাশিত হলেও কেউ যদি মনে করত আমি তার প্রিয়তম প্রেমিক নয় তা হলেও আমার কিছু করার নেই। অনন্ত সেইসব সন্দেহবাতিক মানুষকে আমি একেবারে উড়িয়ে দিতে পারব না।

তাই বলে তুমি আবার ভেবে বসো না যে ওকে আমি ভালবাসিনা বা এটাও ভেবোনা যে সে আমাকে কোনো ব্যাপারে অসন্তুষ্ট করেছে। বরং ওকেই আমি ভালবাসি সব চেয়ে বেশী; হ্যাঁ, ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি। সত্যিই সে সুন্দরী, মদালসা। এমনিতে কেন যেন মনে হয় সে আমার নয়; সে আমার নয়, ব্যস্‌ এটুকুই যথেষ্ট। তার একটি মাত্র চুমোয় সে কি অমৃত আস্বাদ, বুকের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে অদ্ভুত রোমাঞ্চ, রক্তে জাগে দোলা আর তা উপচে পড়ে হৃৎপিণ্ডে। তোমার কাছে সবই খোলাখুলি বলছি; স্বীকার করছি সে আমার হৃদয়ে কতখানি জায়গা জুড়ে। তবু তো মানুষ আমি আর এই মানুষের হৃদয় যে বিচিত্র; বিমূর্ত ভাবনায় পরিপূর্ণ। নানান চিন্তায় সে সবসময়েই রহস্যময় কিন্তু কেন এমন ভাবে মানুষ ? কোথায় তার উৎস ? সত্যি বলতে কি আমি তা জানি না।

সারাদিন আমি ওকে দেখি; যদি চাই সারাটা সময় ওকে পাই। সেজন্যে ঘাটতি কখনো দেখিনি; সব সময়েই সে আমার খামখেয়ালিপনাকে চরিতার্থ করেছে। তবু কী অদ্ভুত আমি।

সত্যিই আমি হতভাগ্য! বাস্তবে যা প্রমাণিত তা অধিকৃত করার নৈতিক নিশ্চয়তাও আমার নেই। রূপময় জগৎ ছাড়া অরূপ প্রকাশিত হবে কিরূপে ? আর আমি কি অরূপের মধ্যেই খুঁজি রূপের সার্থকতা ? ভাব ভাবনাকেই কি আমি রূপে ধরতে চাই ? এ এক অতলান্ত রহস্য। হ্যাঁ, আমার ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অংগ। না; আমি তা পারি না; আমি বুঝতে চাই না যে রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া। তবু বুঝি, কোন কোন ক্ষেত্রে নগরনন্দিনীর ওপর অধিকার নির্ভর করে আমারই নিজের আচার-আচরণে; কিন্তু নিজেকে তো এমন বিশ্বস্ত করে তুলতে পারি না যাতে সে আমায় ভরসা করবে, বুঝবে আমি শুধু তার, তারই। আমার যদি কারো ওপর কোন আস্থা না থাকে, আমার ওপরই বা কে আস্থা রাখবে ? আর আস্থা তো

অর্জন করা যায় না। এ হল নির্মল দান—স্বর্গের পরম করুণা।

আমার স্বভাবটাই অন্যরকম। কাউকেই খাপ খাইয়ে নিতে পারিনা। মিলে মিশে চলবার ক্ষমতা বড়ই সীমিত। অন্যের ইচ্ছাকে দিইনা আমল, দিতে পারিনা মর্যাদা। আসলে সহমর্মিতাবোধই আমার কম। কোন ব্যক্তি বা বস্তুর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি আমার কাছে প্রায় একই, কেউই আমাকে তেমন টানতে পারে না। স্বপ্নে আমি যাকে দেখি বাস্তবে তাকে কখনো পাই না। রক্তমাংসের মানুষ বা মানুষী কখনোই পারে না আমার স্বপ্নের মদিরতা ঘোচাতে। চারিদিকে শুধু ইত্যাকার ছায়ারা ঘোরে ফেরে, দেখি ম্লান পৃথিবীর আরূঢ় ভনিতা এখানে ওখানে, দেখি সত্য বা মিথ্যা সব ভুতের নাচন, চারিদিকে ব্যর্থতার রাশি, সব কাজ তুচ্ছ হয়—পন্ড মনে হয়, আর সকলের মাঝেও নিজেকে মনে হয় ভীষণ একাকী। তাহলে কি নিজের মুদ্রাদোষে আমি একা হতে চলেছি আলাদা? আমার কাছে ভালমন্দ সকলি সমান, কারো প্রভাব খাটে না, শুধু দেখি নিজের স্বভাববশে আমি সবার থেকেই স্বতন্ত্র, সকলের চাইতে আমি এমন একাকী। কারো সঙ্গে কথা বলি যদি, আমি দেখি সকলেরই বোধহীন অভিন্ন উত্তর। আমিও এমন অবাক হয়ে যাই মনে হয় আমার পোষা কুকুর বা বিড়ালটাও পেয়ে গেল কথা বলার ক্ষমতা, তারাও যোগ দিল আলাপচারিতায়; তাদের স্বর আমার মধ্যে জাগায় গভীর বিশ্বাস, এবং তারা হয়ে ওঠে একে-একে নির্বাসিত ব্যক্তি, পলাতক প্রতীক, আর আমি নিছক দর্পণ। উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট বুঝিনা, তবে ওদের প্রজাতি সম্পর্কে আমার অনিশ্চিতি দৃঢ়। এক এক সময় ঈশ্বরকে স্থাপন করতাম আমার উপর আর যাদের আমি ঘুণপোকা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারি না, বা যাদের মনে করি বালুকবেলায় শামুক সদৃশ কোমল কম্বুজ, তাদের সঙ্গে নিজেকে কিছুতেই এক বলে কল্পনা করতেও অক্ষম আমি। মনের গতিক যাই হোক, আমি কাউকেই আমার মতো করে ভাবতে পারি না। কেউ যখন আমাকে 'স্যার' বা 'মাননীয় ভদ্রলোক' বলে সম্বোধন করেন তখন মনে জাগে অপার বিস্ময়। এমনকি আমার নামটাও যেন আসল নাম নয়, এ-এক কল্পনাবিলাসী উপাধি; তবু জোরে বা যত আস্তেই ডাকুক সেই নাম ধরে, আমি ফিরে তাকাই; জবাব দেই। কিন্তু কেন? তাহলে কি আমার ভেতরে ভেতরে এক ধরনের ভয় লালিত পালিত হচ্ছে? তাহলে কি আমার কোন শত্রু বা বিরোধী আমাকে ডাকছে বলে ভীত-বিচলিত? আমি কি জনতার কেউ নই? সকল লোকের মাঝে আমি কি আলাদা?

নির্দিষ্টভাবে বলতে পারি, যখন আমি কোন রমণীর সঙ্গে থাকি তখন এমন এক অজেয় বিকর্ষণ শক্তি আমার প্রকৃতির মধ্যে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে বিচ্ছিন্নতাবোধ তীব্র হয়, নিজের মধ্যে অনুভব করি মিশ্র নৈঃসঙ্গ। একগ্লাস জলে একফোঁটা তেলের মত হয়ে ওঠে আমার অবস্থা। যতই তুমি নাড়া-চাড়া কর, ঝাকুনি দাও, কিছুতেই তেলে-জলে মিশ খাবে না। উপরন্তু তেলের প্রথম ফোঁটাটি টুকরো টুকরো হয়ে হাজার বিন্দুতে ভাগ হয়ে যাবে, আবার তা একত্রে মিলে ভাসতে থাকবে উপরিতলে। সেই একগ্লাস জল আর একফোঁটা তেলের যোগফলই হল আমার ইতিকথা। যদিও

সংবেদনশীলতা আমার তীব্র; বোধ বড় তীক্ষ্ণ; তবু শরীরের সঙ্গে যেন রয়েছে আমার আত্মার বৈরিতা, এ-এক অসুখী দম্পতি; এ হল স্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত কোন রাষ্ট্রের বৈধ বা অবৈধ সম্ভাব্য যুগল। রমণীয় যে উষ্ণ আলিঙ্গনকে বলে পৃথিবীর সেরা বাঁধন আমার কাছে তা দুর্বলতম বন্ধন; আর আমার নাগরী যখন আমায় চেপে ধরত তার বুকে; আরো আরো জোরে চাপ দিতে থাকত, আমি আর এগোতাম না। আমার প্রায় শ্বাসরোধ হত; ব্যস এই পর্যন্তই। কত সময়েই না নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হত। একটু আলগা হবার জন্য কত রকমই না চেষ্টা করতাম। অসফলতার মধ্যেও নিজেকে নিঃশেষ করে দিতাম ভালবাসার লীলাখেলায়, উষ্ণ আলিঙ্গনে; কবোষ্ণ আবেগময়তায়। কতভাবেই না আমার মনপ্রাণ সঁপে দিতে চেয়েছি প্রেমের গভীরে। কিন্তু শাস্তিই জুটল আমার কপালে, নিজেকে প্রেমের পায়ে সঁপে দেবার চেষ্টায় কত ব্যর্থতাই না জুটল।



রসেটির বেলায় আমি মনে মনে স্থির করে ফেলেছিলাম নিজেকে অন্তত অসামাজিক প্রতিপন্ন করব না; অন্যের উপস্থিতিকে দেব যোগ্য মর্যাদা, অস্তিত্বের প্রতি জ্ঞাপন করব আপন বিশ্বাস। ওকে ঘিরে আমার আনন্দ পূর্ণ করে দিতে চেয়েছিল আত্মার পাত্রখানি। পরিশেষে বুঝেছিলাম এ ভালবাসা শুধু প্রবেশ করেছে চামড়ার গভীরে আর আমি শুধু আনন্দের উপরিতলে ভেসে বেড়িয়েছি, কৌতুহলবশতও আমার মন পায়নি সেখানে অমলতার স্পর্শ, আত্মা নিতে পারেনি যথাযথ অংশ। একথা ঠিক আমি কিছু পরিমাণ আনন্দ উপভোগ করেছি, কেননা আমি যুবক; আমি আবেগতপ্ত; কিন্তু আনন্দ আসে আমারই ভিতর থেকে, অন্যের কাছ থেকে নয়। রসেটির চেয়ে এটা নির্ভর করে আমারই ওপর।

আমার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল; কেননা যে প্রাণোদ্দীপনার ছিল প্রয়োজনীয় নিঃসারণ; তা ঘটেনি কখনো।

আগের মতই রয়ে গেলাম আমি। থেকে গেলাম সেই খিন্ন শীর্ণ ক্লান্তিকর; বৈচিত্র্যহীন

পুরুষ। নিজের মগজে চালান করে দিতে পারিনি অন্যের ভাবনা-কল্পনা, আত্মার অপরের আবেগ-বাসনা-মনোভাব, শরীরে অন্যের দুঃখ বা আনন্দ। নিজের কাছেই নিজে বন্দী আমি, সেই বন্দীত্ব থেকে মারমুখী হয়ে বেরিয়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। বন্দী চায় মুক্ত হতে, দেয়াল চায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে, ফটক চায় তার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যাক সবাই। কিন্তু জানি না আমি পাথরে পাথরে কোন ভাগ্যলিপি রয়েছে লেখা। নিজেকে যেমন চালান করে দিতে পারি না অন্যের ভিতর, অপরকেও গ্রহণ করতে পারি না আমার ভিতর, জানি না কেমন করে আসতে হয়, যেতে হয়, ভ্রমণ করতে হয়, আর আমি সারাক্ষণই জনতার মাঝে থেকেও ডুবে থাকি নিসঙ্গতায়। কুরে কুরে খায় একাকীত্ব চতুর্দিকে পড়ে থাকে নির্জন স্বাক্ষর। শয্যা আমার বিধবা নয়, যদিও হৃদয় নিরবধি।

হায়, কিছুই হল না।.নিজেকে পারলাম না, অণু-পরমাণুতে মিশিয়ে দিতে, পারলাম না আমার শিরায় শিরায় অন্যের রক্ত বইয়ে দিতে!

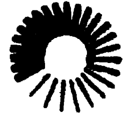
মাঝে মাঝেই ইচ্ছা জাগত টাঙ্গুট ভ্রাতৃদ্বয়ের হৃদয় পেতে, ফরচিউন্যাসের টুপি পেতে, অ্যাবারিসের জাদুদণ্ড আর গাইগেসের আংটি পেতে। পরীর হাত থেকে আংটি ছিনিয়ে নেবার জন্য আমি আমার আত্মাকেও বিক্রি করতে প্রস্তুত। কিন্তু গণৎকার টায়ারসিসের গণনানুযায়ী যে পর্বতে সরীসৃপের লিঙ্গান্তর ঘটে যায় অনায়াসে সেখানে যাবার মতো ইচ্ছা আর কখনও আসে না। মাঝে মাঝে ভাবি ভারতের যে সব দৈত্য বা দেবতা ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাতে পারে, আহা, যদি তাদের দেখা পেতাম।

এখন থেকে অন্য মানুষে বদলে যাবার ইচ্ছা আমার খুব হয়, বিশেষ করে ইচ্ছে হয় মেয়ে হতে। যখনই দেখি কোন সুন্দরী রক্ষিতা তখনই এ-ভাবনা আমাকে পেয়ে বসে, তোলপাড় করে। আর কুৎসিত মেয়েরা তো পুরুষের সমান। তাদের দেখে কোন আবেগ তো জাগেই না; বরং ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যাই, ঠাণ্ডা মেরে যাই। ভাবনা-চিন্তা সব এলোমেলো হয়, মুহূর্তগুলো তেতো লাগে।

এ-সবের বিন্দু বিসর্গও রসেটি জানত না। সে মনে করত আমাকে বিশ্বের সেরা প্রেমিক। পুরুষত্বহীনতাকেও সে মনে করত উগ্র আবেগ। ফলে আমার সবরকম খামখেয়ালিপনায় সে নিজেকে করত নিবেদিত। ওকে নিয়ে আমি যা ইচ্ছা তাই করতাম, অন্তত করতে পারতাম।

আমিও ওর কাছে নিজেকে লুকিয়ে রাখিনি, যা যা করা আমার সম্ভব তাই করেছি। সঁপে দিতে চেয়েছি হৃদয়, মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিতে চেয়েছি ওর কাছে। কিন্তু, পারিনি। যখনি ঢুকতে গিয়েছি ওর হৃদয়ের স্বপ্নিল ভুবনে, বাধা পেয়েছি। ওর চাবুক শরীর, অমল মুখমণ্ডল, ইস্পাতের ফলার মতো চোখ, আর কামনার আবেগে থরো থরো ঠোঁটদুটি আমায় ঢুকতে দেয়নি ওর বুকের ভেতর, স্বপ্নের ভেতর। ওর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটি যে কি, সে বিষয় আমি ছিলাম সম্পূর্ণ সচেতন। তা সত্ত্বেও বলব ওতে-আমাতে মিল ছিল খুব সামান্য। ওর অমন সুন্দর, কোমল মস্তিষ্কে আমার ভাবনাগুলো কখনোই ছায়া ফেলতে পারেনি; হৃদয়ও ছিলনা তার

আমার মত এমন বেপরোয়া জীবনীশক্তিতে ভরপুর। ওর সুডোল মসৃণ স্তনে লুকিয়ে থাকত এক অদ্ভুত পবিত্রতা, আশ্চর্য ইচ্ছাশক্তি। বারে বারে হার মানতাম ওর কাছে, ওর শ্বাস-প্রশ্বাস আমায় মাতাল করে দিত, তবু কোথায় যেন দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল। হ্যাঁ, ওর মনের সঙ্গে আমার মনের কোন মিল ছিল না। ওর আত্মার সঙ্গে হাত মেলাতে পারেনি আমার আত্মা। আমার পক্ষে আর বলা হল না, যেখানে তোমার হৃদয়খানি, সেখানে হৃদয়মম। তার আত্মা বলতে চাইলেও বলতে পারল না, ওগো সুন্দরতম, মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ, আসি অন্তরে মম। জানি, খুব ভাল করেই জানি, ডানা থাকা সত্ত্বেও কিউপিড দেবও সুন্দরী সাইকির অপরূপ ভ্রূতে কখনো চুমো খেতে পারেনি। নাহ্‌! এই মহিলা আমার নয়, আমার মিসট্রেস নয়।



আমার শরীর যাকে খোঁজে সেখানে মন সঁপে দেবার জন্যে যে কি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি তা যদি জানতে তুমি অবাক হতে। কী যে প্রচণ্ড আবেগে আমি ওর মুখের ভিতর জিভ ঢুকিয়ে লীলাখেলা করতাম, চুলের মধ্যে আঙ্গুল ডুবিয়ে নেশাচ্ছন্নের মত বিলি কাটতাম আর বাহুর ধনুকে বেঁধে ফেলতাম ওকে, টেনে নিতাম বুকে, ওর কোমল উষ্ণ সন্নত সতেজ বুকের সঙ্গে নিজের বুক মিলিয়ে দিতাম, তা তুমি ভাবতে পারবে না। পান করতাম আমি ওর নিঃশ্বাস, টের পেতাম বুকের উথাল-পাতাল, দেখতাম চোখের কোল দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কবোষ্ণ অশ্রু-গুল্মের মত টলটলে জলের ধারা। যত না অমন মায়াবী শরীর আমি দলতাম-পিষতাম, আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলতাম, তার চেয়ে ওকে ভালবাসতাম অনেক কম। আর এ অবস্থার মধ্যেও আমার হাজির হত বিষণ্ণ ধূসর বিধুরতা, বাতাসে ছড়িয়ে পড়ত ম্লান আলো, ভেতরে ভেতরে কেমন যেন অসহায় বোধ করতাম। আমাও বোধহয় কান্না পেত, কিন্তু তা ওকে কোনদিন বুঝতে দিই নি ওর কাছে বরাবরই নিজের মন লুকিয়ে রাখতাম। এতে মনে হবে সত্যি সত্যিই বুঝি আমি রসেটিকে ভালবাসি না, যদিও ওর প্রতি আমার অনুরাগ প্রবল, আমার ইচ্ছা ওর কাছেই হয় নতজানু।

আগেও বলেছি, আবার বলছি, আমি সত্যিই অদ্ভুত। কেবল নিজেকে নিয়েই মশগুল, স্বগত ভাবনাই আমার কাছে প্রধান। ফলে নিজের ভেতরেই নিজে গুটিয়ে থাকি, নিজের কাছেই নিজে রহস্যঘন। অথচ নিজেকে বারে বারে বুঝবার চেষ্টা করেছি, পারিনি। ফলে কোন ঘরই আমার ঘর নয়, কোন দেশেই আমার দেশ নয়। ছন্নছাড়া, ভবঘুরে, আত্মকেন্দ্রিক আমি রয়ে গেলাম চিরপ্রবাসী।

মিসট্রেসকে নিয়ে গিয়েছি কখনো স্নান করাতে, যথাসাধ্য অভিনয় করতে চেয়েছি ট্রাইটনের ভূমিকা, সমুদ্র আমার কাছে তখন মার্বেল বেসিন, আর প্রাণভরে যেন পান করেছি নীরিডসের আংশিক অনুপম সৌন্দর্য। রাতে জ্যোৎস্নার সাগরে ভেলা ভাসিয়েছি একত্রে গণ্ডোলায়, চারদিকে আমাদের তখন সুরের সিম্ফনি। ভেনিসে এ দৃশ্য সচরাচর ঘটলেও এখানে তা নিঃসন্দেহেই রোমাঞ্চকর।

অন্ধকারেও চলেছে আমাদের কত অভিসার। দিনের আলোয়ে দেখেছি ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, নিজেকে সমর্পণ করেছি এমনভাবে যাতে সকলেরই মনে হয় রসেটিই আমার প্রিয়তমা, আমার নাগরী, আমার মিসট্রেস।

অন্য যে কোন পুরুষের চেয়েই আমি ছিলাম রসেটির প্রিয়তম, প্রণয়াস্পদ। কারো ভেতরেই যেন রসেটি খুঁজে পায় নি আমার মত মাদকতা, দেখেনি আমার মত সৌন্দর্যের প্রতি এমন অনুরাগ। এবং ওর এই মনোভাবে কোন অযৌক্তিকতা ছিল না, সত্যিই আমি ওর সৌন্দর্যের পূজারী।

ওর বিরুদ্ধে আমার বলার মত বিষয় হল একটিই, তা হল আমার আত্মকেন্দ্রিকতা। আর এই আত্মকেন্দ্রিকতার কথা ওকে বললে সে সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিত, 'এটা তোমার বিশেষণ,' এবং এ-উত্তর ওর মনের শুভ্রতারই দ্যোতক, সৌজন্যেরই প্রমাণ। এই উত্তরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ওর অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়।

বন্ধু, জীবনে এক-একটা মুহূর্ত আসে যা কোনদিন ভোলা যায় না। এক-একটা মুহূর্ত চিরস্মরণীয় হয়ে বুকের ভেতর জ্বল জ্বল করে মুক্তোর মত। কিন্তু সেই মুহূর্ত যে বড় ক্ষণিক। তা যদি আরো বিস্তৃত হত, মিনিট যদি ঘণ্টা হত তাহলে আমিই বনে যেতাম দেবতা।

আমরা পাশাপাশি যাচ্ছিলাম একবার ঘোড়ায় চড়ে, দুই পাহাড়ের মাঝখানে বীথিচ্ছায়াবৃত এভিনু্য দিয়ে। ও চলেছিল ঘোটকীর পিঠে। সূর্যের আলোয় তখন ঝকমক করছিল পৃথিবী, আকাশ ছিল নীল, বাতাসে দুলছিল বুনো ফুল। কোথাও ছিল না মেঘের চিহ্ন। মাঝে মাঝে দু-একটা পাখি আমাদের সামনে দিয়ে হঠাৎ গান গেয়ে উড়ে যেত, দূর থেকে ভেসে আসত পাখিদের ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ, কখনো কখনো কিচির মিচির শব্দ। দূরে কোন্ গাঁ থেকে ভেসে আসছিল ঘণ্টার ধ্বনি, সুরেলা সেই ধ্বনির ভেতর দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম, আমাদের সংগে সংগেই যেন চলছিল সমান্তরালভাবে পাহাড়ের নিস্তব্ধতা। আবেগে ভরে উঠেছিল আমার হৃদয়, মনের রঙে রাঙা হয়ে উঠেছিল শরীর। এমন সুখী আর কোনদিন হইনি। কেউই কথা বলছিলাম না, না রসেটি, না আমি। সেদিনই প্রথম আমরা

পরস্পরকে চিনেছিলাম গভীরভাবে। আমরা এমনভাবে পাশাপাশি চলছিলাম যে রসেটির ঘোটকীর গায়ে অনায়াসেই ছোঁয়াতে পারতাম আমার পা। আমি একটু কাৎ হয়ে ওর কাঁধে রাখলাম একবার কনুই, সেও ঠিক ওভাবেই আমার কাঁধে রাখল একটা হাত। মুখের কাছে মুখ নিয়ে এলাম; চুমো খেলাম, আঃ! সে কি মোহন চুম্বন! আমাদের ঘোড়া দুটো ধীর লয়ে তাদের পিঠে যেন বহন করে চলেছে বর-কনে! একসময় মনে হল; রসেটি বেশ আরাম পাচ্ছে; আর তার শরীর ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়ছে আমার ওপর। আমিও ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছি, হয়তো সংজ্ঞাই হারিয়ে বসব। এ-ভাবে চলতে চলতে কার যেন পদধ্বনি শুনলাম, তখন আমরা রাস্তার শেষ প্রান্তে এসে হাজির। সামলে নিলাম এবার নিজেদের, ঠিক ঠাক হয়ে বসলাম। সামনেই দেখি অশ্বারোহী পুলিশ। স্মিত হাস্যে সেলাম ঠুকলাম। ইস, যদি আমার হাতে পিস্তল থাকত, তাহলে ওকে গুলি করে ফেলতাম।

আমার মনে হয়, তুমিও যদি এরকম অবস্থায় পড়তে তাহলে প্রচণ্ড রেগে যেতে আমারই মতন। যাই হোক; আমার রাগ হওয়াটা বোধহয় ঠিক হয়নি। তবু ভাবতে পার এরকম তালভংগের কি কোন হেতু ছিল? ভাবো, তুমি কোন মহিলাকে জড়িয়ে ধরছো তোমার বাহুতে, অনুভব করছ তোমার রক্তে আশ্চর্য দোলাচল, টের পাচ্ছো নারী শরীরের উষ্ণতা আর সেই সময় তোমায় যদি কেউ স্বপ্নের ভুবন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাহলে কেমন লাগে? হয়তো তুমি তোমার মহিলার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নেবে না, হয়তো জাগাতে চাইবে না তোমার কাঙ্ক্ষিতা নেশাচ্ছন্ন হয়ে-যে ঘুমে ঘুমিয়ে রয়েছে তার থেকে, হয়তো চাইবে সে ঘুমোক; সে ঘুমোক তোমার বুকে। তার বাহু যে তোমায় স্বপ্নের স্বর্গে নিয়ে যায়; তার ভার যে তোমায় মুক্তির আনন্দ দেয়। এভাবেই চলতে চায় মানুষ; প্রেমিক, যুবক চিরকাল। এভাবে চলতে চলতেই একসময় দিন ফুরোয়; সূর্য ঢলে পড়ে পশ্চিমে; আসে রাত, ঘুমোয় মানুষ, চিরন্তন ঘুমে থাকে সে শয়ান।

বহু আবেগের আনন্দই এভাবে শেষ হয়ে যায় অকস্মাৎ। এরকমই ছেদ টেনে দেয় ইতিহাস সীমাহীন ভালবাসার। সেদিন বাধা পেয়েছি ঠিকই তবু বলব ওদিনের মত আনন্দ আর কোনদিন পাইনি। সেদিন বোধহয় আমার সন্দেহপরায়ণ মন হয়েছিল পলাতক; রসেটি জয় করে নিয়েছিল আমার প্রাণ, মন; আত্মা। সে দিনের সেই চুম্বন বিনিময় মাটির পৃথিবীতে এনেছিল স্বর্গের সুষমা।

বিশ্বাস করো স্বর্গ তো কোন কল্পনা নয়। চুম্বনের মধ্যেই তার উপস্থিতি। মনে রেখো 'রমণী অধর সিধু যে রসনা করিয়াছে পান, অমৃত পায়স তার মনে হবে ক্ষারকটু প্রলেহ সমান।'

এরকম উজ্জ্বল মুহূর্ত পাবার জন্যে আরো কত চেষ্টা করেছি; কিন্তু পাইনি। ব্যর্থতার দেয়ালে শুধু মাথাই খুঁড়েছি; মেলে নি অমন আনন্দ সময়। রাস্তায় ওরকম কত ঘুরেছি, দু-পাশে ছিল সেরকমই গাছপালা, ছিল পাখিদের গান। সেরকমই আবার চুমো খেতে চেয়েছিলাম চেষ্টাও করেছি; কিন্তু হায়! আমাদের ঠোঁটগুলো

এক জায়গায় এসে জড়ো হয়েছিল ঠিক, তবে সে আনন্দ আর কখনো পাই নি, আর পাবোও না কোনদিন। সেদিনই প্রথম আর শেষ পেয়েছি গভীর সৌন্দর্যময়; শুচিস্নিগ্ধ, স্বর্গীয় চুম্বন। এই চুম্বনই তো আসল চুম্বন। তা আর কোনদিন আসবে না, আসতে পারে না। এরপর থেকেই আমার ভেতরে বাসা বাঁধল বিষণ্নতা, হয়ে উঠলাম পুনরায় আত্মমুখী। রসেটি, অতুলনীয়া রসেটিও সেদিনের ভাববিহ্বলতা থেকে মুক্তি পায়নি, মুক্তি পেতে পারে না। মুখে তার আগেকার হাসি থাকলেও সেও বুঝি বুকে বয়ে বেড়ায় সেদিনেরই স্মৃতি, রমণীয় লগ্নটি।

বিষাদ ঘিরে ধরল আমাকে। বুঝতে পারলাম এর থেকে মুক্তির পথ আছে শুধু মদে, আছে কোনো অলৌকিক আলোয়। আমরা ডুবে গেলাম মদে; তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলাম মৃত্যুচিন্তা, গেলাসের পর গেলাস সাবাড় করলাম নিঃশব্দে, যখন আকণ্ঠ নিমজ্জিত সুরায়, এবং সেও তার কাজ করতে শুরু করল মারাত্মক রকম, আমরা হাসলাম, হো হো করে হাসলাম, হয়ে পড়লাম প্রচণ্ড ভাবপ্রবণ।

আমরা হাসলাম, কেননা কাঁদতে জানি না। হায়, কে আমার বিধ্বস্ত চোখের থেকে বের করবে অশ্রু ?

সেদিন সন্ধ্যায় কেন আমি এত খোসমেজাজে ছিলাম ? না, বলতে পারব না সেই কারণ। তবু আমি সেই আমিই ছিলাম, রসেটিও ছিল সেই রসেটিই। সেটাই কিন্তু প্রথম পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে আমাদের চলা নয়। এর আগেও দেখেছি সূর্যাস্তের এমন মনমাতানো রঙ, তবু সেদিনটার তুলনা যেন নেই। দেবদারু ও বাদাম গাছের ছায়া শোভিত পৃথিবীতে আরো কত সুন্দর রাস্তা রয়েছে, অথচ সেদিনকার সেই রাস্তা আমার কাছে হয়ে রইল অনন্য নজির। সেদিন আসলে আমরা কবিতার ভুবনে করেছি সঞ্চরণ, বাতাসে বাতাসে ছিল কাব্যের সৌরভ। সেই কবিতাই আমাদের মধ্যে জাগাল রোমাঞ্চ, আমরা পুলকিত, অভিভূত।

কয়েকটা গাছ, মেঘ, কিছু প্রলম্বিত শাখা, একটি নারী, সূর্যের স্বর্ণাভ রশ্মি, পাহাড়, পাখির গান আর ডানা ঝাপটানো—সব কিছু মিলে মিশে এমন এক প্রাকৃতিক শোভা সেদিন তৈরী করেছিল সেরকম সহজ সরল অথচ সুন্দর দৃশ্য পৃথিবীতে যেন আর কোনদিন দেখা যায় নি, দেখা যায় না। আমি যে সেদিন বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছিলাম তা নয়, আজো সব আমার মনে পড়ে, চোখের সামনে সবই যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে। আর কোনদিন ভুলেও সে জায়গায় যাইনি, পাছে সেই অনুভূতি-আবেগ-শিহরণ হারিয়ে ফেলি। তার জন্যে সেদিনের স্মৃতি শুধু লালন করে চলেছি। আজো মনে পড়ে সেই চুম্বনের মাদকতা, অথচ আরো কতবার কত মেয়েকে চুমো খেয়েছি, চুমো পেয়েছি, তবু সেদিনের মত নেশা ধরানো চুম্বন আর কখনো খাইনি, পাইনি। একই রকম দুটো চুমো হয় না। আবার যদি কখনো সেরকম ভূদৃশ্য, নারী, বাড়ি; যদি সেদিনের মতো আমার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয়, তাহলে আমার জন্য রক্ষিত স্বর্গের আসন আবার ফাঁকা করে দিতে পারি। কিন্তু বাস্তবে তা আর হবে না। অথচ মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না, যদি কোন দিন সেরকম আনন্দ আসে তাহলে তার বিনিময়ে

মৃত্যুকেও বরণ করতে দ্বিধা করব না। বেশীদিন মিছামিছি বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়? বরং মৃত্যুই প্রিয়।

কিন্তু সেরকম নারী আর নেই। যদি থাকত আজকাল, কোনদিন না কোনদিন তাকে আমি পাবোই, স্পর্শ করব ওকে।

এই যে স্বকপোলকল্পিত নারী তার সঙ্গে রসেটির তফাৎ কোথায়? আমার বিশ্বাস এ সবদিক দিয়েই ওর থেকে পিছে। আমার ভাগ্যটাই এমন যে যার সঙ্গে প্রণয়াসক্ত হই, তাকে আমি ভালবাসি না, ভালবাসতে পারি না। হয়তো সে নারীর ঘাড় এত মখমল হবে যে সেখানে সুন্দরতম কণ্ঠস্বরই শোভা পাবে, আঙ্গুল এত রমণীয় যে সেখানে সবচেয়ে দামী অঙ্গুরীই হবে সুসমঞ্জস, আর তার পীনোন্নত বক্ষ অনায়াসেই হার মানাবে ভেনাসকেও। কিন্তু প্রেম! সেত আরেক জিনিস।

রসেটির গুণ রসেটিরই নিজের। তবু বলি, রসেটিকে আমি ভালবাসি না। অন্তত পক্ষে আমার যদি তার প্রতি কোন ভালবাসা থাকে তাহলে বলব আমি প্রেমের অনুপযুক্ত। যাই হোক, আমার ধারণা হয়তো সঠিক নয়। আর ভাবতেও পারি না কোন কিছু। আমার এলোমেলো ভাবনগুলোই রসেটির শত্রু, তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী!

যদি মহিলা এসব জানতে পারত তাহলে ভালই হত। আহা, বেচারী রসেটি! কত সময় যে তুমি আমার স্বপ্নকে উদ্দাম করেছ আর সেই স্বপ্নই হয়ে উঠেছে তোমার প্রতিস্পর্ধী। তুমিতো জানো না রসেটি, যখন তোমায় প্রচণ্ড জোরে আমার বুকে আগলে ধরতাম, চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতাম মুখ-বুক-সর্বাঙ্গ, তখনও কিন্তু তোমার সৌন্দর্য বা ভালবাসার কোন দাম ছিল না আমার কাছে। তুমি শুধু উস্কে দিয়েছ আমার কল্পনা, রাখতে আমায় নেশাতুর করে, আর সেই স্বপ্ন, সেই কল্পনা কখনোই হতে পারে না বাস্তবায়িত।

হে আমার স্বর্গীয়সুষমা, সুন্দরীতমা, তুমি শুধু জার্মান চিত্রকরের আঁকা সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো। হে আমার অনুপম নগরনন্দিনী, আমার রক্ষিতা, তোমার সুসজ্জিত বিছানায় এখন শুধু গোলাপ কাঁটা, সূর্যাস্তের বিষণ্ণ শোনিমা। তোমার কণ্ঠহারের মুক্তোয় এখন আন্দোলিত বিষাদলিন ছায়া।

অথচ আমি তোমার পূজারী, তোমার উপাসক শুধু। মিউরানীজের ঘন কালো চুলে হাত ডুবিয়ে এখন অনায়াসেই খেলতে পারি। আর তা সম্ভব হল রসেটি তোমারই করুণায়। রসেটি, হে আমার কুমারী ডায়ানা, আমি অ্যাক্‌টীয়নের চেয়েও তোমার প্রতি গভীর অনুরক্ত। হায়, এখন আমি বদলে গেছি, ভীষণভাবে বদলে গেছি। অথচ তোমার যে কত প্রতিদ্বন্দ্বিনী রয়েছে রসেটি, আজো তা জানতে পারলে না! কিন্তু কেউই তাদের খবর রাখে না, ছবি আঁকল না, পাথরে দিল না অবয়বত্ব!

হে মহিলা, যখন দেখবেন আপনার প্রেমিক তাঁর স্বাভাবিক নম্রতা ছাপিয়ে আরো বেশী নমনীয় হয়ে উঠেছেন এবং অসম্ভব আবেগভরে আপনাকে তাঁর বাহু দিয়ে আঁকড়ে ধরে—আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলেছেন, যখন দেখবেন তিনি তাঁর মাথা তুলে বিস্ময়-বিহ্বল আতুর চোখে আপনাকে ভালো দেখে নিচ্ছেন; যখন আনন্দ-উপভোগ কেবলমাত্র বাড়িয়ে

দেয় তার কোমলতা আর পাছে কিছু শুনে ভীত বিচলিত হবেন বলে চুমোয় চুমোয় ডুবিয়ে দিতে চান আপনার কণ্ঠস্বর—তখনই বুঝে ফেলবেন যে আপনার প্রেমিক আপনার উপস্থিতিকে আমলই দিচ্ছে না; বরং ধরে নেবেন যে তিনি শুধু মিথ্যে সময় কাটাচ্ছেন, প্রেমের অভিনয় করছেন; অলীক কল্পনায় আপনাকে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছেন। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিচারিকাই প্রেমে উদ্দীপিত হয় রাণীর দ্বারা। বহু মহিলাই দেবী-প্রাণিত হয়ে প্রেমে হন লাভবান; আর তুচ্ছ সাধারণ স্থানে; যেখানে আনাগোনা চলে অনায়াসে, সেখানে খুঁজে পান অনেকে আপন মানসী, স্বপ্নের ঈশ্বরী প্রেরণার প্রতিমা। এ কারণেই এসব জায়গা হয়ে ওঠে কবিদের প্রণয়-লীলাভূমি। এ সব স্থানে এমন অনেক তুচ্ছ ঘটনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যা শুনলে অবাক হতে হয় বিমূঢ় হতে হয়।

এখানকার রীতিই অদ্ভুত। সেই ফ্যাশনেই ডুবেছি আমি; সেই ফ্যাশনেই রসেটির প্রতি হয়ে উঠলাম অবিশ্বস্ত। ওকে প্রতারিত করেছি। ওর ছবি নিয়ে; মূর্তি নিয়ে আমি প্রতারণা করেছি, আর তাতে রসেটিও জুগিয়েছিল অর্ধেক ইন্ধন। না একবারও ফিরে তাকাই নি নিজের দিকে, বিবেকের দ্বারস্থ হইনি ক্ষণিকের জন্য। তবে একথা বলব সবটাই ঘটে গিয়েছিল সহজ ভাবে। কোনো সুযোগ নিই নি তার চেষ্টাও করি নি। সে এখন স্মৃতিমাত্র; রক্তাক্ত অনুভূতি শুধু। তাকে হারিয়েছি, ভীষণভাবে হারিয়ে ফেলেছি। আর সেই বন্ধু হারানোর আত্মকেন্দ্রিক আমি এখন বিষাদাতুর; হতাশ, বিভ্রান্ত।

অ্যারিয়াড্‌নী

তুমি কি জানোনা রসেটির সঙ্গে আমি যে পাঁচ মাস ছিলাম তার অনুরক্ত হয়ে তা আমার কাছে পাঁচ-পাঁচটা জন্মান্তরের সমান ? এমন নিত্যতা আর কোথায় ? সত্যিই এ-এক পরম রমণীয় অনুভূতি। এ সময় আমি নিজেকে যেভাবে ফিরে পেয়েছি, বিশ্বাস করতে শিখেছি তা আর কখনো ঘটেনি। রসেটিও নিশ্চয় ফিরে পেয়েছিল নিজেকে, নিজের ওপর বেড়েছিল গভীর আস্থা। বাস্তবিকই আমরা হয়ে উঠেছিলাম প্রেম-মুগ্ধ কপোত কপোতী।

আমরা রোজই প্রায় মিলিত হয়েছি, প্রতিটি সন্ধ্যেই কাটিয়েছি একত্রে। অন্য লোকদের জন্যে এই সময়ে ছিল রসেটির দরজা বন্ধ। আহ্‌, সে যে কী আনন্দমুখর সময় গিয়েছে তোমায় তা বলেও বোঝাতে পারব না। সত্যিই সে ছিল আমার জীবনের পরম গৌরব। প্রতিটি মুহূর্তই ছিল প্রাণচঞ্চল। কখনোই ক্লান্তি আসে নি আমাদের মধ্যে, আমার মতো আত্মমুখী মানুষও একঘেয়ে বোধ করি নি। রসেটিরও শ্রান্তি ছিল না, সে-ও ছিল নব নব রূপে চির কৌতুকময়ী, চির নতুন, প্রাণোচ্ছল। ভাবতেও পারি না আমি কিভাবে একজন মহিলা একনাগাড়ে এমনভাবে নিত্য নতুন হয়ে থাকতে পারে, ঈশ্বরই জানেন হয়তো এর রহস্য; জানেন কিভাবে আসন করে নিতে হয় শূন্য হৃদয়ে। মহিলার এসব প্রাণময়তার উৎস কিসে আমি জানি না, বলতেও পারব না। সে তার হৃদয় দিয়ে আমায় গ্রহণ করেছিল, ভালবেসেছিল হৃদয়ের অন্তস্তল থেকেই। সে জানত কেমন করে সামান্যকে অসামান্য করে তোলা যায়, ফুলকি হয়ে ওঠে মশাল। কি অনায়াস নৈপুণ্যেই না সে জয় করে নিতে পারত মানুষের মন, হৃদয়! সত্যিই সে অসম্ভবসম্ভবপটীয়সী! চমৎকার! বিশ্বের সেরা জীবন্ত প্রতিভাদেরই একজন আমার রসেটি, এবং প্রতিভাধরদের মধ্যেই তার আসন চিরকালের জন্যে।

প্রথম প্রথম যখন ওর কাছে যেতাম তখন মেজাজ আমি ঠিক রাখতে পারতাম না।

কখনো কখনো কথা কাটাকাটি হত, তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েও মতভেদ ঘটত। কিন্তু আশ্চর্য কৌশলে সে আবার সব কিছু মানিয়ে নিত; কয়েক মিনিটের মধ্যেই এমন সামলে নিত যে আমি বদলে যেতে বাধ্য হতাম, ওর গুণগান করতে বসতাম। আমার সেরকম ইচ্ছা না থাকলেও ওর প্রশংসা করতাম; হাতে চুমো দিতাম; তারপর হেসে উঠতাম প্রবলভাবে; ভয়ংকর অস্থিরতা বোধ করতাম ভেতরে ভেতরে। তোমার কি সেরকম ঘূর্ণি ঝড়ের কোনো ধারণা আছে? সে শুধু রূপসী, কৌতুকময়ী বা প্রেমমুগ্ধাই ছিল না; ছিল অসম্ভব বুদ্ধিমতীও। দিন পনেরো আগের একটা ঘটনাই বলি। ঘরের ভেতর তখন সে আর আমি। ঘনিষ্ঠ হয়ে নানান কথা বলছি। মাঝে মাঝে থামছি দুজনেই। কিছুটা সময় যখন নীরব; তখন ওর টেবিলের ওপর রাখা একটা বই নিয়ে আমি পাতা ওল্টাতে লাগলাম। সবই লক্ষ্য করল রসেটি; কিন্তু কিছু বলল না। পরের দিন ওর ঘরে গিয়ে দেখি সেখানে বইগুলি নেই, ভেতরে কোথাও সরিয়ে ফেলেছে। দুঃখ হলেও অবাক হয়ে গেলাম তার বুদ্ধির চাতুর্যে। আর একবার; রসেটি আর আমি রয়েছি তারই ঘরে, দরজা বন্ধ করিনি; কিন্তু পর্দা টাঙানো ছিল। জানালাও ছিল বন্ধ। খুবই কাছাকাছি বসে ছিলাম। দুজনেই টের পাচ্ছিলাম উভয়ের উষ্ণ প্রশ্বাস। শুনতে পাচ্ছিলাম বুকের ধ্বনি। রসেটির চোখে ছিল কিসের আলো। এমন সময় কোনো জানান না দিয়েই ঘরে ঢুকে পড়লেন এক ভদ্রলোক। আমি একটু সচেতন হলাম; একটুখানি সরে বসলাম। কিন্তু অবাক হলাম রসেটির মধ্যে কোন ভাবান্তর না দেখে। বরং সে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা চালিয়ে যেতে লাগল আমার সঙ্গে। তাঁর দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। ভদ্রলোককে একটু বিমূঢ় মনে হল; কিন্তু বুঝলাম তিনি বেশ বুদ্ধিমান। রসেটির দিক থেকে উপেক্ষিত হয়ে তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে গেলেন। এবার রসেটি মুখ খুলল। সে বলল যে উনি দু মাস আগেও এসেছিলেন রসেটির কাছে। ওঁকে সে পৃথিবীর সেরা নির্বোধ বলে মনে করে। রসেটি এ-ও জানাল যে নির্বোধ না হলে কেউ এভাবে ঘরে ঢোকে? আবার যখন দেখছেন একজনের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলছি; তখন কেউ আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে? সত্যিই তার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়; আমার প্রতি তার ভালবাসার মর্যাদা দিতে হয়।

এই হল আমাদের ভালবাসার ভুবন। দুজনের একজন ভালবাসে অপরকে গভীর-ভাবে; আর একজন তাকে দেখে আদর করার মানুষী হিসেবে। আমার অবস্থা খুবই সঙ্গীন। যদিও রসেটির প্রতি আমার প্রেম নেই তবু আকর্ষণ রয়েছে; আমি এমন কিছু করতে চাই না যাতে ও আঘাত পায়। বরং তাকে; যতদূর সম্ভব বোঝাতে চেয়েছি, ভালবাসি; আমি ভালবাসি।

অনুকম্পাবশতই হোক আর শ্রদ্ধাবশতই হোক আমাকে সুখী করার জন্য রসেটি সব চেষ্টাই করেছে। আমার আনন্দই তার আনন্দ; আমার দুঃখই ওর দুঃখ। কিন্তু কষ্টকর হলেও তাকে আমি প্রতারণা করতে চাই; নিঃশব্দে তার কাছ থেকে নিজেকে রিরয়ে নিতে চাই; যদিও কোনদিনই তাকে আমার মুখ দিয়ে বলা সম্ভব নয়; তোমায়

ভালবাসি না; ভালবাসিনি। ওর মুখে আমি প্রেমের যে রঙীন আলো দেখি তা নিভিয়ে দিতে চাইনি, সে যে ভালবাসায় আমাকে বন্দী করতে চায় তাকে নির্বাসন দিতে চাইনি; তবু দিতে হবে। উফ্ সে যে কি যন্ত্রণাদায়ক! যাক্, আজ সকালেই আমাদের মধ্যে এমন কিছু কথাবার্তা হয়েছে যা আমায় বেশ ভয় পাইয়ে দিয়েছে; আমিও স্থির করে ফেলেছি আমাদের সম্পর্কটিকে আর এগোতে দেওয়া উচিত হবে না। তোমাকে সেই সংলাপ এখন তুলে ধরছি।

'অমন করে হাই তুলো না', রসোট আমাকে বলল; 'তাহলে আমিও এক সপ্তাহ তোমায় চুমো খাব না।'

'বেশ!'

'আমার চুমোকে তুমি তেমন মূল্য দাও না দেখছি।'

'উল্টোটাও তো হতে পারে।'

'তুমি এমন ভাবে কথা বলো যেন সবসময়েই নির্লিপ্ত। খুব ভাল কথা মশাই; জেনে রাখো ঠিক এক সপ্তাহ আমার ঠোঁট তোমাকে স্পর্শ করবে না। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত তোমাকে আমি ভুলেও চুম্বন করব না।'

'বাঃ!'

'বাঃ কেন?'

'হ্যাঁ, বাঃ। হয় তুমি এই সন্ধ্যেই আমায় চুমো দেবে, নইলে মরে যাব।'

'তুমি মরবে। কি দেমাকী ফুলবাবু রে! মশাই; তোমায় আমি নষ্ট করে দিচ্ছি!'

'আমি বেঁচে থাকব। আমি দেমাকী নই, ফুলবাবু নই; তুমিও আমায় নষ্ট করোনি। বরং উল্টোটা। প্রথমতঃ আমি চাই তুমি আমায় মশাই; মশাই; স্যার, স্যার করবে না। তোমাকে এত বেশী চিনি যে তুমি আমার নাম ধরেই ডাকতে পার।'

'আলব্যয়র, তোমায় আমি নষ্ট করে দিয়েছি।'

'ভাল। এখন তোমার মুখখানা কাছে আনো তো।'

'না, সামনের মঙ্গলবার পর্যন্ত নয়।'

'এসো! আমি কি তবে এখন হাত কামড়াব, কাগজ ছিঁড়ব? মুখখানা কাছে আনো দেখি খুকি; নইলে ঘাড় ধরে আনব।'

'নাহ্।'

'আঃ! তুমি আমার ছোট্ট চুমুটাও চুরি করতে চাও যদি করো। এটা করতে পারো; তবে; বোধহয় এখনো সে সময় আসেনি।'

'বাচাল কোথাকার!'

'হে সুন্দরী, মনে রেখো; 'বোধহয়' শব্দটা সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছি, অন্তত আমার দিক থেকে এর প্রয়োগ খুবই সতর্ক। কিন্তু আমরা বোধহয় আমাদের বিষয় থেকে সরে গেছি। মাথাটা একটু নোয়াও। এসো; কাছে এসো। রাণী; ওগো সুলতানা, বলো এমন কি ঘটেছে। কি অদ্ভুত লাগছে তোমায়! তোমার ওই ঠোঁট ফোলানো চেহারা দেখতে চাই না; চাই তোমার মিষ্টি হাসিকে একটু চুমো দিতে।'

'আমি হাসব এ তুমি কেমন করে ভাবলে ?' সামনের দিকে এগিয়ে, চুমো দেবার সুযোগ করে দিয়ে রসেটি উত্তর দিল। 'তুমি এত নিষ্ঠুর হতে পারো !'
'আমি তো তোমায় সবচেয়ে মিষ্টি কথা দিয়েই ভালবাসতে চাই। তাহলে, কেন তুমি মনে করছ, আমি তোমার প্রতি নির্মম ?'
'জানি না কেন, তবে তুমি তাই।'
'তুমি আমার অর্থহীন ঠাট্টাকে ভুল বুঝে নিষ্ঠুর বলছ মিছামিছি।'
'অর্থহীন বলছ ? যেভাবে বললে তা কি ভালবাসার কথা ? এভাবে হাসার চেয়ে বরং আমাকে মারতে পারতে।'
'তুমি কি আমার কান্না দেখতে চাও ?'
'সব সময়েই তুমি যা কর একেবারে শেষ না দেখে ছাড়ো না। আমি তোমায় কাঁদতে বলি না, তবে যুক্তিসঙ্গত—মানানসই কথা কইতে বলি। আর ওভাবে বিদ্রূপ করে কথা বলা তোমায় মানায় না।'
'আমার পক্ষে সব সময় ভেবে চিন্তে কথা বলা সম্ভব নয়, বিদ্রূপ একটু থাকতেই পারে। তার চেয়ে তুমি যখন আমার মার-দেওয়াটাই বেশী পছন্দ করছ আমি তোমায় মারব।'
'চালিয়ে যাও।'
'তার চেয়ে বরং'; ওর কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম 'আমার ঘাড় থেকে মুণ্ডু কেটে ফেলি। কি দরকার তোমার অমন সুন্দর ছোট্ট শরীরটাকে নষ্ট করার। ওগো দেবী, তোমাকে মারার মধ্যে যে আনন্দ তা কখনো সম্ভব নয়।'
'তুমি আর আমাকে ভালবাস না।'
'যা যা ঘটেছে তাতে কিন্তু এটা প্রমাণ হয় না। এ হল অনেকটা সেরকম যুক্তি-বৃষ্টি হচ্ছে, ফলে আমাকে আমার ছাতা দিয়ো না,' বা 'বাইরে ভীষণ ঠান্ডা, জানলা খুলে দাও।'
'না; না; না; তুমি আমাকে ভালবাস না; কখনোই ভালবাস নি।'
'আঃ; সবকিছুই তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। 'তুমি আমায় ভালবাস না; কখনোই ভালবাসনি' জটিল করে তুলেছ। না, না; না; তোমার এ ধারণা ঠিক নয়। যা আমি করি নি তা স্বীকার করব কি করে ? তুমি, ওগো ক্ষুদে রাণী আমার; তুমি জান না কী বলছ তুমি; যা বলছ সবই অবাস্তব, অর্থহীন।'
'তোমার ভালবাসা পেতে আমার এত ইচ্ছা যে আমি নিজেই নিজেকে ঠকিয়েছি। যে যা চায়, সেটাকেই সে বিশ্বাস করে, আর আমিই শুধু ভুল করেছি। তুমিও তোমাকে ঠকিয়েছো; অথচ তোমারও ভালবাসার স্বাদ নেবার ক্ষমতা ছিল, আবেগ ছিল প্রচণ্ড। রোজই এক জিনিস ঘটত। আমারই কিছু ছিল না। না, আমি যে ভালবাসা পাই নি তা তোমার দোষে নয়; এ হল আমারই ভাগ্য; ছিল না আমার তোমাকে মুগ্ধ করার ক্ষমতা। আমাকে আরো সুন্দরী হতে হত, আরো প্রাণবন্ত, আরো ছিনাল ; চেষ্টা করেছিলাম তোমার সমান হতে, ওগো কবি, আমার প্রতি তোমার ভালবাসা পাবার জন্য

তোমার স্তরে পৌঁছতে চেষ্টা করেছিলাম। সব সময়ই ভয় হত পাছে তোমায় হারিয়ে ফেলি, পাছে তুমি মেঘ হয়ে যাও, আর ভয় পেতাম পাছে তোমার চিন্তা-ভাবনা আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেয় তোমার হৃদয়। ভালবাসায় বন্দী করতে চেয়েছি তোমাকে, আর আমার বিশ্বাস, তোমার কাছে করেছি আত্মসমর্পণ।'

'রসেটি, একটু সরে যাও, তোমার শরীর আমায় পুড়িয়ে দিচ্ছে, তুমি যে জ্বলন্ত অঙ্গার!'

'যদি তোমায় দগ্ধ করি, সরে যাবো, চলে যাবো। ওরে, পাথর হৃদয়, জলের ফোঁটাও পাথরকে ভিজিয়ে দেয় অথচ আমার চোখের জল তোমায় একটুও বিচলিত করতে পারে না।' (সে কাঁদল)

'এভাবে যদি কাঁদো তাহলে যে এটা স্নানঘর হয়ে যাবে, সাগর হয়ে উঠবে। রসেটি, তুমি সাঁতার জানো?'

'শয়তান!'

'এসো, কাছে এসো। আমি শয়তান হবো কেন? রসেটি, তুমি আমায় তোষামোদ করছ, বেশী সম্মান দিয়ে ফেলছ। আমি এক বাউণ্ডুলে নাগরিক, হায়, আমি তো সামান্যতমও অপরাধ করি নি। বোধহয় তোমাকে ভালবেসে আমি ভুল করেছি। সত্যিই কি তুমি তোমার মনপ্রাণ দিয়ে আমায় ভালবাস? আমি তোমায় ভালবাসি, প্রচণ্ড ভালবাসি। তোমার প্রেমিক হিসাবে আমি তোমার ছায়ায় ছায়ায় পর্যন্ত ঘুরি। আমার দিনগুলো, রাতগুলো সবইতো তোমায় সমর্পিত, রসেটি। তোমার কাছে কখনোই আমি বড়ো বড়ো কথা বলি নি, কেন না সেগুলো সাহিত্যেই চলে। কিন্তু আমি তো আমার ভালবাসার হাজার প্রমাণ তোমাকে দিয়েছি। সেগুলো আর উল্লেখ করতে চাই না, তবু বলো, তুমি আরো কি চাও? আজ যেমন তোমার সঙ্গে আমি, তেমনি ছিলাম কাল, থাকবও আগামী দিন। যে মানুষ কোন স্ত্রীলোককে ভালবাসে না তার সঙ্গে কি এরকম ব্যবহার করতে পারে? তুমি যখনই যা বলেছ; আমি তাই করেছি। যেই বললে 'চলো,' অমনি চললাম, 'বসো' অমনি বসলাম। এতে তো এটাই প্রমাণিত হয় আমি পৃথিবীর বিমুগ্ধতম এক প্রেমিক।'

'এ প্রশংসা আমারই দেওয়া। সত্যিই, তুমি পৃথিবীর যথার্থই প্রেমিক।'

'তাহলে এভাবে ভৎর্সনার মানে কি?'

'কিছুই না। তোমাকে শুধু আমার অভিযোগ জানালাম।'

'এ-এক অদ্ভুত ঝগড়া।'

'এটা আরো খারাপ। তুমি আমায় ভালবাস না। কিছু করতে পারি না আমি, তুমিও না। এই পরিস্থিতিতে তুমিই বা কি করবে? আমি অনেক বেশী নিশ্চিন্ত যে আমি আমার ত্রুটিগুলোকে শুধরে নিতে পারি, বা সেগুলো মার্জনা করে দেবো। তোমায় আমি ধিক্কার জানাই; নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করো, নিজের কাছেই ক্ষমা চাও, আর আমরা যে যার কাজ করে যাই।'

'তাতে হয়তো তোমারই সুবিধে। অপরাধ যতো মারাত্মক হোক, ক্ষতিপূরণও ততো

বড়োসড়ো হলে আখেরে যে নিজেরই পোয়াবারো।'

'তুমি কি ভাল করেই জানো মশাই যে আমি অত নিচে নামতে পারি না? যদিও তুমি আমায় ভালবাস না, যদিও আমরা ঝগড়া করি, তবু যদি তা চাই······'

'বিশ্বাস করি এ তোমার তরফে সহানুভূতিরই নজির মাত্র। আমাকে তুমি কিছু বলতে দিতে চাও না, আর এ-ভাবে আমরা যা করছি তার চেয়ে সম্ভবত ওটাই ভাল।

'যেহেতু এধরনের কথাবার্তা তোমায় বেশ বিচলিত করে তাই চাইছ আলোচনা ছেঁটে ফেলি। কিন্তু ওগো বন্ধু, ওগো সুন্দরতম, যদি তুমি খুশি হও আমরা কথা বলে যাই।'

'মন্দ বলোনি। তবে তোমাকে ভরসা দিতে পারি যে তুমি পুরোপুরি ভুল বুঝছ। ওগো আমার ভুবনমোহিনী, তুমিই হরণ করেছ আমার হৃদয়, আমি তোমার গুণমুগ্ধ প্রেমিক।'

'ভবিষ্যতেও এমন করে বলো।'

'বেশ, হে আমার উজ্জ্বল উম্ধার, তুমি কি সত্যিই কোন ক্ষুদে হাইরকেনিয়ান বাঘিনী? না, নেই তোমার নিষ্ঠুরতার তুলনা। তুমি কি নিজের কাছেই নিজে উদ্ভট নও? সব উৎকল্পনাই কি মৌলিক?'

'কেন নয়? বিচিত্র সব ঘটনা ঘটছে, অথচ তোমার ব্যাপারে আমার যে খুব ভরসা ছিল। মনে রেখো, যে আমায় ভালবাসে, বিশ্বাস করে, আমি শুধু তাকেই এমন ভালবাসি, এমন বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি এর কোনটাই নও। তোমার কাছ থেকে আমাকে এবার যেতে দাও।'

'না। দেবো না।'

'তোমাকেও দেবো না আমি।'

'আহ্, ভালই হল। আমি থাকব।' রসৌট কখনোই বুঝতে পারে নি যে আমাদের মধ্যে সে-ই হল সবচেয়ে দুর্বল। 'তুমি আমার হাত ব্যথা করে দিয়েছো।'

'আমার বিশ্বাস তুমি আমাকে ছাড়া আর সবকিছুই ভালভাবে চেনো।'

বন্ধু, এভাবেই চলেছিল আমাদের সংলাপ। সেসব আর বাড়িয়ে বলে লাভ নেই। কত কথাই ত বাকি থাকে। থাক না কিছু ভবিষ্যতের জন্যে তোলা।

একসময় সেরে নিলাম একত্রে দুজনের লাঞ্চ। বেরিয়ে পড়লাম শহরতলীর দিকে, এলোমেলো ঘুরে বেড়াবার অছিলায়। ঝকঝকে দিন। ছিমছাম চেহারা। আলোয় ভরে আছে গাছপালা। বাতাস বইছে, ভেসে আসছে ফুলের গন্ধ, পাখীর শিস, মিষ্টি রোদের ভেতর আমরা হাঁটতে লাগলাম। মাথার ওপর স্বচ্ছ আয়নার মতো আকাশ। বেশ লাগছিল এই প্রাকৃতিক শোভা।

আমরা হাঁটছিলাম। মনের মেঘ ধীরে ধীরে উড়ে গেল কখন। রসেটিও অনেক সহজ হয়ে উঠছে। ওর-ও ভাল লাগছে এই প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী। বেশ সহজ-স্বাভাবিক হয়ে উঠল সে। ভেতরে ভেতরে সে আনন্দ পাচ্ছে বুঝতে পারলাম। কোমলতায় ভরে উঠছে ওর মন। আমিও এই সুযোগ নিলাম। ওর দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিলাম।

কণ্ঠে আবেগ ভরে ওকে জানালাম যে আমার হৃদয় অতো নির্মম নয়; আরো দশজনের হৃদয় থেকে সে কোনো আলাদা কিছু নয়।

বন্ধু, তুমি কি কোনদিন অরণ্যের মাঝখানে আলোছায়ার খেলা; ঝর্ণার সুর, পাখীর গান, ফুলের পাপড়ি মেলে ধরা দেখেছো ? কোনো শক্তি দিয়ে কি প্রকৃতির স্বাভাবিকতা রোধ করতে পারো ? তোমার কাছে আমি কিছু লুকোব না, বিশ্বাস করো, ইদানীং আমি টের পাচ্ছি আমার মধ্যে কেমন যেন গেঁয়ো ভাব দেখা দিচ্ছে। নাইটিঙ্গেলের সুর শুনলেই আনমনা হই। দেখতে দেখতে নীরবে, চুপি চুপি নেমে আসে রাত। এ রাতের চেহারা যেন আরো করুণ, আরো বিষণ্ণ। যদিও আকাশে ফোটে তারা, কালচে-নীল শাড়ীর আঁচলে জ্বল জ্বল রুপোলি বুটি, দিনের আলোর মতই সব কিছু স্পষ্ট। এখন আমি একা একা বাগানে ঘুরছি। গাছ-পালার গা থেকে সোঁদা গন্ধ ঠিকরে বেরুচ্ছে, মাটির বুক ফুঁড়ে উঠে আসছে আশ্চর্য সুরভি। টুপ টাপ করে শিশিরের শব্দ, হিমেল বাতাস; জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়েছে পৃথিবী; আর তাতেই ভাসিয়ে দিলাম আমার ভেলা। এ-এক মোহিনী মায়া।

মনে হয় এ জায়গা আমাদের নয়, দেবদূতের লীলাপ্রাঙ্গণ। হঠাৎ যেন সব ওলোট পালোট হয়ে গেল, ঝর্ণার জল স্তব্ধ হল, বাতাস বন্ধ হল। চাঁদের আলো তেমনি ঝরে পড়ছে, কিন্তু বুকের ভেতর কে যেন দামামা পিটছে, আর সেই শব্দে ডুবে যাচ্ছে অমল উদ্যান। এক সময় সেই ধ্বনি বন্ধ হল; নেমে এল গাঢ় নীরবতা; হয়তো এই মুহূর্তের জন্যেই দীর্ঘ অপেক্ষা করে থাকলে নাইটিঙ্গেল গান গাইবার তাগিদে, আর তার সেই গান আমি শুনতে পাচ্ছি, কানের ভিতর দিয়ে তা পেঁছে যাচ্ছে আমার মর্মে মর্মে। এ গান যেন নেমে আসছে স্বর্গ থেকে, অলৌকিক আলোয় ভরে যাচ্ছে পৃথিবী, ডুবে যাচ্ছি আমি। এখন বুঝতে পারি কেন কবি-শিল্পীরা পাখীর গানে খুঁজে পায় অমৃত।

নাইটিঙ্গেল তো নিপুণভাবেই প্রেমের গল্প বলে, আর সেই সূক্ষ্ম-মধুর-রমণীয় গল্প আমি কোনদিনই শুনতে পাই না। এরকম অনবদ্য সত্য ও জীবন্ত গল্প; আর কখনো হয় না। তার সুর থেকে বাদ পড়ে না সূক্ষ্মতম অনুভূতি, প্রেমের প্রকাশ। নিজেকে যা বলতে পারি না; যা বুঝতে পারি না, সে তা বলে, ব্যাখ্যা করে; তার সুর নিয়ে চলে যায় স্বপ্নের ভুবনে। আমি জানতাম, আমি ভালবাসা পেয়েছি; জানতাম সেই ভালবাসা আমায় দেবে শিগ্‌গির সুখের ছোঁয়া। ক্রমশই সে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে; দেখতে পাচ্ছি ওর রূপ। শতেক পাতায় মোড়া গোলাপের সুভাসিত হৃদয় নিয়ে সে এল। না; তার সেই অপরূপ সৌন্দর্য আমি বর্ণনা করতে পারব না। এমন কোন ভাষা আমার জানা নেই যা দিয়ে ফোটাতে পারি সেই রূপ। যা বলা যায় না, যা অব্যক্ত; কেমন করে তা প্রকাশ করব ? যা শুধু অনুভূতির; ব্যঞ্জনায় তা তুলে ধরব কেমন করে ? বিশ্বাস করো, এভাবে আমার হৃদয় আর কোনদিন প্রেম-মোহিত হয়নি।

প্রকৃতিকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হল; দুই বাহু দিয়ে ঘিরে ধরলাম শূন্যতা, চেপে

ধরলাম এমভাবে যেন আমার বুকের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে কোনো কুমারীর বুক। হাওয়ায় খেলাম চুমো, যেন ছুঁয়ে গেল সে আমার ঠোঁট। হায়! এ সময় যদি রসেটি আমার কাছে থাকত তাহলে কী সুখই না হত! কিন্তু, কোন সময়েই মেয়েরা আসল মুহূর্তে কাছে থাকে না। এক সময় নাইটিঙ্গেলের গান বন্ধ হল, চাঁদের চোখে জড়িয়ে এল ঘুম, সে যেন ঢলে পড়বে অঘোর ঘুমে, শুরু হয়ে গেছে মেঘের আনাগোনা, বুঝলাম, আমার এখন ফিরে যাবার পালা। বাগান থেকে বেরিয়ে এলাম।



তবু; একদিন যে প্রিয় শিশু গ্রামীণ পরিবেশকে অচ্ছুৎ মনে করত, ঘা মারতে উদ্যত হত, সে-ই আমায় গতকাল নিয়ে গেল শহরতলীতে।

সেই শহরতলীর ছবি তোমায় যথাযথ বলা দরকার। নিঃসন্দেহেই বলতে পারি সেই চিত্র সুন্দর, তোমারও ভাল লাগবে। তার জন্যে অবশ্য একটা ভূমিকার প্রয়োজন, প্রেক্ষিত ছাড়া তো কোন কিছুই নিপুণভাবে ফোটানো যায় না। ব্যক্তির পেছনে চাই পরিবেশের পটভূমি, ছবির পেছনে চাই রঙের বাহার। নইলে, ব্যক্তিই বলো, আর ছবিই বলো, ঠিকমতো ফুটে ওঠে না।

আরম্ভটা ছবিরই মতো। চলে গিয়েছে লম্বা উঁচু রাস্তা, দু-পাশে সারি সারি গাছ, আমরা যে জায়গায় হাজির হলাম সেখানে এসে মিলেছে নানা দিক থেকে আরো অনেক পথ, এটাকে বলা যায় পাঁচ রাস্তার মোড়। তারপর কিছু এগোলেই একটা নিচু ক্ষেত। বড় রাস্তা এগোতে এগোতে সরু হয়ে মিশেছে উপত্যকায়; তার মাথার ওপর দিয়ে আড়া আড়ি বয়ে চলেছে একটা নদী, নদীর ওপর ধনুর মত সাঁকো, ওপারে তারপর শুরু হয়েছে ঢাল, ঢালের সঙ্গে গ্রাম, দেখা যায় গীর্জার চুড়ো, আপেল গাছের মাথা। দিগন্ত কিন্তু বিস্তৃত নয়, কেন না কিছুটা দূরেই আবার পাহাড়ের শুরু; পাহাড়ের চুড়ায় চুড়ায় মেঘের আনাগোনা। সব মিলিয়ে, ছবির মতো জায়গাটা মনোরম। সাঁকোর একদিকে মিল, কেল্লার মতো লাল পাথরের বিশাল বাড়ি আর সেখান থেকে ভেসে আসছে শিকারী কুকুরের অনর্গল চিৎকার। ভেতরে বিরাট মাঠ; পার্ক। এই বাড়ির যেখানে শেষ সেখান দিয়ে শুরু হয়েছে আর একটা রাস্তা, গাছে গাছে ঝুলে আছে লালচে ফুল; ফলের লোভে পাখীর ঝাঁক। জনবিরল এই রাস্তার মাঝখানে সাদা

রঙের বৃত্ত। কিছুটা এগোতেই আমরা দেখতে পেলাম এক লোহার রঙ করা দরজা; দরজার চারদিকটাই কারুকার্যে অলংকৃত। এখান থেকে আরো কিছুটা এগোলে পাওয়া যাবে একটি চীনা সেতু। যাইহোক এখান থেকে পাহাড় বেশ স্পষ্ট, দেখা যায় ঝিকমিকে ঝর্ণাধারা। জায়গাটার পাহাড়ী বৈশিষ্ট্য আর মিলের জন্য তৈরী বাঁধ নদীর খাত দিয়েছে কমিয়ে, কোথাও কোথাও চার-পাঁচ ফুট মাত্র গভীর। নদীর জলে ঝকমক করছে নুড়ি, পাথর আর তা নিয়ে খেলা করতে যে কী আনন্দ! হাত নিয়ে নুড়ি-গুলো ছুঁলেই শিরশিরিয়ে ওঠে গা, বেশ রোমাঞ্চ লাগে। পার্কের একজাগায় বিশ্রাম ঘর, আর মাঝ বরাবর একটা রাস্তা বের করে পার্কের বুকখানা যেন চিরে দেওয়া হয়েছে, দু ফালা করা হয়েছে। দু-দুটো উঁচু দেয়াল রয়েছে; প্রাচীরগুলোর গায়ে গুলির দাগ। কোথাও কোথাও বহুদিনকার অযত্নে ঝাঁকড়া হয়ে রয়েছে গাছ, ডাল-পালায় গা ছম ছম করে। কোন কোন গাছের পাতা একেবারে মাথার দিকে, ছাতার মতো। কোন কোন গাছের গুঁড়ি ভারি অদ্ভুত, বিচিত্র ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে। কোন গাছ ন্যাড়া, আবার কোন গাছ ফলে-ফুলে ভরা। কোনটা যেমন লোলচর্ম, পক্ককেশ বৃদ্ধা; তেমনি কোন কোনটা যৌবন টলমল যুবতী। পৃথিবীর কোনকিছুই এমন ছবির মতো নয়। আমার মনে হয় নানা সময়ে নানা জিনিস এনে এমন করে গড়ে তোলা হয়েছে এই প্রাসাদ।

নিয়মিত যত্নের ছোঁয়া না লাগলেও অট্টালিকাটি সত্যি সত্যিই মনোরম। এর ভেতরে কত দর্শনীয়, কত আকর্ষণীয় জিনিস যে রয়েছে তা একদিনে দেখে শেষ করা যায় না। যেদিকেই তাকাই থমকে দাঁড়াতে হয়, চমকে যেতে হয় বারে বারে তার বিচিত্রতর বস্তু দেখে। আর এখানেই যাই দেখি তাই অভিনব বলে মনে হয়। ষাট মাইলেরও দূরে থাকাব ফলে যে অট্টালিকাকে আমি কোনদিন জানতে পারিনি, সে কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আমায় নিয়ে চলে যায় কল্পনার জগতে, জ্বালায় স্বপ্নের রংমশাল। আর আমি ক্ষণিকের ভেতর অনুভব করি রসেটির অনুপম মনোভঙ্গি; আমাদের ভালবাসার উপযুক্ত এমন নীড় নির্বাচনে ওর কল্পনার কাছে হার মানি।

রাত গভীর হল। পায়ে পায়ে ক্লান্তির নূপুর। যা হোক দিয়ে সেরে নিলাম রাতের খাবার। ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ। আর পারছি না সারা দিনের ধকল বইতে। এবার ঘুমোতে যাব, ঘুমিয়ে পড়ব।

স্বপ্ন। নিরন্তর স্বপ্ন। আর আত্মা যত বেশী সুকুমার, যত বেশী অভীপ্সু, স্বপ্ন তত বেশী অসম্ভব। না; আমার স্বপ্ন আবার গোলাপ হল। ভরে উঠল ফুলে, সুবাসে; পাখীর ভালবাসায়। টের পেলাম ললাটে কার উষ্ণ শ্বাস, আনত হল সে, ঝুঁকে পড়ল ঠোঁটে, ভরিয়ে দিল আবেগের চিহ্ন। চুম্বনের শব্দ আমার ওষ্ঠে মিষ্টি ভেজা-স্বাদ দিয়ে জানিয়ে দিল এ স্বপ্ন নয়। চোখ মেললাম, আর এই প্রথম দেখলাম রসেটির ঝলমলে ঘাড়, বিছানার ওপরেই ঝুঁকে পড়ে সে আমায় জড়িয়ে ধরেছে, থর থর করে কাঁপছে ও। আমিও সবেগে জড়িয়ে ধরলাম বুকের ভিতরে পিষে ফেলতে, খুব আদর করে পাল্টা চুমো দিলাম; যেমন অনেক—অনেক কাল আগে দিয়েছি।

এক সময় সে উঠে গেল। পর্দা সরিয়ে দিয়ে খুলে দিল জানালা, তারপর আমার বিছানার একপাশে বসল, ওর হাতের ভিতর তুলে নিল আমার হাত, খেলা করতে শুরু করল আংটি নিয়ে। ওর পরিচ্ছদ সাদাসিধে হলেও এমন বারাঙ্গনাসদৃশ যে আমি লজ্জা পেলাম। খারাপ লাগছে এই ভেবে যে আমি ওর প্রেমিক ছিলাম, আর কোনদিন সেরকম ফিরে আসবে না।

সে আমার স্বপ্নকে এমন বাস্তব করে দেবে ভাবি নি। যুঁই ফুল দিয়ে আমার জানালা ঘেরা, গন্ধে ঘর ম' ম' করছে, মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে অনেক ফুল, যেন হয়ে গেছে এই মাত্র রুপোলি বৃষ্টি। বারান্দায় ফুটে আছে হাজার বিদেশী ফুল, ভেসে আসছে কত মিষ্টি গন্ধ, আমি যেন ভেসে চলেছি কোন্ স্বপ্নের জগতে, মায়াময় বিচিত্র ভুবনে। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জলধারা, জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে ঝকমকে আলো, মাঝে মাঝে পাখীরা গান গাইছে, শিস দিচ্ছে। গাছের পাতায় পাতায় নিঃশব্দে নামছে শিশিরের ফোঁটা। নির্জনতায় ডুবে আছে সমগ্র এলাকা।

গোটা দৃশ্যটিই শান্ত, টাটকা, উচ্ছল। যে দিকেই চোখ ফেরাই সব কিছুই সুন্দর, প্রাণবন্ত। আমার ঘরখানাও খুব ছিমছাম, সাজানো গোছানো। মেঝেয় মাদুর বিছানো, পেট-মোটা ঘাড়-সরু নীলচে জাপানী ফুলদানিতে অদ্ভুত ফুল শোভা পাচ্ছে তাকে। দেয়ালে দুখানা ছবি টাঙানো—একখানায় গ্রামের দৃশ্য, আরেকটিতে রাখালীয়া রূপ, প্রত্যেক কোণের দিকে সোফা-ডিভান, সর্বোপরি ঘরে আমার রাজহংসীর মত ধবধবে সুন্দরী যৌবনবতী মহিলা, যার অঙ্গে অঙ্গে মাদক উষ্ণতা—যাকে স্পর্শ করলেই দেহে খেলে যায় রোমাঞ্চ বিদ্যুৎ।

ফলে আমার বিমুগ্ধ নয়নে শুধু সুন্দরের উপস্থিতি। ঘরের সুবিন্যস্ত রূপ থেকে রসেটির চটি জুতো—কোন কিছুই এড়াতে পারে না আমার চোখ। রসেটির গ্রীবা ভঙ্গিমা, তার চলন-বলন, সব কিছুতেই সুরের মূর্ছনা, কবিতার ছন্দ। ঘরের ভেতরে কোন চোখ-ধাঁধানো রঙের জৌলুস নেই, সব কিছুর মধ্যেই রুচি স্নিগ্ধতা, মোলায়েম ভাব। কোনটার রঙ জল-সবুজ, আকাশ-নীল, বা খড়ের মত হলুদ। ফুলের সমারোহ, আলোর কোমলতা, রেশমী পেলব শরীরের কবোষ্ণ ছোঁয়া; মোহিনী আড়ালের মদিরতা আর দূর থেকে ভেসে আসা আবছা সুরের আমেজ—সব মিলে মিশে তৈরী করে এক সুখের ভুবন। এর চেয়ে আর কি সুখ চাই? যে আমি ভয় পেতাম পতিতাপল্লীতে যেতে, যে-আমি রোমাঞ্চকর অভিযান ছাড়া আর কোন কিছুর স্বপ্ন দেখতাম না, যার ছিল উন্মত্ত আবেগ, নানান সন্দেহে-ঈর্ষায় যে ভুগত বরাবর, তার কাছে এর চেয়ে সুখ কিসে? আমি সুখী। না, আমি আর কিছু চাই না, আর কিছুর অন্বেষণ আমার নেই।

আমরা এখানে কেমন জীবন যাপন করতাম তা তোমায় বর্ণনা করতে পারব না, তবে নিশ্চয়ই তুমি তা কল্পনা করে নিতে পারো। কখনো বিশাল বনের ভেতর দিয়ে হাঁটা, প্রজাপতির মতো কখনো রঙীন হয়ে ওঠা, নীল ফুলে দুলে দুলে চুমো খাওয়া

জলের স্রোতে হাত ডুবিয়ে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠা, ফুরফুরে এলোমেলো ঘোরা, সুর ভাঁজা, ঘাসে ঘাসে গড়াগড়ি, নদী তীরে প্রাণ-খোলো চিৎকারের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি —সব মিলিয়ে আমরা যে আকাঁদিয়ান জীবনই যাপন করতাম তা তুমি নিশ্চয়ই কল্পনা করে নিতে পারো।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের পায়রার চেয়েও অনেক বেশী গরম খেয়ে রসেটি আমায় আদর করত, নজর রাখত। আমার হৃদয় ঘিরে বইত ওর বাতাস, জ্বলত প্রেমের শিখা, ও চাইত ওর শ্বাস-প্রশ্বাস হোক আমার শ্বাস-প্রশ্বাস, চাইত ওর চোখ ছাড়া আমি যেন আর কোনো দৃশ্য না দেখি, সব সময়েই সে আমায় ঘিরে রাখত আর তার অনুমতি ছাড়া কিছু করতে দিতে চাইত না—না দিত কাউকে ঢুকতে—না দিত বেরোতে, আমার হৃদয়ের পাশেই সে গড়ে তুলেছিল তার দুর্গ—সেখান থেকেই দিন-রাত আমার উপর রাখত কড়া নজর। পরম রমণীয় ভাবে যেমন প্রেম নিবেদন করত তেমনি শোনাত আমায় ভালবাসার গান। সে আমার হাঁটুর ওপর বসে আমার সামনেই এমন আচরণ করত যেন তার ঈশ্বর বা প্রভুর সামনে বিনীত ক্রীতদাসী। সে এখন আমায় বেশী আনন্দ দেয়, কেন না তার প্রেমে এমন আত্মনিবেদনের ভাব রয়েছে যা আমার প্রাচ্যদেশীয় স্বেচ্ছাচারী প্রবণতাকে বেশ খুশি করে। আমার অনুমতি ছাড়া এক পা চলে না, আমার কাছে জিজ্ঞেস না করে কিছু করে না, নিজের ইচ্ছা-কল্পনাকে পুরোপুরি সঁপে দিয়েছে আমার পায়ে, উপরন্তু সে আমার চিন্তা-ভাবনার হদিশ পেতে চেষ্টা করে এবং তা ধরতে চায়, সে নম্রতায় এখন এসেছে সত্যিকারের ঔজ্জ্বল্য ও স্নিগ্ধতা। রসেটি হয়ে উঠেছে এখন সত্যিকারের ব্যক্তিত্বময়ী। কোন দোষ না দেখলে, তার মত এমন আত্মনিবেদিত ভক্তিমতী মেয়েকে কেমন করে পরিত্যাগ করা? এ-তো করা যায় না। আর তা করলে নিজের কাছে জবাব দেবার কিছু থাকে না। তখন তা হয়ে ওঠে আপন হৃদয়েরই অপদার্থতা।

ওহ্। কেমন করে আমি ওর দোষ খুঁজব। কত ধৈর্য ধরে আর আমি ওর সঙ্গে ঝগড়া করার ছুতো খুঁজব! শয়তান কি আর আমায় সে সুযোগ দেবে! কত ভাবে না ওকে ক্ষেপিয়ে দেবার চেষ্টা করি, কত কড়া কড়া কথা শোনাই, এমন কি রেগে গিয়ে নিজেকে যখন কুমীর বা বাঘ বলে মনে হয়—যা তা বলি, তখনো সে চোখ ছল ছল করে, বিষাদ ছড়িয়ে, ভালবাসার গভীর থেকে এমন শান্ত, নম্রভাবে উত্তর দেয় যে ওর কাছে নিজেই ক্ষমা চাইতে তখন বাধ্য হই।

সে আমায় পুরোপুরি ভোগ করেছে, আমিও করেছি তার রূপ, দেহের মাধুরী। তা সত্ত্বেও বলব, রসেটি মাতাল হয়ে আছে, ভুল করছে। জানি, সব মহৎ আবেগই চায় নিত্যতা, নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে কালজয়ী হতে চায় আবেগ অনুভূতি। এ কথা সেও লুকোত না। যে ভাবে রসেটি আমায় তা বলত, যে ভাবে যুক্তি দিত, তোমার কাছে তা তুলে ধরছি ঃ

"এই সেই সরল ও সুন্দর স্বভাবী পুরুষ, যে নিজেকে কখনোই পুরোপুরি

কারো কাছে মেলে ধরবার সাহসটুকু পর্যন্ত দেখায় না, আমার উপর রয়েছে যার সামান্যতম আকর্ষণ, তাকেই আমি বয়ে বেড়াচ্ছি, আঁকড়ে ধরছি, আর সে হয়তো আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেই ডুবে মরবে ক্লান্তি আর নিঃসঙ্গতায়। কিন্তু সে যে কবি, মগজে তার খেলে বেড়ায় কত সুন্দর সুন্দর উপমা, আবেগতাপিত শব্দের দ্যুতি, নিজের বিবেকের কাছে সে হয়ে ওঠে কোন ট্রাইসটান বা চিরন্তন প্রেমিক-প্রতিম অ্যামাডিস। একদিন যাকে ঘিরে আমার ভালবাসা হয়ে উঠেছিল রঙীন, আদরে আদরে ভরিয়ে দিয়েছি যাকে, সে যদি এখন উপেক্ষা করে তবে তা দুর্বিসহ। অথচ এখনো আমি তার পথ চেয়ে আছি, আমার সকল গান এখনো তাকেই লক্ষ্য করে; তাকে বলি, আমি তার উপেক্ষার ভাষা, ঘৃণার আক্রোশ অবহেলা করে যাই। তাকে বলি হয় আমায় দূরে ছুড়ে দাও, নয়তো ফিরিয়ে দাও আমার প্রাক্তন প্রেম।

কোন কিছুই নিখুঁত পরিকল্পনামাফিক হয় না। ক্রীট রাজকন্যা হতাশ্বাস অ্যারিয়াডনীর ভূমিকায় অভিনয়ই কি ভাল নয়? সে-ও ছিল বিষাদ করুণ, উজ্জ্বল অনুরাগী। বিষণ্ণ প্রতিমা এই মহিলা এমনভাবে হাঁটুর ওপর কনুই রেখে তার চিবুকে হাত রাখত, যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার হাতের নীল শিরা-উপশিরা। বিরহতাপিতা এই বিরল-বন্দিনীর চুলগুলো ছিল তখন এলোমেলো, পোষাকের রঙ ছিল শোকার্তের মতো গাঢ় অন্ধকার। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলত, মুক্তোর মত টল টল করত চোখের জল।

সে ছিল এত সুন্দর, এত ভাল, আর এমন আবেগপ্রবণ যে তা ভাষায় বোঝানো যায় না। সেও ছিল আত্মত্যাগী, অনিন্দিতা। ছিল তার প্রেমের মুক্তা, স্বচ্ছ দর্পণ, দুগ্ধ বিন্দু, শ্বেত গোলাপ, অনুপম সুরভি-নির্যাস জীবন। এই সেই নারী যাকে নতজানু হয়ে বন্দনা করতে ইচ্ছে জাগে, যার মৃত্যুর পরেও তার দেহের টুকরো টুকরো অংশকেও পূজা করতে সাধ যায়। আর মানুষ কেমন করে এর প্রতিও অকৃতজ্ঞ হয়। জলদস্যুও তো এত খারাপ কাজ করতে পারে না। উপেক্ষা যে মৃত্যুরই তুল্য। একদিন সে তো মরবেই। আর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কতটুকু সময় আমরা হিসেব করতে পারি যাতে সুখী হয়েছিলাম? এ রকম নির্মম আচরণ যে মানুষ করতে পারে তার হৃদয়টিকে উপড়ে নিয়ে সেখানে পাথর বসানো দরকার।

হায় মানুষ! মানুষ!

আমি অবশ্য বলি, না এ সত্য হতে পারে না, সত্য নয়।"

মেয়েরা স্বভাববশতই মিলনাত্মক নাটকের অভিনেত্রী হতে চায়, আর তাদের সম্বন্ধে আমার ধারণাও খুব উঁচু নয়। চাটুপ্রীতি তাদের চরিত্রে স্বাভাবিক। এক কথায়, ওদের ওপর আমার আস্থা নেই। যাই হোক আমার প্রতি তার মনোভাব তার ঐ কথাবার্তাতেই কি স্পষ্ট নয়? এখন উঠতে হয়। তার মুখোমুখি কথা বলা সম্ভব নয়। আমাদের এখন তৈরী হতে হবে প্রতিবেশিনীর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে। বিদায়, বন্ধু বিদায়।

সৌন্দর্য

আমায় ভুল বুঝেছ। সংকীর্ণ হৃদয় আমার বইতে পারে না ভালবাসা, আমি বারেবারেই মিথ্যে বলেছি, ফাঁকি দিয়েছি, নিজের সঙ্গেই নিজে লুকোচুরি খেলেছি। আর রসেটি কোন অভিনয় করেনি, যদি কোন মহিলা সত্যিকারে কিছু করে তবে সে রসেটিই। ধ্যুৎ! তবু আমি ওর ওপর রাগি, কেননা ও তার আবেগকে ফাঁকি দিতে পারে না; লুকোতে পারে না। এ যে বন্ধন, একে ক্ষমা করা যায় না, এর চেয়ে ভাল হত যদি সব মিথ্যে হত, যদি সে অভিনয় করত। কি অসহায় অবস্থা! চলে যেতে চাই; তবু থাকি ; বলতে চাই 'তোমায় ঘৃণা করি'; তবু বলি আমি 'তোমায় ভালবাসি'।
আমার অতীত সামনের দিকে ঠেলে, পিছু ফিরতে দেয় না, থামতে দেয় না। দুঃখের সঙ্গেই খোলাখুলি বলছি এসব। অন্যের সঙ্গে প্রেমের ঘটনায় জড়িয়ে পড়া যে কতখনি লজ্জার তা তুমি বুঝবে না। মাঝে মাঝেই মনে হয় আমার তে. অনেক কাজ আছে, তুমি বুঝতে পারবে আমি কতদূর বিচলিত। মানুষের সব দুর্ভাগ্যের যা কারণ তা হল যে সে একটিমাত্র ঘরে স্থির হয়ে থাকতে জানে না। কী যে সাংঘাতিক আমার অবস্থা, কতখানি যন্ত্রণাদায়ক তা আর কাকে বোঝাব। আসলে অমিই দুর্জ্ঞেয়, আমিই অস্থির। নতুন কোন বন্ধু জুটলে পুরোণকে ছেড়ে মুক্তি পাওয়াও সহজ, কিন্তু আমি নিজেই যে খারাপ।
প্রেম মানুষকে হাসতে শেখায়, বাঁচতে শেখায়। বাগানে তো কত ফুলই ফোটে, কোনোটা শুকিয়ে ঝরে যায়, আবার কোনোটা হয়ে ওঠে রূপময়। যে ফুলটা ঝরে পড়ল তারই বোন হয়ত উজ্জ্বল হয়ে পেল অন্য কোন মর্যাদা। ফুল ফুটবে কি শুধু সেখানেই, সেই সুন্দর দেশে, যেখানে শুধু শান্তি, স্বপ্নে ভরা! অথচ নতুনত্ব চাই; বদলানো দরকার ঘর, অভ্যেস, ব্যক্তি। নইলে আসে একঘেয়েমি, ক্লান্তি, বিষাদ। আমি কাউকেই ভালবাসি না। শুধু আদর আর আদর পাবার জন্যেই একঘেয়ে হয়ে যেতে পারি না। তাই রসেটির সঙ্গে সম্পর্কটা চুকিয়ে দিতে চাই এখন।

এক সময় যা ভাবতাম তা আবার ফিরে আসছে, আমায় কুরে কুরে খাচ্ছে। এক সময় মিসট্রেসকে পাবার জন্য মনটা ছটফট করত, এমনকি রসেটির বাহুবন্ধনে বন্দী হবার পরও মনে সন্দেহ জাগত সত্যি সত্যিই আমি কাউকে পেয়েছি কি না। ওর ঘরের জানালা দিয়ে আমি যেন দেখতে পেতাম ত্রয়োদশ লুই-র রাজত্ব কালে ঘোড়ায় চড়ে দুলকি চালে বনের ভেতর হারিয়ে গেল কোন সুন্দরী রমণী। মেঘের ফাঁক দিয়ে সে হাসি ছড়িয়ে দিচ্ছে, পাখীর সুরে গাইছে গান, আর সে হল আমারই স্বপ্নের সুন্দরী। আমারও উড়ে যেতে ইচ্ছে হল সেখানে, মেঘের উপর দিয়ে ভাসিয়ে দিলাম ভেলা, এমন সময় কার হাতের কোমল স্পর্শ পেলাম যেন, হেমন্তের মাঠে মাঠে তখন শুধু শিশিরের জল ঝরে, হিম হয়ে আসে বাতাস, ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে দেখে চাঁদ আর তারাদের সাথে আমি একা জেগে থাকি, উড়ে যাই আকাশের সীমান্তের শেষে। হঠাৎ ডানা মেলে দিল সেই সুন্দরীও, সে ডানার কাঁপন লাগল মুখে, অস্থির হয়ে উঠলাম আমি। একসময় মনে হল পেঁছে গেছি গ্রহান্তরের দেশে। শনির বলয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক আমার আংটি। চারদিক থেকে ভেসে আসছে স্বর্গীয় সুর, কিন্তু আমার ক্লান্তি নেই, শান্তি নেই। নিজের অবস্থাটাও বলতে পারছি না, কম্পাসের কাঁটার মত শুধু ঘুরছি।

কখনো নিজেকে মনে হল পাখী। যে পাখী উড়তে উড়তে একদিন খসিয়ে ফেলল পালক, আটকা পড়ল জালে। ঘন-বোনা জাল থেকে বেরোবার জন্য ছটফট করছে, ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে জাল, দাপাদাপি করছে কিন্তু বেরোতে পারছে না। বরং, যত ছটফট করছে ততই ফাঁস জোরদার হচ্ছে। জাল আর জাল থাকছে না, হয়ে উঠছে ধাতব দেয়াল।

কত যে সময় আমি অযথা নষ্ট করলাম। অথচ একবারের জন্যেও তোমাকে বুঝবার চেষ্টা করলাম না! ভেতরে ভেতরে আমি কী কাপুরুষ! পথ চলতে আনন্দ উপভোগের তাগিদে এ আমি কি করলাম!

মাঝে মাঝে মনে হয় আর কারো সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করব, কিন্তু আমার তা কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। বরং ভাবি যদি এ-বাঁধন ছিঁড়তে পারি তাহলে আর কখনো এমন করে ফাঁসব না, হা হতোস্মি! আজ পর্যন্ত মন স্থির করে কিছু করতে পারিনি, উল্টোদিকে ওপর ওপর তো বেশ সুখীই আমি। রসেটির বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আমার সঙ্গে সব সময়ই সে ভাল ব্যবহার করেছে, সদয় থেকেছে। কোন কিছুতে সন্দেহের উদ্রেক হয় এমন আচরণই কোন দিন সে করেনি। আমাকে ঘিরেই সে ভরিয়ে রেখেছে তার ভুবন, আমাকে নিয়েই তার স্বপ্ন-আশা-ক্ষোভ ভালবাসা। ওর কাছে আমিই হলাম ভগবান, আমিই শয়তান। আমিই প্রেম আর আমিই সন্দেহ। বলো দেখি, এভাবে কোন মহিলা যদি পুরুষকে ভালবাসে তাহলে পুরুষটির কি আলাদা কিছু করার থাকে? সব পুরুষেরই মনের মধ্যে সব সময় যে সন্দেহের কাঁটা খোঁচা দেয় তা হল, তার আগে আরো অনেক পুরুষেরই মহিলাটি ছিল প্রেমিকা মেয়েটি অনেককেই হয়তো ভালবাসত কিন্তু নিজের মনে মনে হয়তো পুরুষটি ভেবে

বসে, না, তার মত এমন করে আর কাউকেই সে কখনো ভালবাসেনি। নিয়তিরই পরিহাসে এমন মহার্ঘ মহিলা তার কপালে জুটেছে, কিন্তু সে ঐ মহিলার ঠিক উপযুক্ত নয়। আর সত্যি বলতে কি মেয়েরাও এমন সতী-সতী ভাব দেখায় যেন বর্তমান পুরুষটিই তার প্রথম প্রেমিক!

শরীর ও মনের দিক থেকে সত্যিকারের পবিত্র কুমারী পেতে হলে একমাত্র আফোটা কুঁড়িকেই ভালবাসতে হয়। তার অঙ্গে লাগেনি হয়তো পশ্চিমা বায়ুর সোহাগ, বন্দী বুকে ঝরে পড়েনি বৃষ্টির ফোঁটা বা শিশিরের বিন্দু। হ্যাঁ, আভরণহীন ফুলই শুধু পবিত্র, একা একা মেলে ধরে সে তার শুভ্রতা। সুন্দর শালুক ধরে রুপোলি শঙ্খ, যেখানে পল্লবিত হয় না আবেগ, যেখানে ছোঁয়া লাগে শুধু একই সূর্যের সোনালী আলোর, একই সত্তার নিঃশ্বাস-নির্যাস, একই বাহুর অমল-পরশ। দুপুর বেলার উজ্জ্বলতাও তেমন সুন্দর নয়, যেমন রমণীয় উষার সুষমা আর পোড় খাওয়া জীবনের অভিজ্ঞ আমার আবেগ-উত্তাপের চেয়ে অনেক বেশী স্বর্গীয়। সবে ফুটে ওঠা যৌবনের ভালবাসার প্রথম কদম ফুল!

আমারো মনে মনে ইচ্ছে হয় স্ফুটোন্মুখ যৌবনের স্বাদ নিতে। ইচ্ছা জাগে পাহাড়ী ঝর্ণার জল পান করি, তুহিনশুভ্র পবিত্র সৃষ্টির প্রেমে বন্দী হই, জল থেকে তুলে আনি প্রথম মুক্তো, পেয়ে যাই ক্লিওপেট্রার সঙ্গ। কিন্তু, তা করতে হলে প্রথমে ছিঁড়ে ফেলতে হবে রসেটির সঙ্গে বাঁধন আমার। জানি তার কাছে আমি আর এই অনুভূতি পাবো না, তবে তা পাবার মতো যে শক্তি থাকা দরকার তাও তো আমার নেই।

তারপরেও আমায় বলতে হবে, যদি বলি আমি, যদি কিছু না লুকোই তোমার কাছে, যেমনটি বলেছি তেমনই যদি স্বীকার করি সব লজ্জার মাথা খেয়ে, তাহলে মনে রেখো এ সবই আমার তাৎক্ষণিক অস্থির ভাবনার প্রকাশ। যদি রসেটির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিই, তাহলেও সেই জায়গা পূরণ করতে আমার সময় লাগবে। একথা সত্য যে ওখানে অনেক বেশ্যাই রয়েছে, অনেকের সঙ্গেই আমার ভালবাসার সম্পর্ক ছিল, কিন্তু এখন তারা আমার কাছে বিভীষিকা। ফলে রসেটির বিকল্প তারা কেউ নয়; আর আমি উপভোগের নেশায় এমন বুঁদ হয়ে আছি যে আমার মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে পড়েছে বিষ; দুটো মাসও পতিতা ছাড়া থাকতে পারব না। এ ধরনের অহংবোধ নিশ্চয়ই খারাপ, তবু মনে হয় এই অহংই যদি ঋজু হয় তাহলে বহু চরিত্রের মধ্যে দেখতে পাবো অদ্ভুত মিল।

এ-এক ভয়ংকর বন্ধন। রসেটি আর আমি কিছুতেই আলাদা হতে পারছি না। অথচ তাজ্জবের বিষয় হল মহিলাকে ভালবেসেও আমি নিজেকে তার সমান ভাবতে পারি না।

রসেটির ফ্ল্যাটটা খুবই নির্জন। এই নির্জনতা, শান্ত-স্তব্ধতা ক্ষণিক তৃপ্তি দিলেও বেশীক্ষণ নয়। ফলে কত আজগুবি ভাবনাই না সেখানে আমায় পেয়ে বসে। কত যে উদ্ভট স্বপ্ন দেখি, কি বলব।

উফ্‌, আমি যদি আমার অন্য কয়েকজন বন্ধুর মত হতাম। যারা হাতের মধ্যে হাত

নিতে পারলেই খুশী হত; দস্তানায় চুমো খেত; যারা তাদের দেওয়া ফুল শুকিয়ে গেলেও ফেলে দিতে কষ্ট পেত, বারাঙ্গনার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তাদের ভজনা করত আর বলত, কি সুন্দর হৃদয় তোমার। না, এসব আমি পারি না; ধাতেই সয় না! যদি আমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকত, যদি কোন স্বামীর সঙ্গে তার স্ত্রীকে পাবার জন্য দ্বৈরথে নামতাম, যদি করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় দেখতাম কুৎসিত রমণীই চতুর, আর কদাকার ও বোকা মহিলারাই ভাল, যদি আমি নাচের ঘরে শুনতাম সুরের সিম্ফনি, এক কথায় যদি আমি কবি না হয়ে শুধু মানুষ হতাম বোধহয় আমি অনেক সুখী হতাম অনেক কম একঘেয়ে লাগত।

মেয়েদের মধ্যে আমি কি দেখতাম জানো? না; তাদের আত্মা বা মন নিয়ে আমার তেমন মাথা ব্যথা ছিল না, আমি চাইতাম সৌন্দর্য। আমার কাছে সব সময়েই মনে হত, যে মেয়ে সুন্দরী সে-ই চালাক ; তার আছে সুন্দর হবার মত মন। কিন্তু আমি জানিনা এরকম ভাবনার কোন দাম আছে কি না। সুন্দর চোখের ভঙ্গিমার মধ্যেও লুকিয়ে থাকে কত সুন্দর সুন্দর উপমা, সুনিপুণ ছন্দের মাধুরী। মঞ্জুভাষ মুখাবয়বই আমার পছন্দ, মডেল হবার উপযোগী গ্রীবাই আমার প্রিয়, সুগোল সুডোল অপরূপ স্তনই শুধু আমার অন্তরঙ্গ আকাঙ্ক্ষিত এ যদি আমি পাই তাহলে আমার পঞ্চাশটি আত্মাও নিবেদন করতে পারি তার ক্ষুদ্র পদতলে। সবচেয়ে উপাসক আমি স্নন্ত বরতনুর, মনে প্রাণে ভালবাসি রূপসী-রীতি, সৌন্দর্যই আমার কাছে অধিক রীতিকর। ভালবাসি কুসুমের মত ক্লান্ত, সুন্দরের ভাবনা-বিহ্বল রূপ।

সৌন্দর্যই একমাত্র অর্জন করা যায় না। যার এ-জিনিস নেই ভেতরে ভেতরে সে মরে যায়, কুঁকড়ে যায়। এ যে স্বর্গের দান! তাকাও ফুলের দিকে, তাতে করুণাময়ের স্পর্শ। এটা সত্য যে, আমি এমন অনিন্দ্য সৌন্দর্য সন্ধান করছি হয়তো যা কোনদিনই পাবো না। এখানে ওখানে কত মহিলাই দেখলাম, অনেকের সাহচর্যও মন্দ লাগে না; তাদের কাউকে কাউকে ভালবাসি হয়তো তাদের বিশেষ বিশেষ রূপের জন্য, কিন্তু তারা আমার আশ্রয় হতে পারে না; বিশ্রাম দিতে পারে না। সৌন্দর্য হল ঐকতান, সুর মূর্চ্ছনা। কুৎসিত মেয়ে দেখলে আমার করুণা হয় বটে কিন্তু দুঃখ পাই না, অথচ অসম্পূর্ণ শিল্প বা আধখানা সৌন্দর্য আমার কাছে যে কি মর্মান্তিক বেদনাবহ, তা আর কি বলব! দামী কাপড়ে তেলের দাগ যেমন চোখে আঙ্গুল দিয়ে তার বিশ্রী রূপটা দেখায় তেমন তো নোংরা কাপড়ে দেখি না।

রসেটি মন্দ নয়। সুন্দরী হিসেবে সে হয়তো আমার কাছে উতরে যায়, কিন্তু তাই বলে সে আমার স্বপ্নের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না। এ কথা ঠিক, তার তুলনাও খুব বেশী নেই। প্রস্তরমূর্তির মতোই তার রূপ। পক্ষান্তরে অন্যদের সৌন্দর্য খুবই সাধারণ মাপের। ফলে, যাদের খুঁটিয়ে দেখা চোখ নেই তাদের কাছে স্ট্যাচুর মতই মনে হবে রসেটি পরিপূর্ণ, স্পষ্ট হবে তার সৌন্দর্যের বিভা। কিন্তু ভালভাবে নজর করলে ধরা পড়বে প্রস্তরমূর্তির খুঁত, ভাস্করের ত্রুটি। আমার রসেটি এরকমই কোন ভাস্করের সৌন্দর্য-প্রতিমা।

তা ছাড়া, সৌন্দর্য বিষয়ে দু-চার কথায় কিছু বলা সম্ভব নয়। আমার কাছে মানুষের আচার-আচরণ, দাঁড়ানোর ভঙ্গি, হাঁটার ছন্দ; কথাবলার তাল-সুর; নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, রঙ্‌, কন্ঠস্বর, সুরভি অর্থাৎ গোটা জীবন নিয়েই হাজির হয় সৌন্দর্যের ধারণা আর মূর্তি। ভালবাসি আমি মহার্ঘ কিংখাব, ভালবাসি সুরভিত বিশাল কুসুম, ভালবাসি জলের সুর, ঝলমলে হাতিয়ার; অভিজাত অশ্ব, আর পল ভার্জিনের আঁকা ছবিতে পাওয়া দামী দামী শাদা কুকুর। এদিক থেকে আমি পেগ্যান, আর ঈশ্বরের প্রতি নেই কোন ভালবাসা, কেন না তিনি খারাপভাবে কত কিছু সৃষ্টি করেছেন। আমি চাই সর্বত্রই সূর্যের আলো পড়ুক, অপসৃত হোক ছায়া সব। রঙের বাহার, জলের বঙ্কিম স্রোত আর নগ্নতার গর্বিত প্রকাশই আমার পছন্দ।



বিশ্রী দেখতে এমন কোন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আমি কিছু কিনি না, যে-ভিখিরির কম্বল ও দারিদ্র্যও ছবির মত তাকে আমি দরাজভাবে ভিক্ষা দিই। কোন সুন্দর ঘোড়া বা চমৎকার দেখতে কুকুরকে কখনো মারি না, আর কুৎসিত কেউ আমার সামনে এলেও ভ্রূক্ষেপ করি না—তা সে চাকরই হোক, আর বন্ধুই হোক। আমার কাছে সেটাই হল শাস্তি—কোন কুৎসিত লোক বা বিচ্ছিরি জিনিস দেখা। যে-বাড়ি দেখতে সুন্দর নয় বা ঘরগুলো ছিমছাম সাজানো নয়, সেখানে যত ভাল জিনিসই থাকুক বা আনন্দ দানের সামগ্রী থাকুক, আমার পা সেখানে একটুও এগোবে না। সাধারণ গেলাসে দেওয়া সবচেয়ে দামী শ্যাম্পেনে চুমুক দেওয়ায় আমার বিন্দুমাত্র রুচি নেই। আমার কাছে বাইরের চেহারাটার দাম অনেকখানি। এ কারণেই কোনদিন বৃদ্ধদের সঙ্গ দিই নি; বা দিই না; ওরা আমায় বিষণ্ন করে তোলে, মনে সব বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ওদের জন্যে আমার করুণা হয়, পৃথিবীর সব ধ্বংস হয়ে যায় বলে মনে হয়। আর সবচেয়ে দুঃখের হল মানুষের ধ্বংস।

আমি যদি চিত্রকর হতাম [দুঃখ হয় আমি তা নই] আমি শুধু আঁকতাম দেবীদের পরীদের-বিদ্যাধরীদের; ম্যাডোনা; দেবদূত আর কিউপিডের ছবি।

পৃথিবীতে আমার একমাত্র বাঞ্ছিত হল সুন্দর হওয়া। অর্থাৎ প্রায়াম পুত্র পারিস বা

অ্যাপোলোর সৌন্দর্যই শুধু আমার কাম্য। আর কোন অবয়বকেই বিকৃত করা চলবে না। আমার নিজের মধ্যেই যদি কখনো মনে হয় আমার আদর্শায়িত পুরুষ চেহারা আর নেই তাহলে নিজেকেও ক্ষমা করব না। বেছে নেব আত্মহননের পথ, কেটে ফেলব পা, কাঁধ কেটে ছুঁড়ে ফেলব পাহাড়ে, নাক কেটে নিয়ে খেতে দেবো তা বাঁদরকে। হ্যাঁ, অসুন্দরকে দিয়ে পৃথিবীতে কি হবে? অনেক সময়ই আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে দেখি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তন্ন তন্ন করে দেখি কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে কিনা। অবশ্য জানি একদিন এই রূপ ঝরে যাবে, বৃদ্ধের চামড়ায় ফুটে উঠবে সাপের রঙ। যাই হোক, আমার চারিদিকে যারা ঘোরে ফেরে তাদের দু-তিনজনকে খুন করতে পারলে খুশি হতাম। অবশ্য লক্ষ্য রাখতাম যাতে তাদের অঙ্গ বিকৃত না হয়, আর আমি যদি তাদের আত্মা অন্য দেহে চালান করে দিতে পারতাম, তাহলেই খুন করে পেতাম আনন্দ। সব সময়েই আমি দেখেছি, যা আমি চাই তা করতে হলে দরকার মহান আর নিখুঁত সৌন্দর্য, হায় তা যদি আমার থাকত!

কত সুন্দর মুখই না ছবিতে দেখি। কিন্তু তার মধ্যে আমার নেই কেন? কত নয়ন ভোলানো মস্তক শোভা পেত একদিন চিত্রমঞ্চে, তারপর সময় বয়ে যেত তাদের অজান্তে, মঞ্চ থেকে তারা অপসৃত হত, ধুলো জমত; দেখতে দেখতে সেই সব মুখ হারিয়ে যেত কালের অতলে। কিন্তু তাদের ফ্রেমগুলো কি হয়? বরং তাদের ফ্রেমে যদি আমার মুখাবয়ব শোভা পেত, সেটাই কি ভাল হত না?

সুন্দর মাত্রেই নিজের কাছে মুগ্ধ। যে-ই দেখে সে-ই হেসে অভিবাদন জানায়, গ্রহণ করে নেয় অনায়াসে। সকলের সামনে যদি তুমি কিছু বলতে চাও; দেখবে তারা আগের থেকেই মুগ্ধ হয়ে রয়েছে, যা বলবে তাতেই তাদের সায় পাবে, তোমার মতে হবে এক। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাও দেখবে সবাই তোমায় দেখছে, কেউবা সরাসরি, কেউ কেউ লুকিয়ে, কিন্তু দেখছে সবাই, ভাবছেও কখনো কখনো। যদি কোন ব্যালকনিতে দাঁড়াও দেখবে আড়চোখে হাজার জোড়া চোখের শরে বিদ্ধ হচ্ছ তুমি। এদের মধ্যে হয়তো তোমার বন্ধু আছে, আছে বারাঙ্গনাও। যতই তোমার গুণ থাক সেটাকে কেউ আগে দেখবে না, দেখবে তোমার রূপ, বাইরের চেহারা। ঝলমলে রূপেই বাজার মাত করবে, তোমার তখন হবে উঠবে রমরমা ভাব।

মানুষ আর কিইবা চায়? সৌন্দর্যের সঙ্গে যদি অসম্ভব শক্তিধর হতে পারো তাহলে তোমার ধারে-কাছেও কেউ ঘেঁষতে পারবে না। অ্যান্টিনাসের রূপ আর হারকিউলিসের শক্তি একত্রে মিললে তো কথাই নেই। আমার বিশ্বাস আছে যে, ঐ দুটো জিনিসের সঙ্গে আমার আত্মা যুক্ত হলে, মাত্র তিন বছরের মধ্যে আমি বিশ্বের সম্রাট হয়ে যাব! সৌন্দর্য ও শক্তির মতই আরো একটা জিনিসে আমি অভীপ্সু। তাহল যদি আমি আমার চিন্তা ভাবনাকে এক থেকে অন্যজনের ভিতরে চালান করতে পারতাম। দেবদূতের রূপের সঙ্গে বাঘের বল আর ঈগলের ডানা পেলে আমি বুঝিয়ে দিতাম পৃথিবী অত অবিন্যস্ত নয়, যেমন মনে হয়েছিল আমার প্রথম প্রথম।

আমি ভালমতই টের পেয়েছি যে সব আবেগ ভালবাসার পেছনেই এই তিনটি জিনিসের রয়েছে অবদান। আমি ভালবেসেছি হাতিয়ার ঘোড়া আর নারী। হাতিয়ার দিয়েছে আমায় সাহস যা আমার তেমন নেই; ঘোড়া দিয়েছে ডানার মত গতি, আর নারীর মধ্যে পেয়েছি সৌন্দর্য—যার অভাব রয়েছে কিছুটা আমার মধ্যে। এবং সব অসম্ভবই আমায় দেয় আনন্দ, খুশি করে।

কিন্তু যে আমি এখনো যৌবনে টগবগ করছি তার কাছে গোটা ব্যাপারটাই কি অদ্ভুত নয়? অতিরিক্ত পরিতৃপ্তিই আনন্দ আনে এবং এটাই সাধারণ সপ্রতিভ নিয়ম। কিন্তু অধিকারে রাখাটাই পরিতৃপ্তির একমাত্র পথ বলে ভুল করো না আবার। জমানো আর তৃপ্তিলাভ মোটেই এক জিনিস নয়। পাতে খাবার জমিয়ে লাভ কি, যদি না আনন্দের সঙ্গে তার স্বাদ নিতে পারো? বলো, আর কতই বা বাস্তব শিক্ষা নিতে হবে? কোন অভিজ্ঞতায় আবেগ আর চিন্তা সমান হয়ে উঠবে?

আমাকে অভিভূত করার যার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই তাকে আমি শেষ করে দিতে পারি। রোমান সাম্রাজ্যের প্রবল ক্যালিগুলা, তিবেরুস ও নীরো, তোমাদের অনেকে ভুল বুঝলেও আমার সঞ্চিত সমস্ত করুণাই তোমাদের প্রতি! হ্যাঁ, সমুদ্রের উপর তৈরী করতে চাই আমি সেতু, আর নতুনতর অভিজ্ঞতা ও টাটকা আনন্দ উপভোগের জন্যে হতে চাই নারী। নীরো, নিজের জন্য আমি যে বাড়ি তৈরী করছি তার কাছে তোমার স্বর্ণ প্রাসাদ নোংরা আস্তাবল, তোমার তোষাখানার চেয়ে আমারটা অনেক বেশী সুন্দর; অনেক কাজের। তোমার চেয়ে আমার রাস্তাগুলোয় যেমন গোলমাল বেশী তেমনি রক্তের দাগও অনেক, আমার সুগন্ধি-ফোয়ারা তোমার চেয়েও জোরদার ও প্রাণমাতানো। তোমার ক্রীতদাসদের চেয়ে আমার ক্রীতদাসের সংখ্যাও যেমন বেশী তেমনই মজবুত তাদের শরীর, আর আমার রথে শোভা পায় নগ্ন বারবনিতারা, আমি তোমার মতই নির্মমভাবে হেঁটে যাই লোকের বুকের উপর দিয়ে। এ সব সত্ত্বেও আমি যদি মানুষ না হই, তাহলে দেবতা নই কেন?

ওহ্! এখনো অনেক সময় লাগবে আমার। আমার নিয়তি কি আমার মুখের ভেতরটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে বদলে দিল? আমিই কি হয়ে উঠছি ভূকম্পনের হেতু?

যখন ভাবি আমিও জন্মেছিলাম মায়ের কোলে, আমারও ছিল মিষ্টি মা, যাঁর ছিল সাদাসিধে সরল স্বাদ আর অভ্যেস, তখন নিজের রূপান্তরিত চেহারায় অবাক হয়ে যাই। তাঁর শান্ত স্বভাব, সুন্দর ভাবনাগুলো কেন তাঁর রক্তের মতো আমার শরীরে এসে মিশল না? কি করে এটা সম্ভব হল? কেন আমি হয়ে উঠলাম তাঁর মাংসের শরীর, কেন পেলাম না তাঁর মন? কপোতী শেষে জন্ম দিল এক বাঘ।

আমি মানুষ হয়েছিলাম সবচেয়ে শান্ত আর সবচেয়ে সুন্দর পরিবেশে। মায়ের ডানার নিচে যেন কেটে গিয়েছিল আমার শৈশবের বছরগুলো; বাড়িতে ছিল আমার ছোট্ট বোনেরা আর একটা কুকুর। আমার চারদিকে ছিল কাজ করতে করতে বুড়ো হয়ে যাওয়া ভদ্র ভৃত্যদের মুখের মিছিল। কিন্তু যত বড়ো হলাম, কেমন যেন সব বদলে

যেতে লাগল। কেমন যেন সবাই আলাদা হতে থাকলাম। ধীরে ধীরে আমার ভেতরে ভেতরে পচন ধরল। বাড়ির পবিত্রতা আমার কাছে হয়ে উঠল দুঃসহ। নিজের সঙ্গে নিজের লুকোচুরি খেলাশুরু হল। লোকদের ঠকালামও একবার। অধঃপতন দ্রুত লয়ে গ্রাস করল আমায়। মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। সব কিছু মনে হল শূন্য। সব কিছু লাগল তেতো। দেখতে দেখতে আমি আর পরিবারের কেউ রইলাম না, হয়ে উঠলাম বিষাক্ত ছত্রাক। ধ্বংসের পথে এগোলাম জোর কদমে।

নিঃসঙ্গতা আমায় ঘিরে ধরল, কুরে কুরে খেল। যদিও নির্জনতাই আমার কাছে একদা প্রার্থিত ছিল তবু আমার কাছে জীবনের চেয়ে নিঃসঙ্গতা হয়ে উঠল ভয়ংকর দুর্বিসহ সমাজ আমাকে ক্লান্ত করে দেয়, বড়ো বেশী ক্লান্ত—ক্লান্ত করে; কিছুই আর ভালো লাগে না, কোন কিছুতেই আর মন বসে না। অথচ এখানে আমি এক মুহূর্তও একা থাকতে পারি না, দাঁড়াতে পারি না নিজের মুখোমুখি। কত লোক আসে যায়, কারো সঙ্গে কথা বলি না, কেমন যেন হয়ে যাচ্ছি আমি। রসেটি তা টের পেল, কিন্তু সে-ও ভুল বুঝল। একদিন একজন লোক এল, আমার স্বপ্নের মত মানুষ এল রসেটির কাছে বাস্তব চেহারা নিয়ে। সত্যিই সে সুন্দর, যথাযথ। রসেটি তাকে অন্তরঙ্গ ভাবেই উষ্ণ অভ্যর্থনা করল। কিন্তু আমার মনে হল তার এটা পরিকল্পনামাফিক কাজ। সে আমার মধ্যে বোধহয় ঈর্ষা জাগাতে চাইছে। নিভন্ত আগুনে বাতাস দিয়ে দাউ দাউ জ্বালিয়ে দিতে চাইছে আমার মৃতপ্রায় আবেগ। কিন্তু আমার মধ্যে জন্ম নিল না ঈর্ষা, আগন্তুককে আমার ভাল লাগল, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলাম।

মনোরম ছবি

পাঠক, আপনাদের কিছু সময় আমি নিয়ে নেব বলে আমায় ক্ষমা করবেন। এখন আমি এমন এক স্বপ্নদর্শীর বাবুবিলাসের কথা সোজাসুজি বলতে চাই। না, কোন নাটকীয়তার ছোঁয়া থাকবে না, তিনি মঞ্চে এসে নিজেই নিজের কথা বলতে চান। পাঠক, এ সময়টুকু আপনারা আমাকে নিশ্চয়ই দেবেন। পরে আবার যথা সময়ে আমি হাজির হব, বলব এই যুবকবাবুটি তার বন্ধুর কাছে যা যা বলেছে।

বাবুর হাতের ওপর উর্দিপরা ছোট্ট ছেলেটি এত ক্লান্ত হয়েছিল যে ঘুমিয়ে পড়েছে। এমনভাবে সে ঘুমোচ্ছে যেন মারা গেছে। যে-নতুন বাড়িটায় বাবুটি আসছেন তারই কাছাকাছি, দরজা থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে, আর যে-ভৃত্যটি তাঁকে পথ দেখিয়ে এই বাড়িতে নিয়ে আসছিল সে ছেলেটিকে কোলে নিতে চাইল. ভদ্রলোক তাকে ধন্যবাদ জানালেন, কিন্তু তাকে দিলেন না ; যেন ঘুমিয়ে-পড়া শিশুটির ভার তাঁর কাছে কোন বোঝাই নয়। শিশুটির প্রতি ভদ্রলোকের এমন সন্তর্পণ যত্ন যাতে তার ঘুম না ভাঙে। কোনো মা-ও এর চেয়ে বেশী যত্ন নিতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এক সময়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লেন, এবার ভৃত্যটি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে ছেলেটির পায়ের জুতো খুলবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, বরং জেগে উঠল। তন্দ্রার ভাব তবু দুচোখ জুড়েই রইল। শিশুটি আবার ঘুমিয়ে পড়ল, জুতো-মোজা খুলে তাকে শুইয়ে দেওয়া হল মখমল সোফায়। শিশুটির পা দুটো ঠিকমতো পাশাপাশি করে দিলেন লোকটি। ছোট্ট পা দুখানি যেমন নরম তুলতুলে তেমনি ধবধবে, জুতো পায়ে থাকায় এখন কিছুটা গোলাপী-গোলাপী লাগছে, দেখলেই অদ্ভুত মায়া জাগে, যেন ছড়িয়ে দিচ্ছে তা দিব্য বিভা। সতেরো ঘণ্টার উপর পায়ে তার জুতো ছিল, পা তার এত ছোট যে কোন মহিলারও এত ছোট পা থাকে না, মনে হবে এরকম ক্ষুদে পা নিয়ে কেউ কি হাঁটিতে পারে! অথচ এই পদযুগলই কতো মূল্যবান। যুবকটি হাঁটু গেড়ে বসে আছে তার কাছে। এক সময় ওর নরম, হাতীর নতুন দাঁতের

মতো সুন্দর পা দুটো তুলে নিল হাঁটুর ওপর, ঝুঁকে পড়ল একটু, তারপর চুমো খেল গালে, প্রথমে বাঁদিকটায়, পরে ডাইনে। ছেলেটি চোখ মেলে তাকাল, উদ্ধারকারী প্রভুর দিকে তাকাল কৃতজ্ঞতায়, বলল 'ফিতের বাঁধনে ব্যথা লাগছে।' লোকটি পায়ের বাঁধন খুললেন, উর্দি-পরা শিশুটিকে তুললেন বুকে, পায়ে হাত দিয়ে দেখলেন বড্ড হিম হয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে গরম কাপড়-চোপড় দিয়ে মুড়ে দিলেন উদোল পা দুটো, আবার বসিয়ে দিলেন সোফায়। কাছে টেনে নিলেন একটা চেয়ার। তাতে তিনি বসলেন। এভাবেই কাটল দুঘণ্টা, লক্ষ্য করলেন শিশুটি আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, আহা মরি, একি মধুর ছবি। তাঁর মন যেন বলে উঠল, ঘুমা, আমি নয়ন ভরে দেখি। এ শিশুর পায়ের তলে ফেটে পড়ছে যেন তরুণ স্বর্ণ-প্রভা, ঘুমন্ত দুটো মুঠোর ভিতর জ্বল্-জ্বল্ করছে দুটো রক্তজবা, দুই গালে ফুটে রয়েছে রক্তপদ্ম আর রাঙা ঠোঁট দুখানিতে কোন্ অরুণের লেখা। একদৃষ্টে উনি তাকিয়ে রইলেন ওর কপালের ওপর, দেখলেন স্বপ্নের আলো-আঁধারি রূপ। ঘরের মধ্যে একমাত্র শোনা যাচ্ছে ঘড়ির টিক্ টিক আর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্বনি।

এ চিত্র নিশ্চয়ই মনোরম, যদি কোন চিত্রকর থাকতেন তাহলে এ ছবি তাঁর হাতে রঙে-রেখায় আরো কত প্রাণবন্ত হত! প্রভু-ব্যক্তিটি দেখতে খুবই সুন্দর, ঠিক যেন রূপসী রমণী। আর সঙ্গের উর্দি-পরা শিশুটিকে দেখলে মনে হয় একটা ছিমছাম যুবতী।

ভদ্রলোককে বিমর্ষ লাগছিল, অনেকটা সোনালি-পাঁশুটে রঙ, কিন্তু জীবনীশক্তিতে বেশ ভরপুর, নীল চোখ, খাড়া নাক, চওড়া কাঁধ তাঁর গর্বের বস্তু, কোন কোন সময় তাঁর মুখের হাসিটি বেশ মিষ্টি- মোহময়, সব কিছু মিলিয়ে তাঁর চেহারা মনে পড়িয়ে দেয় ইতালীয়ান শিল্পীদের আঁকা ছবি, খুবই অদ্ভুত, চোখ-ভোলানো ব্যক্তিত্ব।

কিন্তু বুঝতে পারি না ছেলেটির সঙ্গে তার সম্পর্কটি কি। কেমন করেই বা পরস্পর পরস্পরকে আকৃষ্ট করল? প্রভু-ভৃত্যে তো এরকম সম্পর্ক দেখা যায় না। তবে কি তারা দুই বন্ধু ছিল, দুই ভাই? ভাবা যায় না তাদের সম্পর্কের রহস্যটি।

নিচু স্বরে যুবকটি উচ্চারণ করল; 'কি সুন্দর ঘুমোচ্ছে, যেন দেবদূত।' আবার বলল, 'বিশ্বাস হয় না যে সে এর আগে আর এতখানি ঘোরেনি। ঘোড়ার পিঠে তিরিশ মাইল ছোটা বোধহয় ওকে অসুস্থ করে দেবে, দুর্বল করে দেবে। না, কালকেই কোন ব্যবস্থা করা দরকার, সুস্থ হয়ে ওঠা প্রয়োজন, বৃষ্টিস্নাত গোলাপের মতো ঝলমলে হওয়া প্রয়োজন। যদি ও জেগে না ওঠে, তাহলে ওকে আমি চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেব, ইচ্ছা করে আদরে আদরে আমি ওকে খেয়ে ফেলি। আহ্, কী সুন্দর চিবুক! কী মসৃণ আর সাদা ওর চামড়া! ঘুমোও, গর্ব আমার, ধন আমার, তুমি ঘুমোও! আহ্, তোমার মাকে আমার ঈর্ষা হয়, দেখতে মন ছটফট করে। না, না, না, তাকে দেখতেই হবে। ওর আবার কি অসুখ হল? না, এই তো ওর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলছে ঠিকমতো।. তবে খুবই দুর্বল, নাড়া-চাড়া করা ঠিক নয়। কে? মনে হচ্ছে দরজায় কে টোকা দিচ্ছে।'

বাস্তবিকই, দরজায় খুব আলতো করে দুবার টোকা মারার আওয়াজ হল।
যুবকটি উঠে পড়ল, ভয় পেল, সে তো ভুল শোনে নি! কান খাড়া রাখল, দরজা খোলার আগে ভাল করে যাচাই করতে চাইল, সত্যিই কেউ টোকা দিচ্ছে কি না। আবার শব্দ হল, একটু জোরে, ভেসে এল নারীকণ্ঠ, 'আমি, তেওদোর আমি।'
তেওদোর দরজা খুলল, কিন্তু রাতে নারীর আগমনে তার মধ্যে কোন ভাবান্তর দেখা দিল না, কোন বিচলিতি ঘটল না। রসেটির ঢোকার জন্য দরজা খোলাই রইল। সে আরো সুন্দর হয়ে উঠছে, আরো গোলাপী হয়ে উঠেছে তার মিষ্টি নামের চেয়েও। বুকের ভেতরে তার রোমাঞ্চের শিহরণ, সামনেই তার সুবেশ পুরুষ।
রসেটি বলল, 'তেওদোর।'
তেওদোর নিজের ঠোঁটে তর্জনী চেপে ধরল নিঃশব্দ মূর্তির মতো, তারপর ইশারা করে দেখিয়ে দিল ঘুমন্ত শিশুটিকে, পাশের ঘরে যেতে ইঙ্গিত করল।
'তেওদোর, রসেটি গাঢ় প্রেমার্দ্র স্বরে তার নাম ধরে ডাকল। আবার উচ্চারণ করল 'তেওদোর'। বাড়িয়ে দিল হাত, তার হাতের মধ্যে হাত বাড়িয়ে দিল এমনভাবে যাতে যুবকটি তাকে বসতে বলে।
'অবশেষে তুমি ফিরে এলে? এতদিন তুমি কি করেছ? কোথায় ছিলে? ছ'মাস হয়ে গেল তোমায় দেখিনি, ভাবতে পারো? আঃ! তেওদোর, এটা ঠিক করোনি। তুমি না ভালবাসলেও যে তোমায় ভালবাসে তাকে কি একটুখানি মর্যাদা, সামান্যতম করুণা করতে পারো না!'
'আমি কি করেছি, বলো?' সে উত্তর দিল। 'তুমি জানতে চাও, আমি কি করেছি? চলে গিয়েছিলাম, আবার ফিরে এসেছি; ঘুমিয়েছি, খুঁজেছি, দেখেছি, গেয়েছি আবার কেঁদেছি। খিদেয় মরেছি, তেষ্টায় ছটফট করেছি। কখনো গরমে ধুঁকেছি, ঠাণ্ডায় হি হি করে কেঁপেছি, একঘেয়ে—হ্যাঁ, একঘেয়ে হয়ে গিয়েছি, পয়সা ফুরিয়ে গিয়েছে আর ছ'মাস বয়স বেড়েছে, তবু বেঁচে আছি। ব্যস্। আর তুমি এতদিন কি করছিলে?'
'তোমায় ভালবেসেছি,' রসেটি উত্তর দিল।
'এই কি সব?'
'পুরোপুরি। সময়টা আমার খুব খারাপ কেটেছে, তাই না?'
'হায়! রসেটি, এর চেয়ে ভালভাবে কাটাতে পারতে। আর কাউকে ভালবাসতে পারতে, যে তোমাকেও খুব আদর করত, ভালবাসত।'
'আর ভালবাসা চাই না। প্রেমে আর রুচি নেই।' রসেটিকে বেশ ক্ষুব্ধ মনে হল। সে বলল, 'আমার ভালবাসাকে ধারে খাটাতে চাই না। আমি চাই নির্মল দানের মত খাঁটি ভালবাসা, কোন বিনিময় নয়।'
'এদিক থেকে তুমি একেবারে আলাদা ধাতুতে গড়া। কেউ কেউ একেবারে নির্বাচিত আত্মা নিয়েই জন্মায়, রসেটি।' তেওদোর বলল, 'তোমার অভীপ্সানুযায়ী মাঝে মাঝে তোমাকে আমার ভালবাসতে ইচ্ছে করত, কিন্তু আমাদের মাঝখানে ছিল দুস্তর

বাধা, দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর—যা তোমায় জানাতে পারিনি, পারি না। যখন আমি এখানে ছিলাম না, সে সময় তুমি কি আর কাউকে ভালবেসেছিলে?'

'এখনো বাসি।'

'কি ধরনের মানুষ সে?'

'একজন কবি।'

'কি ধরনের কবি এবং সে কি করেছে?'

'খুব কমই জানি। তবে তার এমন এক খণ্ড কাব্যগ্রন্থ আছে যা আমি পড়বার চেষ্টা করেছিলাম এক বিকেলে, কিন্তু কিছুই বুঝিনি।'

'তাহলে একজন অপ্রকাশিত কবিই ছিল তোমার প্রেমিক? এ-এক আশ্চর্য ব্যাপার, কৌতুহলজনক। সে কি কাছে নেই আর? সে কি নোংরা পোষাক পরত?'

'না, পোশাক-পরিচ্ছদ তার অত্যন্ত সুন্দর। বেশ ছিমছাম। সবসময়েই হাত ধুয়ে আসত, নাকের ডগায় কালির বিন্দুমাত্র চিহ্নও দেখতে পাইনি কোনদিন। সে ছিল গ-এর বন্ধু, প্রথম আলাপ মাদাম দ্য থেমিনসের বাড়ি। মাদামকে তুমি নিশ্চয়ই চেন, এমন বয়স্কা মহিলার ছেলেমানুষি ভাব কার না মনে থাকে।'

'আমি কি তোমার অমন উজ্জ্বল পুরুষটির নাম জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'ওঃ, অবশ্যই। শেভালিয়র দ'আলবায়র।'

'আমি যখন ঘোড়া থেকে নামি, তখন যে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, সেই যুবকটিই কি আলবায়র?'

'ঠিকই ধরেছ।'

'সে আমার দিকে অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে তাকিয়েছিল।'

'হবে।'

'বেশ সুবেশ ও ছিমছাম দেখতে। তাহলে সে কি তোমায় আমার কথা ভুলিয়ে দেয়নি?'

'না। দুর্ভাগ্যবশতঃ, তোমাকে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'সেও যে তোমায় গভীরভাবে ভালবাসে তাতে কোন সংশয় নেই।'

'একথা আমি খুব জোরে বলতে পারছি না। কোন কোন সময় আসে যখন মনে হয় সে আমাকে ভীষণ ভালবাসে, কিন্তু হৃদয় দিয়ে ভালবাসে না; হয়তো ঘৃণাই করে। অভিজ্ঞ লোকের মতই তার আচরণ ছিল: আবেগ ছিল দুর্দম, কিন্তু অবাক না হয়ে পারতাম না যখন দেখতাম সেই প্যাশানও ঝিমিয়ে পড়ত, মন খারাপ হয়ে যেত। হয়তো গোটা ব্যাপারটাই ভুল, কেননা মানুষ মাত্রেই প্রেমিক, একজন ছেড়ে আরেক-জনকে আদর করতে উল্লাস তাদের বেশী।'

'যারা ভালবাসে না, এ ধরনের তথাকথিত প্রেমিকদের কি করা উচিত?'

'বাতিল ফ্যাশনের মত। আমাকে পরিত্যাগ করার মত জোর তার প্রথম দিকে ছিল না, যদিও সে কখনোই প্রেম-শব্দটির যথাযথ মানে বুঝে আমাকে ভালবাসেনি, সে শুধু আনন্দ দিত, ভীষণভাবে আদর করত, কিন্তু জানি সে বাঁধন ছিঁড়ে ফেল। সত্যিই

কঠিন। অথচ ওর ভেতর অনেক গুণ ছিল, ছিল মহত্ত্ব, ফুলের মতই তার আত্মার বিকশিত হবার জন্য দরকার ছিল চিরন্তন প্রেমের সূর্যকিরণ। আমার কাছে এটাই বিস্ময়ের যে ওর কাছে আমি সেই রবিরশ্মি হয়ে উঠতে পারিনি। যেসব প্রেমিককে আমি এখনো ভালবাসিনি সে তাদের মধ্যে নয়, বরং ওকে আমি প্রচণ্ড ভালবেসেছি। সবচেয়ে বেশীই ভালবেসেছি। আর আমি যদি নিজে খুব ভাল না হতাম তাহলে ওকে স্বাধীনতা দিতাম না, সবসময়েই বন্দী করে রাখতাম। কিন্তু আমি তা করতে পারি না, তাকে ব্যবহার করার সমস্ত সম্ভাবনাই আমি কিছু আগে শেষ করে দিয়েছি।'



'আর কতকাল চলতে পারে সেই সম্পর্ক?' তেওদোর জিজ্ঞেস করল।

'এক পক্ষকাল বা তিন সপ্তাহ খুব জোর। কিন্তু, আমার বিশ্বাস, ওর সঙ্গে সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত টিঁকে যেত, অবশ্য যদি না তুমি এসে পড়তে। কিছুক্ষণ আগেই তুমি বললে কোন এক কারণে তুমিও আমার কাছে আসনি, সেই কারণটা এখন আমায় বলবে? এসো, আমরা দুজনই দুজনকে ক্ষমা করি, ভুলে যাই যার যা ভুল। যখন তুমি এখানে রয়েছ তখন আমি নিজেকে অন্য কারো রক্ষিতা বলে ভাবতে পারি না, এতে আমার অভক্তিই ধরা পড়ে এবং মনে হবে তোমাকে ভালবাসার আর আমার অধিকার নেই।'

'ওর জন্যে আমার ভালবাসা রেখো।'

'তা যদি তোমায় আনন্দ দেয় আমি করব। আহ্, তুমি যদি আমার হতে, তাহলে আমার জীবনটাই বদলে যেত! আমায় ঘিরে পৃথিবীর সকলেরই ভুল ধারণা, আমিও সকলের সন্দেহ ঘুচিয়ে দিতাম, তেওদো, যদি তুমি আমার সঙ্গে থাক, একমাত্র তুমি, হ্যাঁ, তুমিই শুধু আমায় বুঝেছ, নির্মমভাবেই আমায় তা বুঝিয়েছ। যেভাবে তোমাকে আমি পেতে চেয়েছি এমনটি আর কাউকে নয়, ওগো প্রেমিক, এভাবে আর কাউকেই কখনো চাইনি, এমন কি তুমিও তা চাওনি। তেওদোর, যদি তুমি আমায় ভালবাস আমি বদলে যাব, বদলে যাব। তেওদোর, আমি হয়ে উঠব আবার পবিত্র, রমণীয়, তোমার কাছে মহার্ঘ, ভুলে যাব পুরনো স্মৃতি, ভুলে যাব লোকে আমাকে

যা যা ভাবে। না, আমি আর বেশ্যা হয়ে থাকতে চাই না, চাই না বহুবল্লভা হয়ে বেঁচে থাকতে। শান্তি চাই, বিশ্রাম চাই। অর্থ আর মর্যাদার বদলে চাই একটু আশ্রয়, ভালবাসা, শান্তি। অনেক মহৎ ঝোঁক আমার ছিল, অনেক গুণ নিয়েই আমি জন্মেছিলাম, কিন্তু কিছুই হল না; ভালবাসার মতো কোন লোক পেলাম না। কেউ জানে না, জানতে চাইল না, কী কষ্ট নিয়ে আমি এখন বেঁচে আছি।

না, আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না, বরং ভেসে যেতে ইচ্ছে করে নদীর ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায়। বিশ্বাস করো আমার মত হৃদয় কারো নেই, ছিলও না কখনো। যদিও তুমি ভেঙে দিয়েছো আমার বুক তবু বলি আমি তোমারই। চিন্তা ভাবনায় মনেপ্রাণে আমি শুধু তোমাকেই ভেবেছি, তোমারই ধ্যান করেছি। তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছি বরাবর। তোমাকে নিয়ে রচনা করেছি কত সুখস্বপ্ন, কত সুন্দর নীড়। না বুঝেই প্রতারণা করেছি একাধিক মহৎ হৃদয়, এখন তোমাকে দেখে আমার অনুশোচনার অন্ত নেই। জানতাম, এর জন্যে আমায় একদিন শাস্তি পেতে হবে, আর তা হবে নির্মম, নিষ্ঠুর। তেওদোর, প্রিয় আমার, যদি জানতে এ-বেদনা কত গভীর, কত যন্ত্রণাদায়ক সে অনুভূতি! একজনের জীবন থেকে শেষ হয়ে গেল সুখ, উড়ে চলে গেল আনন্দ পশরা, পড়ে রইল শুধু স্মৃতি, শুধু পাপ আর পাপের ভয়ঙ্কর রূপ। না, আমার মত হতভাগিনী কেউ নেই, আমি দেখলাম আমার সমস্ত গুণই রূপান্তরিত হল দোষে, অমৃত বদলে হল বিষ, খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল মানবিক মহৎ ইচ্ছা, পড়ে রইল শুধু দুঃখ যন্ত্রণা আর পাপ। তেওদোর, বুঝবে না কি ভয়ংকর যন্ত্রণায় আমি ছটফট করছি, কি ভীষণ অসহায়ভাবে আর্তনাদ করছি। তেওদোর, এযে কী অসহ্য, কী মর্মান্তিক!'

'ইস্ কি ভয়ংকর দুঃখ! রসেটি, গোটা পৃথিবীর ইতিহাস এক। আমাদের ভাল দিকটা চিরকালই অন্ধকারে থেকে যায়, কিছুই নির্মাণ করতে পারি না। কবিরাও ঠিক এমনি। তাঁরা যে সুন্দর সুন্দর কবিতা লেখেন, শব্দের পর শব্দ গেঁথে তৈরী করেন অনুপম ছন্দ, চিত্র আর সঙ্গীত, তার চেয়েও অনেক মহৎ কবিতা তাঁরা চাপা অভিমানের মতই বুকের ভিতর বহন করে ঘুমোন, লাইব্রেরীতে সেসব কবিতার কোন জায়গা হয় না।'

'আমার কবিতা আমি সঙ্গে সঙ্গে বহন করব।'

আমিও তবে তাই করব। হ্যাঁ, সেই আমি, যে এখনো তার জীবনে লিখতে পারল না একটা কবিতা। এমন কোন সুখী বা ভগ্নহৃদয় পুরুষ আছেন যিনি একটিও কবিতা কখনো হৃদয়ের অশ্রুতে লেখেননি?'

'ঠিক! আমার সমাধি স্তম্ভের জন্যে অন্তত কিছু সাদা গোলাপ থাকবে। কম করেও আমার দশ জন প্রেমিক ছিল, কিন্তু হৃদয় ছিল নিষ্কলুষ, এবং থাকবেও চিরকুমারী, পবিত্র। অনেক কুমারীর কবরেই অন্তহীন ঝরে পড়ে যূথী-নির্যাস, ফোটে কমলা কুসুম।'

'জানি রসেটি তুমিও অভিজাত; মহামূল্যবতী।'

'তুমি, হ্যাঁ শুধুমাত্র তুমিই জানলে তেওদোর, আমার মন। তুমিই বুঝেছ আমার ভালবাসা কত নিষ্পাপ, কত খাঁটি। কেননা তুমিই চিনেছিলে আমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, আমার মনের অলিগলি। অথচ কোন কিছু পাবার আশা তুমি করনি, কোন কিছুর বিনিময়ে আমাকে তুমি এমনভাবে চেনোনি। যে পুরুষ কোন মেয়েকে তার প্রেমের আলোয় দেখেনি সে বলতে পারবে না মেয়েটি কেমন, আর অনেক দুঃখ-লাঞ্ছনা তিক্ততার মধ্যে এটাই আমার পরম সান্ত্বনা।'

'এই যে যুবকটিকে তুমি ভালবাস তার সম্পর্কে তোমার ধারণাটা কি একটু বলবে? বলবে কি পৃথিবীর চোখেই বা তার স্বরূপটি কেমন?'

'প্রেমিকের ভাবনা সমুদ্রের চেয়েও গভীর, আর একজনের হৃদয়ে কি আছে তা বলা সত্যিই দুরূহ। তবু আমি মাঝে মাঝে তার দেখার চেষ্টা করছি, কিন্তু কখনো হাতে লেগেছে কাদা, কখনো পলতে পেরেছি ঝিনুক। তবে বেশীর ভাগই হল কাদামাখা ঝিনুক আর গুঁড়ো শামুক। যাকে আমি ভালবাসতাম সে ছিল সবচেয়ে আলাদা, তার ভঙ্গিমাটিই ছিল বিচিত্র। অন্যদের যেখানে শেষ ওর সেখানে শুরু, তাছাড়া আমার সম্পর্কে তার মতামতও ঘন ঘন বদল হত। সে আমার প্রশংসা করত, কল্পনার রংমশালে আমাকে আলোকিত করত। আমি ওকে আনন্দ দিতাম, আমোদিত করে রাখতাম। ইদানিং অবশ্য ওকে সহ্য করতে পারতাম না, একঘেয়ে লাগত। প্রথম প্রথম সে আর কি বলব তেমান। ওর সব কিছুতেই একটু বাড়াবাড়ি ছিল, আমার স্তুতি করতে পারলেই সে নিজেকে ধন্য মনে করত। প্রথম থেকেই এমন আচরণ করত যেন সে প্রেমে পড়তে চায়, প্রণয় ঘটিত কিছু একটা নাটক। আমার মনে হত ও হয়তো কোন আঘাত পেয়েছে, বুকের ভিতরে বয়ে বেড়াচ্ছে বোবা যন্ত্রণা, তাই সে একটা জানালা খুঁজছে, বেদনা বের করে দেবার পথ খুঁজছে। আমি ওকে বুঝতে চেষ্টা করলাম, দেখতে দেখতে কেমন যেন মায়া হল, তারপর কোথা থেকে যে কি ঘটে গেল বলতে পারব না। সব তালগোল পাকাল। সে আমার অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসল। এবার আর তাকে সরানো যায় না। ওর চেহারায় যে কী লালিত্য ছিল! আর থাকবেই না কেন, মাত্র বিশ বছরের তরতাজা যুবক, আর কি সুন্দর মুখশ্রী ওর! তবে ওর হৃদয়খানা ছিল তোবড়ানো, ফলের খোলসে ছাইয়ে ঠাসা। অমন সুঠাম বলিষ্ঠ সুন্দর শরীরে কিন্তু বাস করত এক শনি, সেই সব কাজকারবার চালাত ওর মনের মধ্যে বসে। স্বীকার করছি তেওদোর, মাঝে মাঝে বেশ ভয় করত, আঁতকে উঠতাম আমি, কখনো কখনো মাথাও ঘুরত। যাইহোক তোমার আমার যে দুঃখ তাতে কিন্তু ওর তুলনা চলে না। যদি ওকে আমি আরো বেশী ভালবাসতাম তাহলে আমি হয়তো ওকে মেরেই ফেলতাম। ওর ভিতর ছিল অদ্ভুত প্রাণচাঞ্চল্য, মাদকতা, ফলে দিন রাত সোহাগ করেও ছিল না ক্লান্তি, ছিল না শান্তি। আমাকে সে বিশেষ আমল দিত না। ভাবত ওর খামখেয়ালীপনাকে বুঝতে পারি সেরকম বুদ্ধিটুকুও আমার মগজে নেই। অথচ আমি সবই নজরে রাখতাম, তবু সে ভাবত, কেননা আমি ওর খেয়ালী-পনায় নিজেকে সঁপে দিয়েছিলাম, চাবি দেয়া পুতুলের মতই ওর ইচ্ছার কাছে নিজেকে

বিলিয়ে দিয়েছিলাম। ফলে সে ভাবতে পারেনি আমার মধ্যেও অন্য কোন ভাবনা-চিন্তার ভুবন আছে। সন্দেহ জাগেনি তার কোন কিছুতেই। মনে প্রাণেই আমি চেয়েছিলাম, ওকে পুরোপুরি সারিয়ে তুলতে। ও বিশ্বাস করুক যে তার সুখের জন্য আমি সব কিছুই করতে রাজি, ওর সুখই আমার সুখ, ওর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। এত গভীরভাবে ওকে আদর করতাম, এত তীব্র ভালবাসতাম যে ওর মনে আমার সম্পর্কে কোন সন্দেহই জাগতে পারেনি। আমাকে ও যে বহু ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করে, অনেক কিছু চিনতে ও দেখতে শেখায়। তা সত্ত্বেও তার আত্মপ্রতারণার প্রবণতা আমাকে এড়াতে পারে না, আমিও ওকে প্রতারণা করি। ঠিক পেশাদার অভিনেত্রীর মতই ভূমিকাটি আমি নিপুণভাবে অভিনয় করি।

'আমার স্বর, আমার মন, আমার সৌন্দর্য', আমার যৌবন ওর কাছে এমনভাবে সমর্পণ করে দেবার অভিনয় করেছি যাতে কেউ বুঝতে পারতো না ঘুণাক্ষরে সেটা অভিনয়। নাহ্, আমি অভিনয় করিনি, সত্যি সত্যিই ভালবেসেছি ওকে। তবে, হ্যাঁ, যখন সময় আসবে তখন চুরমার করে দেব ঐ ফাঁপা মূর্তিখানা, ওকে বুঝিয়ে দেব তার কিছুতেই ত্রুটি ছিল না, যা কিছু খারাপ হয়েছে তার সব দায়িত্বই আমার। নিজের কাঁধেই আমি তুলে নেব ওর সমস্ত অপরাধ। আচ্ছা, এটা কি সত্যি সত্যিই ভাল প্রতারণা নয়? এটা কি মর্যাদাসম্পন্ন জালিয়াতি নয়? জানো, আমার অধীনে রয়েছে এমন এক স্ফটিক কলম যাতে পুরে রেখেছি আমারই চোখের জল, আর জমিয়েছি তা ঝরিয়ে দেবার আকুল আবেগে। ঐ পাত্রটিই হল আমার গহণা-আধার, সেখানেই রয়েছে আমার বিবিধ ভূষণ, হীরক কুণ্ডল, আর তা আমি দান করে দেব ঈশ্বরের উপস্থিতে-তেই কোন দেবদূতকে।'

'তারা আরো রমণীয়' তেওদোর উত্তর দিল', যার জন্যে তুমি সব করেছ সে তোমার জন্যে কি করবে?'

'কেউই কিছু করবে না। হায়, তুমিও না।'

হে আমার অন্তরতমা, তা যে অসম্ভব। 'তবে হতাশ হয়ো না। তুমি সত্যিকারেরই সুন্দরী, উপরন্তু তোমার রয়েছে টলটলে কাঁচা যৌবন। অনেক রাস্তাই তোমার সামনে খোলা, নানান পথ দিয়ে, গাছ-লতা-ফুলের সমারোহের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তুমি পৌঁছে যেতে পারবে স্মৃতির সমাধি ক্ষেত্রে, সেখানে ঘুমিয়ে থাকবে তোমার ফেলে আসা দিনগুলো, মনে পড়িয়ে দেবে উজ্জ্বল মুহূর্তগুলো; কিন্তু তাতেই তুমি নিঃশেষিত হবে না। যা স্মৃতি তা শুধু স্মৃতি হয়েই থাক, কবরে শায়িত সেই প্রাক্তন মুহূর্তগুলিকে ফিরিয়ে আনার কোন প্রয়োজন নেই আর রসেটি। কী এমন হয়েছে? কেন এত ভেঙে পড়ছ? রসেটি, প্রিয় আমার, ওঠো, জাগো, সামনে তোমার এখনো সুন্দর ভবিষ্যৎ। এখনো তোমার সামনে রয়েছে বিরাট সাফল্যের সম্ভাবনা, একবার ব্যর্থ হলেই কি জীবনের সব শেষ হয়ে যায়? না, রসেটি, এমন ভেঙে পড়ো না। জানি হতাশা আসবে, বুক ভেঙে যাবে, চোখের জলে ভেসে যাবে বুক, তবু এগোতে হয়, বলতে হয় চরৈবেতি চরৈবেতি। বলতে হয়, চলো, চলো, চলো। জীবনটা সেই

চলার মন্ত্রেই দীক্ষিত, চলার সুরেই ঝঙ্কৃত। আমাদের জীবনের টাওয়ারও এভাবে তৈরী। এর জন্যে সাহসে বুক বাঁধতে হয়, আশায় আশায় উদ্দীপিত হতে হয়, কোন কিছুতেই হার স্বীকার করতে নেই। অন্ধকার ঠেলে ঠেলে পেঁছুতে হয় জীবনের উজ্জ্বলতর দ্বীপে, টাওয়ার চূড়ায়। আকাশ সেখানে সীমানাহীন, তারাদের চোখে স্বপ্নেরা সব হয় বিলীন। হ্যাঁ, ওতেই গভীর সুখ, প্রবল আনন্দ।'

'ওহ্, তেওদোর,' রসেটি উত্তর দিল, 'ঈশ্বর আমাকে করুণা করুন যাতে আমার জায়গায় পেঁছতে পারি আর সেখানে যেন অন্তত জানালা থাকে, আলো-বাতাস খেলতে পারে। গাঢ়তম অন্ধকারেও যেন সর্পিল ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে আমি ওপরে উঠতে পারি; কিন্তু ভয় হয় যদি কোন খোলা জায়গা না পাই, ভয় হয় যদি সে সিঁড়ি হয় অনন্ত; তাহলে কেমন করে আমি ছাদে চড়ব ?'

'এমন বলো না লক্ষ্মীটি। রসেটি, এরকম ভেবো না কিন্তু। জানালাবিহীন কি কোনও সিঁড়ি-ঘর তৈরী করেন কোন স্থপতি ? ঈশ্বরকে কি একজন সাধারণ স্থপতির চেয়েও নির্বোধ বলে মনে কর ? মনে রেখো ভগবান কিছু ভুলে যান না বা কোন ভুল করেন না। আমি বিশ্বাসই করি না তিনি তোমাকে এমন জায়গায় বন্দী করবেন যেখানে সামান্যতম আলো-বাতাস একটুও খেলবে না। সাহস চাই, রসেটি, সাহস চাই। যদি পরিশ্রান্তির ফলে কখনো দম বন্ধ হয়ে আসে তাহলে একটু থেমে জিরিয়ে নিতে হয় ! আমার মনে হয়, রসেটি, তোমাকে আর মাত্র বিশ পা এগোতে হবে, এবং তাহলেই পাবে তুমি তোমার সুখের সন্ধান।'

'না, কক্ষণো না। আর যদি আমি টাওয়ার চূড়ায় পেঁছুই তাহলে সেখান থেকে নীচে ঝাঁপ দেওয়াই হবে আমার বিধিলিপি।'

'ছুঁড়ে ফেলে দাও এইসব ফালতু চিন্তা। রসেটি, তোমার কপালে আমি দেখতে পাচ্ছি আত্মহননের বিশাল কালো ছায়া, বড় দুঃখ হয় তোমাকে দেখে, মায়া জাগে। রসেটি, যদি তুমি চাও আমি তোমাকে ভালবাসি তাহলে সুখী হও। না, কেঁদোনা, সোনা আমার কেঁদোনা।'

তেওদোর ওকে কাছে টেনে নিল, বুকের ভিতর টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরল রসেটিকে। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল ওর মুখ, ওর চোখের পাতা।

'তোমাকে ফের ফিরে পাওয়া যে কি দুঃসহ বেদনার, সে যে কি দুর্ভাগ্যের তা তোমায় কী বলব।' রসেটি উত্তর দিল, 'আর কি সুদিন ফিরে পাবো আমি, আবার তোমাকে পাবো তো ? তোমার রূঢ়তাও এখন অন্যের সুতীব্র আবেগের চেয়ে মধুরতর, তুমিই আমাকে দুঃখ দিয়েছো সবচেয়ে বেশী আর সেই দুঃখ ফিরে এল আনন্দের চেহারা নিয়ে, তোমার কাছ থেকেই পেলাম সেরা আনন্দ, পেলাম জীবনের আসল মানে। আমার আঁধারে তুমিই আলো, তোমার আলোয় জ্বলে উঠে পেলাম নিজেকে চিনতে তুমিই খুলে দিলে আমার জীবনে নতুন দরজা-জানালা, এনে দিলে জীবনের তাৎপর্য-মাধুর্য -সৌন্দর্য। স্বীকার করছি, ভালবাসার রূপ আমি দেখেছি, চিনেছি অসুখী প্রেমের স্বরূপ। বিষাদের ভিতরেই মূর্ত হয় প্রেমের অমর মহিমা, আবার বিস্মৃতিই হয়ে

ওঠে একান্ত ঈপ্সিত। নিঃসঙ্গ প্রেমের মধ্যেও রয়েছে সুখ, যদিও জানি, অনেকেই ঝরে যায় মরে যায় ভালবাসাহীন। তাই বলি, ভালবাসা পেলে আর সম্রাজ্ঞীর কে চাহে গরিমা? যে কাউকে কোনদিন ভালবাসেনি, বা পায়নি কারো প্রেম, তার মত দুঃখী মানুষ আর কেউ নয়। সত্যিই এরা করুণার পাত্র।

তারা কষ্ট পায়, দুঃখ পায়, অনুভব করে নিঃসীম যন্ত্রণা, কিন্তু তারা বেঁচে থাকে, চিন্তা ভাবনা করে, প্রবলভাবেই থাকে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, মনে মনে তারা বলে 'যদি সফল হই, যদি আমার ওসব থাকত তাহলে সুখী হতাম।' ভয়ংকর যন্ত্রণায় হয়তো তারা ছটফট করে, অথচ মৃত্যুর মুখেও একবার অন্তত বলি, 'ওর জন্যেই আমি মরব।' মৃত্যু হল পুনরায় জন্মগ্রহণ। মরণের দরজা পেরিয়ে পৌঁছে যাবে এক জীবন থেকে আরেক জীবনে। তারাই হল পাগল যারা বিশ্বভুবনকে বন্দী ক তে চায় আপন বাহুতে, তারা কিছুই করতে পাবে না আবার কিছু করে। তাদের কাছে যদি কখনো কোন দেবদূত বা পরী নেমে আসে তাহলে তারা হঠাৎ বলে ওঠে, 'কিছু চাইলেই কিছু না কিছু পাবে।' অবশ্য তারাও কখনো সখনো চুপচাপ থাকবে আর ঠেলে দেবে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে।'

'যদি কখন পরী নেমে আসে তাহলে তাকে কি জিজ্ঞেস করব, তা আমি জানি'—রসোট বলল।

'তুমিতো আমাকে জানো রসেটি, আর এ-ও জানো কোন কোন দিক দিয়ে তুমি আমার চেয়ে কত বেশী সুখী। আমার ভেতর কত যে এলোমেলো ভাবনা ঘুরপাক খায় তা আর কাকে বলি। এক ঝাঁক পাখির মতই আমার অভীপ্সা সতত চঞ্চল, লক্ষ্যহীনভাবেই ঘুরে বেড়ায় নিরন্তর। আর তোমার ইচ্ছা হল ঈগলের মতো—যার চোখ সব সময়ে স্থির হয়ে থাকে সূর্যের উপর, এবং ডানা ছড়িয়ে নিজেকে রক্ষা করে সূর্যের তেজ ও বাতাসের অভাব থেকে। আহ! আমি যদি জানতে পারতাম আমি কি চাই, যদি ধরতে পারতাম কল্পনা ও ভাবনা সতত কিসের অন্বেষণে ঘোরে, আমার চারদিকে কারা ঘিরে রয়েছে; যদি আমার স্বর্গে দেখা দিত আমার শুভ বা অশুভ নক্ষত্র, যদি রাতের বেলাতেও আমি অনুসরণ করতে পারতাম আলোর রেখা, যদি জানতে পারতাম আমি কোথায় চলেছি, কার সান্নিধানে চলেছি, তাহলে সত্যি সত্যিই বিমুগ্ধ হতাম। অথচ আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, অনুভব করতে পারলাম না, দেখতে পেলাম না, শুধু ঘুরছি আর ঘুরছি। চোখ বাঁধা ঘোড়ার মত আমি শুধু হাজার হাজার মাইল দৌড়লাম কিন্তু দেখতে পেলাম না প্রকৃত জগতের রূপ, দেখতে পেলাম না ভূস্বর্গের দৃশ্যাবলী। না, আমার অবস্থানের কোন বদল ঘটল না। দীর্ঘ সময় ধরেই আমি বদলাতে চেয়েছি নিজেকে, কিন্তু সব সময়েই আমি বন্দী হয়ে রইলাম খাঁচায়।'

'তোমার আর আলব্যয়রের মধ্যে অনেক ব্যাপারেই দেখেছি আশ্চর্য মিল। যখন তুমি কথা বলো তখন মাঝে মাঝেই মনে হয় যেন সে কথা বলছে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ওর সঙ্গে যখন তুমি কথা বলবে তখন তোমরা দুজনে এত কাছাকাছি

আসবে যে কেউ কাউকে সহজে ছাড়তে পারবে না, বন্ধুত্ব, পাতিয়ে ফেলবে নিমেষে। তার মতই তুমি সীমাহীন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করো, সত্যিই সে যন্ত্রণার্ত, ভালমত কিছু না জেনেই প্রচণ্ড আবেগে সে ভালবাসতে পারে, সে-ও চায় আকাশে উড়ুক তার কল্পনা উড়ুক উড়ুক তারা স্বপ্নের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক আবেগের পাখী সব, সে জানে পায়ের নীচের মাটি কত শক্ত; কত নীরস, অথচ সে গর্বিত, অহংকারী আত্মমগ্ন। লুসিফারের পতন ঘটেছিল, কিন্তু সে তার পতনের পূর্বমুহূর্তেও ছিল অনেক বেশী উদ্ধত, গর্বিত।



'প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম।' তেওদোর বলল, 'সে হল সেই জাতের কবি যাদের রচনা পৃথিবী থেকে কবিতার বিদায়লগ্নটিকে ত্বরান্বিত করে, যারা হৃদয়ের গভীর থেকে সুর না তুলে আপাত পার্থিব জিনিস নিয়ে মাতামাতি করে, মিথ্যে মায়ায় করতে চায় পাঠকদের বন্দী, এবং বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করার কাজে নিজেদের মতামতকে করে প্রয়োগ।'

'না, ও ঠিক সে জাতের নয়। তার কবিতাই তার নিশ্বাস, অন্য কিছু নয়। অনেক ভ্রান্ত ধারণারই সমাবেশ ছিল ওর জীবনে, নিজের কাছে নিজেই সে হল নির্ভেজাল খাঁটি কবিতা, আর আমি জানি না সত্যি সত্যিই সে অন্য কিছু লিখবে কি না। আত্মার গভীরে ডুব দেবার ক্ষমতা তার সহজাত, অদ্ভুত অদ্ভুত সব ধারণা তার মগজে করে কিলবিল, আর যেকোন সুলতানের চেয়ে সে গর্বোদ্ধত এবং প্রচণ্ড অসূয়াপরায়ণ। যে সব ভাবনাকে সে আমল দেয় না অথবা যা তার ব্যর্থ হৃদয়ের রক্তাক্ত ভাষা, কিংবা যাদের সে নির্বাসন দিয়েছে নির্মমভাবে, তাড়িয়ে দিয়েছে মনের দুয়ার থেকে সেই সব বিচিত্র, অসম্ভব ভাবনা নিয়েই তৈরী হয় তার কবিতা। সে যা চায় না তাই দিয়েই গড়ে ওঠে তার পৃথিবী।'

'আমি বুঝতে পারি এবম্বিধ ঈর্ষার কারণ এবং তা লজ্জার। অনেকেই দাঁত থাকতে যেমন দাঁতের মর্যাদা বোঝে না তেমনি যতক্ষণ না প্রেম থেকে চ্যুত হয় ততক্ষণ প্রেমের মহিমা বোঝে না। এরকমই তারা মিসট্রেসের মৃত্যু না হওয়া অব্দি ধরতে পারে না মিসট্রেসের প্রয়োজনীয়তা।'

'যাঁরা নীরবে নিজ নিজ আদর্শ ও ধারণাকে বুকের মধ্যে চেপে রেখে কবরে যান; যাঁরা তুচ্ছ চুমোয় নিজেদের না ডুবিয়ে; জনতার ভিড়ে হারিয়ে যান না, তাঁদের আমি বরং বেশী ভালবাসি, পছন্দ করি। সেই প্রেমিকই আমি চাই, তিনিই আমাকে আনন্দ দেন যিনি তাঁর মিসট্রেসের নামে কিছু লেখেন না, যিনি সব কিছুর শুধু প্রতিধ্বনিই করেন না, যিনি ঘুমের মধ্যেও স্বপ্নে তাঁকে দেখা দেন, তার কথা উচ্চারণ করেন। আমি এরকম স্বভাবেরই মেয়ে ; আমি কখনো উচ্চারণ করি না, তুলে ধরি না আমার ভাবনা-চিন্তা ধ্যান-ধারণা, চাই না কেউ জানুক আমার ভালবাসা। বরং আমার প্রেম; থাকুক থাকুক আহা, নিঃশব্দ নীরব। ওহ্, প্রায় এগারোটা বাজে। তেওদোর, এখন তোমার নিশ্চয়ই একটু বিশ্রাম দরকার, ঘুমের প্রয়োজন। এখন, যখন তোমাকে একা ছেড়ে যাচ্ছি, তখন বুঝতে পারছি আমি ডুবে যাচ্ছি আমার হৃদয় রহস্যে, প্রার্থনা করি অন্তত আমার শেষ সময়ে যেন তোমার দেখা পাই। যেতে হবে, তোমাকে ছেড়ে এখন আমাকে চলে যেতে হবে, জানি মন বলে যেতে নাহি দিব, তবু যেতে দিতে হয়। হ্যাঁ যেতে দিতেই হয়। কিন্তু ভয় হয় পাছে আবার আলবায়র আসে, সে আবার ফিরে তাকায়। বন্ধু, হে প্রিয় বন্ধু, বিদায়।'

উঠে পড়ল রসেটি। তেওদোর ওর কোমরে হাত রাখল, তারপর ওকে নিয়ে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগোল। দোরগোড়ায় এসে থমকে দাঁড়াল, অদ্ভুতভাবে তাকাল রসেটির মুখপানে। জানালার ফাঁক দিয়ে তখন এসে পড়ছে চাঁদের আলো, আলো আঁধারির মাঝারী পরিবেশে গোটা দৃশ্যটাই স্বপ্নময়। রসেটির গায়েও এসে পড়েছে সেই আলো, জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে তার শরীর, শুভ্রতায় মোড়া এক রুপোলি মানবী। ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে গেল, হাঁটতে শুরু করল। দেখতে দেখতে সে হারিয়ে গেল, ডুবে গেল জ্যোৎস্নার গভীরতায়। আর তাকে দেখা গেল না।

চাতুরী

ভোরের আলো ফোটা মাত্র আলবায়র এসে হাজির হল রসেটির কাছে। যা সে কোনদিন করেনি, যা তার স্বভাবের বাইরে, সেইরকম উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ-ব্যাগ্রতা নিয়ে রসেটির কাছে এসে উপস্থিত হল আলবায়র।

'তাহালে তুমি অবশেষে এলে, আর এলে এত তাড়াতাড়ি', রসেটি বলল। সে এ ও বলল, 'আর যখন এলে তখন তোমার অনুরক্তির নিদর্শন হিসাবে নাও আমার হাত, চুমো খাও।'

নক্সাকাটা চাদরের ভেতর থেকে, বিছানায় শুয়ে শুয়েই সুন্দরতম ছোট্ট হাতখানা বাড়িয়ে দিল রসেটি। বাহুর গোলগাল রূপে যেন গলে পড়ছিল মাখন।

আলবায়র গভীর ভাবে চুমু খেল তার বাড়িয়ে দেওয়া হাতে। বলল, 'এক হাতে তো খেলাম আর একখানা হাতই বা বাদ যাবে কেন? সেখানায় কি চুমু খাবো না?'

'ওহ্ হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনুমতির আর কিছুই নেই। আমি আসলে তোমার সঙ্গে এখানে রসিকতা করছি।' অন্য হাতখানাও সে বিছানার বাইরে আনল, তার মুখের কাছে তুলে নিয়ে একটু চাপও দিল তার দুঠোঁটের মাঝে। তারপর বলল, 'আচ্ছা বলতো, আমিই কি পৃথিবীর সবচেয়ে অনুগতা মেয়ে নই?'

'সত্যিই তুমি বিনীত ব্যক্তিত্বময়ী। তোমার সম্মানে মার্বেল সৌধ নির্মাণ না করে কারো উপায় নেই। কিন্তু ভয় হয় সাইকির বেলায় যা ঘটেছে তা আবার আমাদের ক্ষেত্রে না ঘটে। আমার তো মনে হয় ভেনাসও তোমাকে ঈর্ষা করে।' রসেটির হাত দুখানা একসঙ্গে তুলে নিয়ে চুমু খেতে খেতে আলবায়র বলল।

রসেটি বলল, কি সুন্দর, এক নিঃশ্বাসে তুমি মোলায়েম করে সব বলে ফেললে! এ ঠিক হৃদয় থেকে উঠে আশা আশ্চর্য বাগ্‌বিধি। আলবায়র উত্তর দিল, 'না, সত্যিই তুমি আমার কাছে চিরন্তন দামী। তোমাকে দেখলেই বুকের ভিতর উথলে ওঠে সুন্দর সুন্দর কথা; কবিতার মতই তুমি মোহময়ী।'

'ওহ্ তা হবে। কিন্তু তুমি আজ অসুস্থ বলেই কি এমন অনুরক্ত? ভয় হয় আলব্যয়র পাছে তুমি মারা যাও। আচ্ছা তুমি কি মনে করো যখন কোন লোক উপযুক্ত কারণ ছাড়া হঠাৎ তার স্বভাবচরিত্র বদলে ফেলে তখন সেটা মারাত্মক কিছু ঘটে যাবার পূর্বাভাস? তোমার চালচলনে এখন তো এটাই প্রমাণিত হয়, যে সব মহিলা তোমায় ঘিরে স্বপ্ন দেখে, ঝুট ঝামেলা পোয়ায়, তাদেব কাছে যথার্থই তুমি হয়ে ওঠো রহস্যময় বিচিত্র খেয়ালী। তোমার অনেক কিছু আচরণই ব্যাখার অতীত। অথচ আলব্যয়র তুমি খুবই বেচারা, বড্ড বিমর্ষ লাগছে তোমাকে আজ। দাও, তোমার হাতখানা আমাকে দাও, আমি তোমার নাড়ী দেখব। এই বলে রসেটি টেনে নিল আলব্যয়েরর হাত এবং নাড়ী দেখতে শুরু করল। রসেটির চোখে মুখে ফুটে উঠল কৌতুক মেশানো গাম্ভীর্য। কিছুক্ষণ বাদেই আবার বলল, 'না, কিছু হয়নি। সামান্যতম জ্বরও হয়নি। তাহলে আজ সকালটা ভাল যাবে বলতে হয়। এসো, এসো আলব্যয়র আর ফিরিয়ে দাও আমার আয়না, দেখবো সত্যিই তুমি ঠিক আছো কিনা।'

আলব্যয়র ততক্ষণে ড্রেসিং টেবিল থেকে ছোট্ট আয়নাটা তুলে নিয়ে বিছানায় রেখে দিল। 'রসেটি বলল, সত্যিই তোমার কিছু হয়নি। কবি, ওগো কবি মশাই, আমার চোখ নিয়ে তুমি একটা সনেট লিখতে পারো না?

'আমি জানি ইচ্ছে করলে তুমি তা পারো। অথচ কি হতভাগী আমি! তোমার মত কবি আর আমার এমন চোখ থাকতেও কিনা সনেট লেখা হবে না! এর চেয়ে যদি অন্ধ হতাম এবং আমার প্রেমিককে বইবার যদি কোন লোক থাকতো তাহলে অনেক ভাল হত। মশাই তুমি আমাকে ভালও বাসো না এমন কি একটা সনেটও নিবেদন করলে না। এবং তুমি আমার মুখ নিয়ে কি ভাবছ বলতো? তা সত্ত্বেও এই মুখ দিয়েই আমি তোমাকে চুমু খাই; বারবার চুমু খাই, সত্যিই এ মুখই তোমাকে চুমু খাবার যোগ্য (তবে আজকের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয় কেননা আজ তুমি তার চেয়েও যে দামী) না প্রসঙ্গটা এখন বদলানো দরকার, এই ভোরে তোমাকে যত বেশী সুন্দর আর ঝকঝকে লাগছে তা সত্যিই অতুলনীয়। যদিও দিনের আলো এসে পড়েছে তবু তোমাকে অরোরা ভ্রাতৃদ্বয়ের একজন বলেই মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন তুমি বলনাচে যাবার জন্যেই তৈরী হয়ে এসেছ। তুমি কি আমাকে জয় করতে চাও? কি আশ্চর্য! এ তো কোন ইতিহাসের প্রাচীন যুগে ফিরে যাওয়া নয় অথচ সেটাই আমি বারবার ভুলে যাচ্ছি।'

'রসেটি ফাজলামি করো না। তুমি খুব ভাল করেই জানো আমি তোমায় ভালবাসি।

'হ্যাঁ সেটা নির্ভর করে অনেক কিছুর ওপর। তাছাড়া যা বললে তাতে খুব ভরসা পাই না। তুমিও কি নিষ্ঠুর?'

'ঠিকই বলেছ। যদি তুমি আমার আমার দরজা বন্ধ করে দাও তাহলেও আমি প্রমাণ করবার চেষ্টা করব, যে তুমি আমার কতখানি জায়গা জুড়ে আছ; তোমার প্রশংসা, স্তুতিতেই কাটবে আমার দিন, আমার সাজসজ্জায়, চালচলনে সেটাই আমি প্রমাণ করেই ছাড়ব।'

'না, যতক্ষণ না আমি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারি, বিশ্বাস করতে পারি তোমাকে, অন্তত ততক্ষণ পর্যন্ত আমার দরজা তোমার জন্যে খোলাই থাকবে। জানো, আমি লুকোতে পারি না আমার আপন সৌন্দর্য, সূর্যের আলো আসে সারা পৃথিবীকে আলোকিত করতে আর আজ আমি হলাম সেই সূর্য, যদি তুমি আনন্দ পাও তাহলে সূর্যের জায়গায় আমাকে, আমার রূপকে বসাতে পারো।'

'বাস্তবে কিন্তু আমি খুশি নই, যদিও খুশি খুশি ভাব দেখাতে হচ্ছে। রসেটি, আমি তোমার কেনা গোলাম, আমার সমস্ত ইচ্ছাই তোমার পায়ে সঁপে দিচ্ছি।'

'এতে খুব বেশী কাজ হবে না, তোমার সেই মনটাকে তো আর বদলাতে পারবে না।'

যখন এরকম কথাবার্তা, মান-অভিমানের পালা চলছিল সে সময়ে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল এক নিগ্রো। মস্ত বড় মাথা নিয়ে থলথলে চর্বিতে ফোলা-ফোলা মুখে হাসতে হাসতে সে বলল, 'শেভালিয়র তেওদোর দ্য সেরানস্‌ এসেছেন, আপনাকে অভিবাদন জানাতে বললেন আর চাইছেন ঘরে ঢোকার অনুমতি।'

বিছানার চাদরটা একটু তুলে চিবুকে ঠেকাল রসেটি, বলল, 'আসতে বল।'

ঘরে ঢুকেই তেওদোর রসেটির শয্যার দিকে তাকাল, তারপর ঘাড়টা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে জানাল অভিবাদন। এ-অভিবাদনে যেন ঝরে পড়ল গভীর মমতা অথচ সম্ভ্রম। অবশেষে ফিরে তাকাল আলব্যয়রের দিকে। তাকেও নমস্কার জানাল যথোচিত ভদ্রতায়। তেওদোর সংকোচ ভরে বলল, 'আপনারা কোথায় ছিলেন? আমি হয়তো আপনাদের আকর্ষণীয় আলাপচারিতায় বিঘ্ন ঘটালাম, সে জন্যে দুঃখিত। তবে আপনারা আবার আপনাদের কথাবার্তা শুরু করতে পারেন, এক্ষুণি আমি চলে যাচ্ছি।'

'না, না, না।' একটু বিদ্বেষ-মেশানো হাসি হাসতে হাসতে রসেটি উত্তর দিল 'আমরা বিজনেসের কথা বলছিলাম।'

তেওদোর বসল রসেটির বিছানার পায়ের দিকটায়। আলব্যয়র আগে এসেছিল বলে স্বাভাবিক ভাবেই সে বসেছিল মাথার কাছে। সাধারণ ভাবেই আবার কথাবার্তা শুরু হল, এ-কথা সে-কথা নানান কথা এসে পড়ল সেইসব আলোচনায়। কখনো মজা, কখনো চমকে ঠাসা সেইসব আলাপ-সংলাপ বিস্তারিত বলার এখানে কোন মানে হয় না। তা ছাড়া সে সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলতে গেলে যেমন অনেকটা সময় লাগবে তেমনি অনেকটা জায়গাও নেবে। উপরন্তু ওদের কথাবার্তার সুর, ঠমক-গমক সব ঠিক-ঠিক বলাও একটা ঝামেলা বিশেষ। কেমন করে ফোটাব শ্যাম্পেনের সোনালি বুদবুদ? না, সব হুবহু তুলে ধরা সম্ভব নয়। বরং পাঠকের কল্পনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি এ-জায়গাটা। পাঠক, কল্পনায় ভরিয়ে তুলুন অন্তত পাঁচ-ছ'পৃষ্ঠা জুড়ে সেই আলাপচারিতার দৃশ্য। তাদের খেয়ালি, হেঁয়ালি, সূক্ষ্ম-অসূক্ষ্ম কথা বার্তা আপনারা মনে মনে কল্পনা করে নিন, নইলে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। কিন্তু সেটা চাই না। সুতরাং তাদের আলাপচারিতার ঝিকিমিকি, মীড়-মূর্চ্ছনায় ভরাট করে নিন এই না-বলা জায়গার ফাঁকফোকর।

আমরা আগেই বলেছি এখানে আমরা রূপায়ণ দক্ষতায় এমন চাতুরী দেখব যা আমাদের মনে পড়িয়ে দেবে টিমেনথেসকে, মনে জাগবে অ্যাগামেনন-এর কথা।

এখন যদি আমরা জানতে চাই, অনুসন্ধানে রত হই, কেন আলব্যয়র কাকভোরে ঘুম ভেঙে উঠল, কিসের তাড়নায় ছুটে এল রসেটির কাছে, সে যদি তাকে ভালই বাসবে তাহলে কেনই বা এমন উদভ্রান্ত হল সে; তবে নিশ্চয়ই ভুল হবে না। আপাততভাবে মনে হবে, ভেতরে ভেতরে বোধহয় ঈর্ষায় বিদ্ধ হচ্ছিল আলব্যয়র। একথা ঠিক যে সে রসেটির প্রচণ্ডতম অনুরক্ত ছিল না, এবং সে চেয়েওছিল ওর থেকে দূরে সরে যেতে, কিন্তু তার ইচ্ছা ছিল রসেটির কাছ থেকে সরে যাবে সে নিজেই অথচ দেখা গেল রসেটিই সরে গেল তার কাছ থেকে। আসলে প্রেম যতই মৃত হোক এতে পুরুষের প্রবল অহমিকাই আহত হল, তার সযত্নলালিত গর্বই ধুলোয় লুটালো। অন্যদিকে তেওদোর মেয়েদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিত তাদের ইচ্ছায়, সে চাইত সব মেয়েরই চোখ তাকে দেখুক, ফলে কোন মহিলাই তার ওপর পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারত না। সে ছিল এমন ধরনের পুরুষ যাকে দেখলেই মুগ্ধ হতে হয়, তার স্বভাবে ছিল আশ্চর্য বিনয় অথচ মাদকতা, ফলে কেউই তার অনিবার্য প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। রসেটির কাছে আলব্যয়র এসেছিল যদি দেখা পায় তাহলে তেওদোরের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলবে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, আলব্যয়রের ভেতর ফুঁসে উঠল না ক্রোধ, রাগে রি রি করল না দেহ। আধ-ঘণ্টা কেটে যাবার পর ওদের দুজনকে দেখলে আপনাদের মনে হতে পারে তারা একই স্কুলের দুই পুরনো অন্তরঙ্গ বন্ধু। ওপর ওপর তাকে সহজভাবে নিলেও ভেতরে ভেতরে আলব্যয়র হয়তো ঈর্ষাকাতর হচ্ছিল, কিন্তু কিছু বলবার জো নেই। রসেটিকে এই ভোরেও মনে হচ্ছিল প্রজাপতির মত সুন্দর, রঙীন, জ্যোৎস্নার মত স্বপ্নালু। ওর চোখে কত কবিতার ছন্দ; কত গানের সুর। ওর অঙ্গে অঙ্গে নৃত্যনাট্যের অনুপম ভঙ্গিমা। আলব্যয়রের ভেতর ভেতর অস্বস্তির ভাব দেখা যেতে শুরু করল, অসুখী না হয়েও সে নিজেকে অসুখী ভাবল।

কিছুক্ষণ আগেই বিছানায় উঠে বসেছিল রসেটি। আলব্যয়র চেয়েও তেওদোরের দিকে বেশী নজর দিচ্ছিল। তার কথা শুনছিল বিশেষ মনোযোগ দিয়ে, যেন কোন প্রেমিকা শুনছে তার প্রেমিকের কথা। কিন্তু ওদের কথাবার্তা ছিল বিচিত্র, মজাদারও বটে। এমন কিছু তাতে ছিল না যাতে আলব্যয়র মনে করতে পারে রসেটি ওকে উপেক্ষা করছে। ফলে আলব্যয়র কিছু বলতেও পারছে না, করতেও পারছে না। তেওদোরের গলায় এমন কোন রঙ ছিল না যাতে অন্যকিছু কল্পনা করতে পারে আলব্যয়র। সে ছিল বিনয়ী, ভদ্র। রসেটির সঙ্গে তার কথাবার্তা চলছিল বন্ধুর মতই, তাতে ভিন্নতর ভাবনার কোন সুযোগ ছিল না।

রসেটিই এক সময় বলল, তেওদোর, আজ আমরা কি করব? আজ কি নৌবিহার করবে? সেটা কি তোমার খুৎসই লাগবে? তাহলে শিকারে বেরোবে?

'শিকারেই চলো বরং। কেননা জলের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে সেই একঘেয়ে হাঁস

আর ডাইনে-বাঁয়ে পদ্মপাতা দেখতে দেখতে যাওয়া অনেক বেশী খারাপ লাগে, বড়ো বিষাদ-বিষাদ মনে হয়। আপনিও কি তা মনে করেন না আলব্যয়র ?'

'আমার অবশ্য শিকারের পেছনে ছোটার চেয়ে জলের স্রোতের ওপর দিয়ে তর তর করে যেতে বেশী ভাল লাগে। তবে যেখানেই যেতে চান চলুন, আমার অসুবিধে নেই, আমি যাব। তবে প্রশ্ন হল মাদাম রসোঁটকে নিয়ে, তিনি কখন বিছানা ছেড়ে উঠবেন আর কখন যে সাজসজ্জা করে বেরোবেন তা তো জানি না।'

রসেঁটি একটু নড়ে চড়ে বসল, বেল টিপল, পরিচারিকাকে আসতে আহ্বান করল ও তাকে সাজিয়ে দিতে বলল। অন্যদিক যুবক দুটি হাত ধরাধরি করে ঘর ছেড়ে দিল। ভাবতেও অবাক লাগে এই দুজনের একজন হল এই রমণীর প্রেমিক আর একজন হল অন্তরতম হৃদয় সুইটহার্ট'।

সকলেই তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিল। আলব্যয়র আর তেওদোর বাইরে বেরোল এইমাত্র। যে যার ঘোড়ায় চেপে বসল। পিছু পিছু রসেঁটিও বেরোল। তার ঘোড়াও তৈরী হয়ে রয়েছে। সুন্দরী তম্বী রসেঁটি আভ্যেসমাফিক লাফিয়ে উঠে বসল তার ঘোড়ায়। দুলকি চালে হাঁটতে শুরু করল ঘোড়ারা। রসেঁটি তীরের মত চাবুক মারল তার ঘোড়াটিকে, সে জোরে ছুটতে লাগল, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগোল আলব্যয়রেরটিও। এক সময় ঘোড়াদুটি পাশাপাশি হতেই গতি তাদের মন্থর করা হল। আর তেওদোরের ঘোড়া পড়ে রইল অনেক পেছনে। সে চেয়েওছিল এই। রসেঁটি আর আলব্যয়রকে আলাদা কথা বলার সুযোগ দিতে চেয়েছিল তেওদোর। ইচ্ছাকৃত-ভাবেই তাই পিছিয়ে রইল সে। যদিও জানত ইচ্ছা করলেই হাওয়ার বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের ধরে ফেলতে পারবে।

হঠাৎ একটা বাঁকের মুখে এসে রসেঁটি পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল তেওদোর অনেক দূরে পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে উঠল, 'তেওদোর, তেওদোর! তাড়াতাড়ি এসো। তুমি কি কাঠের ঘোড়ায় চড়েছ ?'

ডাক শুনেই চনমনিয়ে উঠল তেওদোর। জোরসে ঘোড়া ছোটাল। মুহূর্তের মধ্যেই ব্যবধান কমে এলো, কিন্তু রসেঁটিকে ছাড়িয়ে এগিয়ে এলো না বরং সামান্য ব্যবধান রাখল।

অনেকটা দূর তারা এগিয়ে এসেছে। হাওয়ায় উড়েছে ধুলো, রাস্তার প্রায় শেষ সীমায় এসে পেঁছুল তারা। ধুলোর মেঘ এসে ভিড় করল তেওদোরের পাশে।

রসেঁটি আবার বলে উঠল, 'তেওদোর, একদম পাশে চলে এসো। তোমার কচ্ছপটাকে একটু তাড়া লাগাও, কাছাকাছি চলে এসো।'

তেওদোর তার ঘোড়ার মাথায় ঝুঁকে পড়তেই ঘোড়াটা জোরে ছুটল, রসেঁটি আর আলব্যয়রকে পেছনে ফেলে দিল কয়েক সেকেণ্ডেই।

চার ফুট উঁচু একটা বাধা পেরোতেই তেওদোর বলে উঠল, 'আমাকে যে ভালবাসে সে নিশ্চয়ই আমাকে অনুসরণ করবে।' পেরিয়েই ঘোড়াটাকে থামাল এবং সে নেমে পড়ল। তারপর বলল 'আঃ। কবিমশাই আপনি কি লাফাতে পারেন না ? অথচ

শুনেছি আপনার ঘোড়া নাকি পক্ষীরাজ !'
মৃদু হাসতে হাসতে আলবায়র বলল, 'আমি বরং ঘুরে ফিরে একটু দেখি।'
তেওদোর বলল, 'কেউই আমাকে ভালবাসে না যেন না কেউই আমায় অনুসরণ করল না।' ঘোড়াটা একবার সামনের দিকে বিরাট এক লাফ দিল।
সে বলল, 'না, কেউ না কেউ আমায় ভালবাসে।'
রসেটি ওর দিকে শিশুর মত তাকাল। চোখ তার জ্বলজ্বলে, মুখে তার গোলাপের রং। সে তার ঘোটকীকে চাবকাল, মুহূর্তেই কাঠের বাধাটা পেরিয়ে গেল রসেটি। সে বলল, 'তেওদোর, এখনো কি তুমি মনে কর, কেউ তোমাকে ভালবাসে না ?'
রসেটির চোখের পাতায় কিসের আভাস দেখা গেল। এমনভাবে তাকাল যা অর্থময়, ইঙ্গিতবহ। কাছে আসার ডাক পাঠাল তেওদোরকে। কাছে এলো সে।
আলবায়র দূরে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে এসবের কিছু দেখতে পেল না। স্মরণীয় মুহূর্তে সব বাবা, স্বামী আর প্রেমিকেরাই অন্ধ হয়ে যায়, অন্ধ হবার সুযোগ নেয়।
তেওদোর বলল, 'ইসনাবেল, রসেটিরই মত তুমি বোকা। ইসনাবেল, লাফ দিয়ে যেমন তুমি অনেকটা জায়গা করে নিতে পারলে না, তেমনি রসেটি তুমিও ধরতে পারলে না তোমার প্রিয়জনকে, নিজেকেই নিজে তুমি হত্যা করছ।'
'ব্যাপারটা কি ?' খুবই মনমরা ও বিষণ্ণ স্বরে রসেটি উত্তর দিল, যেন বাধা পেরোনোর জন্য ইসনাবেল তাকে ক্ষমা করে।
তারা আবার এগোতে শুরু করল। বন ধীরে ধীরে ঘন হচ্ছে। লম্বা লম্বা গাছের মাথাগুলি আকাশ ছুঁই ছুঁই। ভেসে যাচ্ছে মেঘ, মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ঝিলিক দিচ্ছে আলো, নেচে যাচ্ছে বাতাস। কোথাও কোথাও ঘন ঝোপ, মোটা মোটা ঘাষের চাঙড়, লুকোচুরি খেলার উপযুক্ত জায়গা। কোন্ অনাদিকালের বুক চিরে তৈরী হয়েছে এই অরণ্য, একশো বছরেরও পুরোনো ওক গাছেরা ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কত বাপ-ঠাকুর্দা নাতি-নাতনির স্মৃতি নিয়ে।' আপনা-আপনিই যেন গড়ে উঠেছে জঙ্গল, কারো সযত্ন করস্পর্শ পড়েনি গাছের পাতায়, কেউ ঢালেনি গোড়ায় জল। যুগ যুগ ধরেই বেড়ে উঠছে এই আদিম উদ্যান, জন্ম-মৃত্যু-জন্মের বৃত্ত পরিক্রমায় এর ক্লান্তি নেই। ক্লান্তি নেই। একটা ঝর্ণাও শোভা পাচ্ছে, চারদিকে তার শতশতাব্দীর জীর্ণ লতাগুল্ম বুনো কাঁটা গাছ। এলোমেলো ঘুরছে ফিরছে কত বন্য কুকুর, ফুটে রয়েছে কত বিচিত্র ফুল। ছোট বড় মাঝারি নানান মাপের ফুল, হলদে সাদা, কালো, লাল, গোলাপী রং বিচিত্র বাহার। কোনটার গায়ে কত রঙের বিপুল আলপনা, হলদে সাদায় ছোপ ছোপ ফুল, লালচে কালোর ওপর সাদার নকসা। এত বিচিত্র ফুল, বিচিত্রতর গাছ যে চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। আর এখানেও আসে নানা জন, পিকনিক করে কত লোক, নানান পাখী এসে কিচির মিচির করে, কাঠবেড়ালির দাপাদাপি শুরু হয়। অন্ধকারের বুক ফুঁড়ে জেগে রয়েছে এক অরণ্য।

এ অরণ্যও কথা বলে, গান গায়। এর শিরায় শিরায় জমা হয়ে আছে কত হৃদয়ের গোপন কথাকলি, কত অশ্রু, আবেগ ভালবাসা। কত অভিমানের, হতাশার সাক্ষী হয়ে যে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সে সব কাহিনী বলে শেষ করা যাবে না।

এদের মধ্যে তেওদোরই সবচেয়ে দক্ষ অশ্বারোহী, ঘোড়া তার কলের পুতুল। যেমন খুশী তেমন ছোটায় ঘোড়া, যেমন ইচ্ছে তেমনি ওঠে ঘোড়ায়। আলবায়র এখন খুবই কাছাকাছি এদের। রসেটি আর উর্দি'পরা বালক ভৃত্য ইসনাবেলও অনুসরণ করছে কুশলী তেওদোরকে।

কিন্তু মাঝে মাঝেই তাদের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছিল, মাঝে মাঝেই এমন হচ্ছিল যেন হারানো জমি আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

'কিছু সময়ের জন্য থামলে হয়, ঘোড়াদের একটু দম ফেলতে দেওয়া দরকার।'

ইসনাবেল তা' টাট্টুঘোড়াটার লাগাম টেনে ধরল। ঘোড়া মাথাটা নিচু করে বালিতে ঘষতে শুরু করল ক্ষুর।

টাট্টু ঘোড়াটা দেখতে একেবারে রসেটির ঘোটকীর বিপরীত। ঘোড়াটার চুল যেখানে রাতের মত কালো সেখানে ঘোটকীর রেশমী-সাদা। একটা যেমন সাদাসিধে, অন্যটি তেমনি জমকালো, একটিকে দেখতে ইউনিকর্ণের মতো, অন্যটি হল অনেকট দীর্ঘ লোম-অলা, রেশমী-সাদা রঙের কুকুর বা পুড্‌ল্।

এদের মতই একেবারে বিপরীত ধর্মী হল এদের আরোহীরা। রসেটির চুল যেখানে ঘন কালো বিদিশার নিশা, সেখানে ইসনাবেলের কেশগুচ্ছ তুষার সাদা, একজনের অঙ্গ থেকে যেমন ঠিকরে পড়ে হীরের দ্যুতি, দুপুর বেলার ঝলমলে আলো, তেমনি আরেক জনের শরীরে খেলে বেড়ায় ঊষার আলোছায়া।

'এখন কি আমরা শিকারের চেষ্টা করব?' রসেটিকে ইসনাবেল শুধোল, 'ঘোড়াগুলো চনমনে হয়ে উঠেছে।'

'তাহলে চলো', সুন্দরী বলল। ঘোড়ায় চেপে আবার শুরু করল তাদের যাত্রা। একটা সরু পথ ধরে তারা এগোল লেকের দিকে। ঘোড়াদুটো পাশাপাশি হাঁটতে লাগল পথ জুড়ে।

ইসনাবেলের দিকটায় একটা বড় ডাল এত নিচের দিকে ঝুলে পড়েছিল যেন মনে হবে কাছে গেলেই ওকে জড়িয়ে ধরবে। বালকটি তা বোধহয় দেখতে পায়নি, রসেটি চিৎকার করে উঠল। 'সাবধান। দেখে যাও।' কিন্তু হুঁশিয়ারী জানানোর আগেই যা ঘটবার ঘটে গেল, ডালের ধাক্কা সামলাতে পারল না, টাট্টুটাও থামেনি, ফলে মাটিতে পড়ে গেল সে।

ব্যথাটা বেশ জোরেই লেগেছে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল বালকটি। রসেটিও ভীত বিচলিত। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল, ছুটে গেল তার দিকে, কিন্তু প্রাণের কোন লক্ষণ দেখল না।

ইসনাবেলের মাথা থেকে টুপি খসে গিয়েছিল, সুন্দর চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে বালিতে। তার ছোট ছোট হাত মোমের মত শাদা আর বিবর্ণ মনে হল। রসেটি

হাঁটু মুড়ে তার পাশে বসল, তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করল। তার কাছে না ছিল ফ্লাস্ক না ছিল স্মেলিং সল্ট, খুবই বিব্রত বোধ করল নিজেকে। শেষ পর্যন্ত একটা গর্ত দেখতে পেল, তাতে জমেছিল বৃষ্টির জল। রসেটি সেই গর্তে আঙুল ডুবিয়ে কয়েক ফোঁটা জল এনে লাগালো বালকটির কপালের দুধারের রগে। জল গড়িয়ে পড়ে গেল, যেমন করে পদ্মপাতা থেকে ঝরে পড়ে শিশিরের কণা। রসেটি বুঝতে পারল ওর গায়ের জার্সিটা এমন আঁটো করে বাঁধা যে তার দম বন্ধ হয়ে যাবে; অথচ ওর এখন হাওয়া দরকার। রসেটি দেখল ওর সুন্দর গলা, যা এখনো তত মজবুত হয়নি, অথচ যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ভবিষ্যতে ওর সুন্দর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। হ্যাঁ, একদিন না একদিন এই ছেলেটিই হয়ে উঠবে কন্দর্পকান্তি, হয়ে উঠবে মোহময়, দেখলেই চুমু খেতে সাধ যাবে।

চমকে উঠে সে বলল 'মহিলা, একজন মহিলা! আহ্ তেওদোর!'

আমরা আপাতত তাকে ইসনাবেল বলেই ডাকব; যদিও সে তা নয়। সে চোখের পাতা মেলল, ধীরে ধীরে সে সুস্থ হয়ে উঠল। না, আদপেই সে আহত হয় নি; গোটা ব্যাপারটাই চমক। সে উঠে বসল, রসেটির সাহায্যে চড়ে বসল তার টাট্টুর পিঠে। আবার চলতে শুরু করল ওরা।

লেকের ধারে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল ওরা। সমস্ত ধকল ঝেড়ে ফেলে শান্তি পেতে চাইল। রসেটি একসময় গোটা ব্যাপারটাই তেওদোরকে সংক্ষেপে জানাল। আর গল্প বলবার সময়ে রসেটি লক্ষ্য করছিল তার মুখের রং ঘন ঘন বদলাচ্ছিল। এর পর সারা দিনই সে ইসনাবেলের পাশেই ঘোড়ায় চড়েছিল।

একসময় আবার সবাই ফিরে এল আস্তানায়। যে আনন্দের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল আজকের দিন তা শেষ হল বিষণ্ণতার আমেজে।

রসেটির ভিতর ছিল স্বপ্নের আবেশ, সেও ছিল স্বপ্নালু। আর তার এই স্বপ্নমদিরতা আলব্যয়র এর চোখ এড়ায় নি, তার মধ্যেও দেখা যাচ্ছিল তার প্রতিচ্ছায়া। পাঠক! শিগগিরই জানতে পারবেন এর কারণ।

আড়াল থেকে

না। প্রিয় সিলভিও, তোমায় আমি ভুলিনি। না, আমি সেরকম লোকই নই যে ক্ষণিকের জন্যেও পেছন ফিরে তাকায় না। আমি বিশ্বাস করি, বলি, হে অতীত তুমি ভুবনে ভুবনে কাজ করে যাও গোপনে গোপনে। হ্যাঁ, আমার অতীত আমাকে অনুসরণ করে, বর্তমানকে সমৃদ্ধ করে, ভবিষ্যতের পথ দেখায়। আর তুমি? বিশ্বাস করো, তোমার বন্ধুত্ব আমার কাছে এতই রোদে ঝলমল যে তাতে আমার ফেলে আসা দিনগুলোর দিগন্ত স্বচ্ছ-নীল হয়েই বিরাজ করে। সত্যি কথা বলতে কি আমি মাঝে মাঝেই পেছন ফিরে তাকাই, আবেগ ঠেলে আসে বুকে, কখনো কখনো বিষাদে ভরে যায় মন। স্মৃতি বড়ো উজ্জ্বল, বড়ো বিষাদময়।

ওহ্। কি সুন্দর যে সময় ছিল। কি স্বর্গীয় সুষমা ছিল তখন। আমরা যেন ছিলাম স্বর্গের বাসিন্দা। বলতে গেলে মাটিতে পড়ত না আমাদের পা তেমন, কাঁধের ওপর ছিল বিশাল ডানা, সে ডানায় উড়ে যেত আমাদের রঙিন ইচ্ছার। সব, বাতাসে ছিল বসন্তের সৌরভ, যৌবনের সোনালি নেশায় ছিলাম বুঁদ, আমাদের তূণীরে ছিল পঞ্চশর।

তোমার কি মনে পড়ে এখন সেই ছোট্ট দ্বীপটিকে, যেখানে মাথা তুলে শোভা পেত সার সার পপলার, যে দ্বীপটির দুপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে চঞ্চলা নদী? যেখানে পেঁছতে গেলে আমাদের কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হত, পায়ের চাপে মাঝখানটা আবার বেঁকে যেত ধনুর মত, সেখান দিয়ে ছাগলও আসত দ্বীপে। ছোট্ট এই দ্বীপটা ছিল ঘাসের গালিচায় মোড়া, চারদিকে সবুজের সমারোহ, মাঝখান দিয়ে বুকচেরা হলদে পথ, পাখীর সুরে বাতাস ম'ম, সে এক স্বর্গের উদ্যান। সেখানে সেই এক মহিলাকে দেখেছিলাম রেশমী-শাদায় ঢাকা, একটা ছোট্ট মেয়েকে দেখেছিলাম যার গা রোদে পুড়ে পুড়ে হয়ে গিয়েছিল কিছুটা তামাটে অথচ বড় টানা টানা দুচোখে ছিল অসম্ভব উজ্জ্বলতা, মেয়েটি ছাগলের পিছু ধাওয়া করত, তাদের সঙ্গে

হুটোহুটি করত—সে সব কি মনে পড়ে তোমার ? তোমার কি মনে পড়ে মাঝরাস্তার সেই দৃশ্য; মনে পড়ে কি বাতাসে ডানা মেলে হলদে প্রজাপতিদের এলোমেলো সাঁতার কাটার ছবি ? কী অপূর্ব মায়াময় ছিল নদীর স্রোত, ঢেউয়ের চূড়োয় চূড়োয় রুপোর ঝিকিমিকি আর সেই নদীর তীরে বসে পায়ের আঙুলের ডগা দিয়ে জল-ছোঁয়া। মাথার ওপর এক ঝাঁক পায়রার স্বচ্ছ চোখের মত নীল আকাশ, সেই আকাশের হৃদয় থেকে মায়াবী রঙ ঠিকরে পড়ছে জলে। জলে তখন মাদকতা। কত বিচিত্র ভঙ্গিমায় উল্লসিত ছিল নৃত্যপরা নদী; কত রঙের বাহার তার, কখনো শাদার ছড়াছড়ি, কখনো সবুজ আর নীলের মায়া। দল বেঁধে হাঁসের চলাফেরা দেখতাম কত মুগ্ধ নয়নে, সে সব কি মনে পড়ে সিলভো ?

অমন মায়াবী ল্যাণ্ডস্কেপে আমরা কি সুন্দরই না মানানসই হয়ে উঠেছিলাম। অমন নিরিবিলি নির্জনতায়, প্রকৃতির মোহিনী মায়ায় আত্মারা কত নিপুণভাবেই না একাত্ম হয়ে উঠেছিলাম ! আমাদের মধ্যে জমে উঠেছিল নিবিড় আত্মীয়তা, প্রকৃতি তার রূপের পসরা সাজিয়ে, সুরের জাল বুনে, রঙের বাহার দেখিয়ে আমাদের করে দিত বিস্মিত। ভাবতাম, শুধু অবাক হয়ে ভাবতাম, কি ঐশ্বরিক ক্ষমতাই না প্রকৃতির পক্ষপুটে ! বসন্তকাল না হলেও সব সময়েই এখানের কাল মধুমাস, চির যৌবন বর্তমান, ঘাসের ডগায় ডগায় রোদের চিরমধুর চুম্বন। যেদিকে তাকানো যায় আনন্দ আর আনন্দ। যেদিকেই চোখ মেলা যায় শুধু খুশি, শুধু উচ্ছলতা। খুশির বন্যায় ফুটেছে ফুল, পাপড়িতে হাসির জ্যোৎস্না, ঝোপে ঝাড়ে গাঢ় সবুজের হাতছানি। মাঝে মাঝে যখন তুষার ঝরে তখন এই ঝোপই মেলে ধরে তুহিন-ছত্র। আমাদের হৃদয়ে তখন কবিতা, স্ফুটোন্মুখ গোলাপের অধীরতা, গাছের পাতার আড়াল থেকে পাখীদের গান। আমরা হাঁটতাম, সঙ্গে সঙ্গে হাঁটত কত স্বপ্ন, কত আবেগ, কত অনুভূতি। কখনো ঝরে পড়ত ফুল, মনে মনে বলতাম, সকালের পুষ্প ঝরে বনতলে বিষণ্ন সন্ধ্যায়। চোখের কোণে টলটল করত মুক্তোর মত জলের ফোঁটা, বুকের ভিতর বেজে যেত কোন্ অজানা বেহালার করুণ রাগিনী, ঝরে পড়ত ভালবাসার দীর্ঘশ্বাস। কখনো কখনো খসে পড়ত পাতা; আর তার সঙ্গে মনে এসে ভিড় করত কত স্মৃতি; ছায়া-ছায়া কত ব্যথা। ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হয়ত বলতাম, আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে, অনাদিকালের হৃদয় উৎস হতে। হাঁটতে হাঁটতে আমরা এগোতাম তীরের দিকে; বসতাম মুখোমুখি, কখনো পাশাপাশি। আঙ্গুল দিয়ে ছিঁড়তাম ঘাসের ডগা, কখনো আবার তা ছিঁড়তাম দাঁত দিয়ে। অনেকটা সময় কাটত নীরবতায়, কারো মুখে হয়তো কথা নেই; হয়তো তখন আমাদের এক পা মাটির উপর, আর এক পা ছুঁয়ে যাচ্ছে আপন মনে নদীর জল।

হায়; এ সুখ বেশী সইল না। মানুষ যখনি জ্ঞানের রাজ্যে ঢুকে পড়ে তখন থেকেই আস্তে আস্তে বিদায় নেয় ভিতরকার ছেলেমানুষী ভাব। বীজাণুর মতো নানান আজে-বাজে চিন্তা ছড়িয়ে পড়ে মনে; গ্যাংগ্রীনের মতো দুর্নীতি গ্রাস করে পবিত্র

শরীরটা। আর এখন শুধু ভাবি আমি হারিয়েছি সেই সুখের দিন। একমাত্র যে ভাল জিনিস আমাকে ছেড়ে চলে গেছে তা হল তোমার বন্ধুত্ব।
না, তোমার কাছে আমি কিছু লুকোব না। আমার চিন্তা-ভাবনা, কার্যকলাপ সব কিছুই তোমাকে খোলাখুলি জানাব। আমার মনের অলিগলি, খামখেয়াল বা এলোমেলো চিন্তা, বিচিত্র সব ভাবনা-ইচ্ছা-অনিচ্ছা-কামনা-বাসনা সব কিছুই তোমাকে জানাতে চাই। কিন্তু সব সময়ে নিজেকেও নিজে ধরতে পারিনে। যা ভাবি বা যা বলতে চাই তা-তো বলা হয়ে ওঠে না। একবার বোধ হয় তোমাকে বলেছিলাম যে নিজেকেই আমি অনেক সময় ভয় পাই, যে সুন্দরীর খোঁজে আমার অভিযাত্রা তা শেষ পর্যন্ত অসম্ভবই থেকে যাবে বা সেই অনুসন্ধান নিয়ে আসবে ঘোর বিপর্যয়, তা আসুরিক। হ্যাঁ, আমি সেই বিপর্যয়ের মুখে এসে পড়েছি। চারদিক থেকে নানান স্রোতের টান, সেই টানে আমি নাজেহাল। জানি না কোনদিন সেই স্রোতের ওপর দিয়ে সেতু বানাতে পারব কিনা, অথবা শুধু ঢেউয়ে ঢেউয়ে আমি ভেসেই যাবো? কখনো কি পোতাশ্রয় খুঁজে পাব না? কখনো কি নোঙর ফেলতে পারব না? আমি কি শুধু জলে ভিস্তিই?
হে পৃথিবী, তুমি কেন তোমাকে এরকম ঘৃণা করতে শেখালে? কেন তোমার সঙ্গে আমার এত বৈরিতা? তোমার কাছে এমন কি চেয়ে আমি প্রতারিত হয়েছি, আর তার ফলে তোমাকে ঘৃণা করি? এমন কি আশা দিয়ে আমাকে হতাশ্বাস করলে? কেন আমি ঈগলের ডানায় বন্দী? এমন কোন দরজা আমার জন্যে খোলা রেখেছিলে যা এখনও বন্ধ হয়ে রইল? বা আমরা কেউ-ই কারো নির্দিষ্ট দরজা খুঁজে পেলাম না কেন?
না, এখন আর কিছুই তেমন আমাকে ভাবায় না, বিচলিত করে না। কোন কিছুই ছুঁয়ে যায় না আমার হৃদয় বা কোন বীরত্বের গোল গোল গল্প শুনতে আর আমার মন টানে না। সব কিছুই এখন আমার কাছে ভোঁতা, বোকা-বোকা। কারো কোন সুর, কোন কথা, কোন তাল-মাত্রা-ঝোঁক আমাকে বিচলিত করে না, আমার মনে স্পন্দন তোলে না। আমি দেখি, যে-অনুভূতি আমার সঙ্গীর চোখে জল এনে দেয়, বৃষ্টির ফোঁটায় আমি সেই একই অনুভূতি লক্ষ্য করি। আর তখনই আমি সেই জল দেখতে রাজি হই যখন ছবির মত কোন সুন্দরীর চোখ দিয়ে সেই জল গড়িয়ে গড়িয়ে চিবুক ছুঁয়ে যায়, আলো-ছায়ার খেলায় অশ্রু হয়ে ওঠে মুক্তোর মত টলটলে। তবু, এদের চেয়ে আমার করুণা করতে ইচ্ছা হয় জন্তুদের। আমি শয়তান নই, তবু যে-চাবুক দিয়ে কোন চাকর বা কৃষককে নির্মমভাবে চাবকাতে পারি তেমনটি পারবো না একটা ঘোড়া বা কুকুরকে। ঘোড়া বা কুকুরের প্রতি আমার করুণা আছে, কিন্তু চাকর বা চাষী? ফোঃ। এই দুনিয়ার কারো কোন ক্ষতি আমি করি নি, করবার বাসনাও নেই। সাধারণভাবেই সব কিছুর ওপর আমার রাগ, ঘৃণা, বিদ্বেষ। সহ্য হয় না অনেক কিছু। এক ধরনের তুষ্ণীভাব ভিতরে ভিতরে কাজ করে যায়। কাউকে ভাল লাগে না, বিশ্বাস করতে পারি না। সব কিছুই হেলাফেলার বস্তু, বিদ্বেষের

হেতু। তবু এদের মধ্যে দু-একটি ব্যাপার আছে যা বিশেষ বিদ্বেষের কারণ বলেই আমার কাছে দামী। অর্থাৎ তাদের প্রতি রয়েছে আমার অন্য ধরনের ঘৃণা। প্রেমের ক্ষেত্রে যেমন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সহজাত, মানুষের প্রতি আমার বিদ্বেষ তেমনি। ভিড়ের মধ্যে না-হারিয়ে এটা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়বহ, এই মানুষের স্বাতন্ত্র্যই জন্ম দেয় আবেগ, চিন্তার, মানুষকে করে তোলে রাগী, সকলের মধ্য থেকে একজনকে আলাদা করে নিলে তাকে ঘিরে দিনের বেলা ঘোরে চিন্তা-ভাবনা আর রাতে আসে স্বপ্ন। ভালবাসাই সকলের মাঝখান থেকে একজনকে আলাদা করে তুলে আনে, উৎকণ্ঠা-উদ্বেগের জন্ম দেয়, কিছুই ভাল লাগে না আবার ভালও লাগে, এক ধরনের অস্থিরতা জন্ম নেয়। কেউ যদি কাউকে ভালবাসে তাহলে সে আর কি চাইতে পারে? শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করতে যতখানি সতর্কতা প্রয়োজন তার চেয়েও কি বেশী সতর্কতা দরকার একজন মিসট্রেসের কাছ থেকে আনন্দ পেতে? আমি তা বিশ্বাস করি না। বরং মনে হয়, কাউকে ভালবাসতে হলে অন্য কাউকে ঘৃণা করতে হয়, ঘৃণা করার দরকার হয়। মহৎ বিদ্বেষ থেকেই জন্ম নেয় মহান প্রেম, প্রেম আর ঘৃণা একে অপরের পরিপূরক। যাকে কোনরকমেই ভালবাসি না, তাকে ঘৃণা করব কেন?

আমার ভালবাসার মতই হল আমার ঘৃণা। হ্যাঁ, ঘৃণা আর ভালবাসা হল আমার রত্নভাণ্ডার। তবে জানিনা তার ওজন কতখানি, জানিনা কাকে কিভাবে ব্যবহার করব। যদি কাউকে বা উভয়কেই ঠিকমতো ব্যবহার করতে না পারি বা না করি তাহলে তো আমি নিছক একটা বোকা হয়ে দাঁড়াব, হয়ে উঠব টাকার থলে বিশেষ। ওহ্! যদি আমি কাউকে ঘৃণা করতে পারতাম তাহলে বেঁচে যেতাম। কিংবা যে নির্বোধটা আমার সঙ্গে বাস করে সে যদি আমাকে অপমান করত তাহলে টগবগ করে ফুটত রক্ত, আমার ভেতর ফুঁসে উঠত রাগ। ফুলের গন্ধ চাই না আমি, চাই রক্তের সৌরভ, চাই ভালবাসা। আহা! তাহলেই সুখী হতাম!

আগেই বলেছি, আমি কিছুই ভালবাসি নে। অথচ এখন ভয় হয় পাছে কাউকে ভালবেসে ফেলি। সেরকম কাউকে ভালবাসার বদলে ঘৃণা করা হাজারগুণে ভাল। দীর্ঘকাল আমি যেরকম স্বপ্ন দেখেছি সেরকম সুন্দরীর দেখা কখনো-সখনো পেয়েছি। আবিষ্কার করে ফেলেছি আমার মানস প্রতিমার শরীর, দেখেছি তাকে, কথা বলেছি আমরা দুজনে, কখনো আবার করেছি করমর্দন। জানতাম, আমাকে কেউ ভুল বুঝবে না, আমার প্রাক্ আবেগকে ক্ষুণ্ণ করবে না। হ্যাঁ, সিলভিও, আমি আমার স্বপ্নের পাশেই বর্তমান, তার ঘর ওখানে আর আমারটা এখানে। আমি এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি ওর জানালার পর্দা, দেখতে পাচ্ছি আলোর শিখা।। এইমাত্র ওর ছায়া পেরিয়ে গেল পর্দা ঃ হয়তো এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের সারতে হবে সাপার।

আমি যা ভালবাসি, যে রূপ আমাকে মুগ্ধ করে নিঃসন্দেহে তা হল পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দর। বলতে পারব না আমি কি চাই, আমি জানি সুন্দরই আমার চির আকাঙ্ক্ষিত। প্রশ্ন করি সে কোথায়? কোনখানে পাবো আমার ঈপ্সিত সৌন্দর্য।

আমার এই বাসনাকে বলতে পারো অনেকটা অন্ধ হয়ে সূর্যের দিকে তাকানো বা সকালের আলো দেখা। ভেতরে ভেতরেই নয়, পুরোপুরিই আমি বিব্রত, বিপর্যস্ত আমি চাই নিপুণা, নিখুঁত সুন্দর ; কিন্তু কোথায় পাবো তারে ? সব সময়েই আমি আমার সমগ্র সত্ত্বা দিয়েই, স্পর্শ করতে চাই সুন্দরীকে, সমস্ত সৌন্দর্যকে। যা কিছু শোভন-সুন্দর তাই আমার বন্দনীয়, চাই তার গান গাইতে, চাই তাকে চিত্রিত করতে, প্রেমে বন্দী করতে। যা কোনদিন কখনো দেখিনি, দেখতে পাই না, তাই আমি ভালবাসতে চাই।

তোমার চিঠি আমাকে খুব দুঃখ দিয়েছে। একথা বলতে বাধ্য হলাম বলে আমাকে মার্জনা করো। চারিদিকে এখন সুখের স্রোত সোহাগের রোশনাই, আর এরই ভিতর দিয়ে তির তির করে বয়ে যায় সময়, কেটে যায় নানান রঙের দিনগুলি রাতগুলি। তোমাকে ঘিরে এখন পরিশুদ্ধ আনন্দ। হ্যাঁ, তোমার সুখের কথা ভাবলেই বুকের ভিতর কেমন অস্থিরতা জাগে। যাক্ দুমাসের মধ্যেই তুমি বিয়ে করতে চলেছ, সরে যাবে সব বাধা, চিরকালের জন্যেই তুমি হয়ে উঠবে আর একজনের অধিকৃত। তোমার বর্তমান সুখ ধীরে ধীরে পল্লবিত হয়ে ভবিষ্যৎকে করে তুলবে আরো মোহনীয়। সুখী তুমি, আরো সুখী হও। সত্যিই তুমি ভাগ্যবান। তোমার প্রেমও মৃত নয়, সে সুন্দর। তার সেই অনুপম রূপ যথার্থই বন্দনীয়, সে রূপ যেমন পার্থিব তেমনি ঐকান্তিক, অতুলনীয়। সেই সৌন্দর্য চির নবীন, চির অম্লান, জ্যোতির্ময়, ভাস্বর। সেই অনুপমা যেন ক্ষমার প্রতীক, সে জানে কেমন করে ভালবাসা পেতে হয়। আসলে প্রেমের সৌরভে সে সুরভিত, প্রেমের কাছে সমর্পিতা প্রাণ।

ওহ্ সিলভিয়ো! সরল শুদ্ধ প্রেমে বন্দী হওয়া হৃদয় কত কম। খাঁটি প্রেম কজনের কপালেই বা জোটে! ম্যাগিওর লেকের ছোট্ট দ্বীপের মতই প্রেমিক হৃদয় বড়ো দুর্লভ।

যদি এ জায়গা থেকে চলে যাবার মত আমার সাহস থাকত, কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলে যদি আমি সরে যেতে পারতাম তাহলে একটা মাস অন্তত পেতাম তোমার সান্নিধ্য। আহ্ আমি যে তোমার সাহচর্যের কাঙাল! হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে তিরিশটা দিন কাটালে আমিও হতে পারতাম পরিশুদ্ধ, তোমার মতই ফুসফুসে ভরে নিতে পারি বিশুদ্ধ বাতাস। তোমার বীথিকা-সরণীর শীতল অমল ছায়া আমার জ্বালা ধরানো ভুরুতে মেলে ধরবে সতেজ রামধনু, ছড়িয়ে পড়বে প্রাণের রঙ, কিন্তু সেই স্বর্গ কোনদিন নেমে আসবে না আমার পায়ের কাছে, মুগ্ধ ললিত অশ্রু গলিত গীতে কোনদিনই এই ধরণীতে গড়তে পারব না দুটি হৃদয়ের রঙে রাঙানো স্বপ্নের ভুবন। বড় জোর দূর থেকে দেখতে পাবো দেয়ালের ওধারে হাতে হাত ধরে দুই সুন্দর দেবদূত হেঁটে চলেছে, চোখে চোখে কথা বলতে বলতে একে অপরের নয়নে ঘুরে বেড়াচ্ছে সুরের মূর্চ্ছনায়। আর সেই নন্দন কাননে সাপের চেহারা নিয়ে ঢুকতে পারে শুধু এক দৈত্য। হে

আমার প্রিয় আদম; আমি চাই না সেই স্বর্ণযুগের স্পন্দনে তোমার ঈভের সরীসৃপ হতে।

উফ্, আমার এই আত্মার কারিগর কী মর্মান্তিকই যে পরিশ্রম করেছেন! কিন্তু কেন? কে আমার শোণিত স্রোতে বন্যার বেগে ঢেলে দিয়েছে বিষ? আমি তো ভালবাসতে চাই, চাই-চাই শুধু ভালবাসা। অথচ আমি শুধু পাগলের মতো প্রেমের জন্যে চিৎকার করে চলেছি, হাত-পা ছুঁড়েছি, এলোমেলো আচরণ আর ঠাট্টা-মস্করা করেছি, আমার নপুংসকতার তুলনা মেলা ভার, অথচ রক্তে জ্বেলেছি আগুন; একটু উষ্ণতার মোহে ফালা-ফালা করেছি শরীর। যে সুন্দরী যুবতী চেয়েছিল আমায় প্রচণ্ড ভালবাসতে তার থেকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছি আমার শূন্য হৃদয়, শুধু আবেগ-সর্বস্ব হয়ে ছুটে বেড়িয়েছি চতুর্দিকে, শেষ পর্যন্ত বিরাট ব্যর্থতাই হয়ে উঠল আমার ভাগ্য। নিজের অজান্তেই নিজেকে নিয়ে গিয়েছি বেশ্যার ভূমিকায়, যাকে পেয়েছি তাকেই চাখতে চেয়েছি। আমি হলাম সেই পবিত্র হৃদয়ের মতো যে নিষিদ্ধ পল্লীতে খুঁজতে চেয়েছে প্রেমিক, অথচ যেখানকার অধিবাসীদের অঙ্গে অঙ্গে ক্ষোভের চিহ্ন, লালসার জরুল, অশ্রুর বেদনা, হতাশ্বাসের গান। হাত থেকে ঝরে যায় ফুল, খসে যায় তারা। সেখানে সব হৃদয়ে হৃদয়ে বাস করে এক-একটা প্রকাণ্ড মরুভূমি, কামনার সমুদ্রে হিংসা প্রতিহিংসার কুমীর-কামোট। তবু সেখানেই চেয়েছি হৃদয়। কারো চোখের দীপ্তিতে ঝলসে গেছে আমার চোখ, কারো অঙ্গের অগ্নিতে পুড়ে গেছে আমার কাঁচা সোনা রঙ্। হ্যাঁ, একটা ছেলেমানুষী ভাব আমাকে শুধু তাড়িয়ে বেড়াল, উন্মাদনায় অধীর হলাম। হায়, প্রেমের কাছে বন্দী হতে গিয়ে এখন আমি উদ্‌ভ্রান্ত; সমুদ্র তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় খড়কুটোর মত আমার অস্তিত্ব এখন কী ভীষণ করুণ, বেদনাবহ! প্রতিরোধ করবার সামান্যতম ক্ষমতাটুকুও আমার নিঃশেষিত, বুঝতে পারছি সব কিছুই আমার শেষ হয়ে গিয়েছে, হা হা করে ছুটে আসছে অতলান্ত হতাশা বিষাদ, ব্যর্থতা।

দিবালোকে

সিলভিয়ো, সুহৃদ আমার; কমরেড আমার, যদিও তুমি কখনো এমন ভাব দেখাওনি যাতে মনে হতে পারে তুমি আমার অন্তরতম বন্ধু, তবু তোমাকেই আমি ভালবেসেছি সবচেয়ে গভীরভাবে, তুমিই আমার অভিন্ন হৃদয় সংগী। এই স্বর্গের নিচে যদি কোন অন্তরংগতম বন্ধুতা থাকে তা হল তোমার আর আমার। ভিন্ন ভিন্ন হৃদয় হওয়া সত্ত্বেও যদি একে অপরকে যথাযথই বুঝতে পারে কেউ সে হল তুমি আর আমি; তোমার আর আমার আত্মা। তোমার আমার বন্ধুত্বের গাঢ়তা অতুলনীয়, গভীরতা অপরিমেয়। হ্যাঁ, তুমিই আমার প্রিয়তম আত্মার উজ্জ্বলতম সঙ্গী; আবেগ-অনুভূতি স্বপ্নের একমাত্র শরিক। কত সময়ই না একত্রে আমরা কাটালাম, কত সুন্দর মুহূর্ত তোমার-আমার হৃদয় ছুঁয়ে উড়ে গেল। কত কথা, কিছুতেই যেন ফুরোয় না সেসব কথা, শেষ হয়েও শেষ হয় না দিনগুলি রাতগুলি। আমরা কোন কথাই কেউ গোপন করতাম না, পরস্পরের হৃদয় ছিল খোলা, ঠিক আকাশের মতো। উভয়ের হৃদয়েই খোলা থাকত জানালা, পরস্পরকে দেখতাম সেই জানালার মধ্য দিয়ে খেলে যাওয়া আলো-বাতাসের তালে তালে। গোপনীয়তার বালাই ছিল না কিছুই। মাঝে মাঝে যখন ভাবি তোমার কথা তখন বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ি, বুকের ভিতর থেকে উঠে আসে একদলা আবেগ, রোমাঞ্চ জাগে, শিহরিত হই। তুমি আমার বন্ধু, একথা ভাবলেই গর্বে বুক ফুলে ওঠে, চোখ চক চক করে অথচ বয়সে আমি তোমার চেয়ে ছোট; স্বভাবেও তুমি-আমি ভিন্ন ধাতুতে গড়া। আমি যেখানে সেণ্টিমেণ্টাল তুমি সেখানে কতখানি যুক্তিবাদী ভাবলে অবাক না হয়ে পারি না।

সিলভিয়ো, এখন আমি ভালবাসি!

এই যুবকটিকে ঘিরে আমার যে কীরকম অনুভূতি তা আর কেমন করে বোঝাই! সে আমাকে এমনই মোহিত করেছে যে কোন মহিলাও এভাবে মুগ্ধ করতে পারেনি। তার পরিষ্কার সুন্দর কণ্ঠস্বর আমার স্নায়ুতে স্নায়ুতে ছড়িয়ে দেয় অদ্ভুত রোমাঞ্চ,

আমার হৃদয় যেন আশ্রয় খুঁজে পায়, ভাষা ফিরে পায় তার ওষ্ঠে, অনেকটা সেই মৌমাছির মত, যে মৌমাছি মধু নিঃশেষিত করতে ঝুঁকে পড়ে ফুলের উপর। সারাটা দিন আমরা একই সঙ্গে প্রায় কাটাই, তারপর বিকেল হলে শুরু হয় আমাদের ছড়াছড়ি। সে যখন চলে যায় তখন আমি সে সব জায়গায় আরেক বার বসি যে সব জায়গায় সে বসেছিল। সেই সব স্থানে হাত বুলোলে আমি যেন ওর স্পর্শ পাই, অনুভব করি তার অস্তিত্বের উপস্থিতি।

সে আমাকে দেখতে না পেলেও আজ সারাটা সকাল আমি ওকে অনুসরণ করেছি। আমার চোখগুলি গোয়েন্দার মতো ধাওয়া করেছে তার পেছনে। পর্দার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলাম দীর্ঘ সময়। আমি যেদিকে ঠিক তার উল্টোদিকের জানালার কাছে ছিল সে। দুর্গের এই দিকটা চতুর্থ হেনরীর রাজত্বকালের শেষ পর্বে তৈরী হয়েছিল। সেকালের ফ্যাসান অনুযায়ী খানিকটা ইঁট দিয়ে গাঁথা, খানিকটায় পাথর বসানো। জানালা বেশ লম্বা ও সরু, তার মাথায় পাথরের লিন্টেল আর রয়েছে সঙ্গে ব্যালকনি। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ সে লোকটি হল তেওদোর। বিষণ্ণভাবে সে ব্যালকনিতে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে এক সময় দেখলে মনে হবে কোন সাক্ষাৎ দিবাস্বপ্ন। পরনে তার লাল বুটিদার আলখাল্লা, পিঠের উপর ঝুলছে ফুল-কাটা ঝালর, ভারি চমৎকার লাগছিল ওকে। ঘন কালো কেশগুচ্ছ তার আঙুরের থোকার মতো জ্বল জ্বল করছে, আর প্রতিমার মতো তার মুখ মনে পড়িয়ে দেয় কোন অসামান্য শিল্পীর আঁকা রূপবতীর মুখমণ্ডল। হাতে হলদে টিউলিপ নিয়ে মখমলের মত মসৃণ সুডৌল অনাবৃত ঘাড়, কেশের বাহার আর ঝুল-বেশী গাউন পরা ওকে দেখলে মনে হবে কোন স্বপ্নে। সুন্দরী নেমে এসেছে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে। টিউলিপের সুবাস নিচ্ছে মাঝে মাঝে। বাতাসে উড়ছে কুন্তল, ওকে দেখতে দেখতে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। না, ওকে ঠিক কন্দর্পকান্তি মদনদেব বলে মনে হয়নি, বরং মনে হয়েছে স্বর্গের অপ্সরা। মনে মনে বলেছি, 'তেওদোর মেয়ে, মদালসা মহিলা।' পর মুহূর্তেই আবার নিজের নির্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিতাম। কিছুদিন আগে তোমাকে এক মহিলার কথা বিস্তারিত জানিয়েছিলাম। ত্রয়োদশ লুই পার্কের সেই অনন্যা মহিলার কথা মনে পড়ে কি? ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে উঠে আসা বাদামবীথি শোভিত সরণী, জানালার পাশে সুস্মিত আলপনা—এসব কিছুর নিপুণ বর্ণনা ইতিপূর্বে তোমাকে দিয়েছি। বাস্তবিকই এসব আমার স্বপ্নের সংহত উপলব্ধি। এও ঠিক সেই সমধর্মী স্থাপত্যরীতি, আলো-ছায়ার অবিকল যাদু, সৌন্দর্যের মধুরিমা, চরিত্র আর রংয়ের কুসুমমঞ্জরী যা আমি বরাবর চেয়েছি। সেদিনের রাত আমার কাছে হয়ে উঠেছিল বিশাল একটা রুপোলি পাখী। সেদিনের কথা ভাবলেই আমার বুকের উপর দিয়ে চলে যায় স্খলিত তারার জ্বলন্ত পুচ্ছের মত স্মৃতি। মর্মে মর্মে আমার স্বপ্নের উত্তাল, অভিমানী আবেগের আত্মনাশা আবর্ত থেকে আমার প্রেমে ছিল শিল্পের নির্মিত নন্দন। তবু সেদিনে এদিনে বিশাল ফারাক পরিবেশের সাদৃশ্য সত্ত্বেও ফারাক ছিল নারীতে পুরুষে।

মানুষের চোখে যেমন করে ঈশ্বর তৈরী করলেন রেশমী পক্ষ্ম? আমাদের কুৎসিত মুখমণ্ডলে কেন তিনি দিলেন না শিল্পীর বাঞ্ছিত সুষমা? অমন সুন্দর মাখনের মতো নরম মাংস দিয়ে আমাদের অস্থিগুলোকে আবৃত করতে পারতেন তিনি, অথচ তা করলেন না। তিনি কেন ওরকম রমণীয়, তরঙ্গায়িত কেশগুচ্ছ দিয়ে ঢেকে দিলেন না আমাদের করোটি।

হে অনুপম! আমরা শুধু প্রেম-নির্মাণের জন্যই সৃষ্টি, আর হাঁটু গেড়ে আত্মনিবেদন করাই যেন আমাদের ভাগ্যলিপি। সুখ বড়ো প্রতারক, বড়ো ছলনাময়ী। সে চলে যায়, চলে যায়, চলে যায়। আর সৌন্দর্য নিয়ে বেড়ে ওঠে দেবদূতী, বেড়ে ওঠে রমণী। আহা রমণী। কি অদ্ভুত রমণীয় রোমাঞ্চ জাগে এই শব্দে! প্রেমিক, কবি, চিত্রকর, ভাস্কর—তাদের জন্যেই চাই প্রেমের স্ফুরণ, প্রেমেই এরা যোগ্য হয়ে ওঠে। প্রেমিকের চাই মিসট্রেস, কবির সংগীত, শিল্পীর ক্যানভাস, ভাস্করের প্রস্তর, কিন্তু চিরন্তন তৃপ্তি পাওয়া যায় না কিছুতেই। বুকের মধ্যে অনন্ত অতৃপ্তি নিয়ে হেঁটে যান তাঁরা, যা চান তা কোন দিনই ধরা দেয় না, যা পান তা তাঁদের দিতে পারে না সুখের সন্ধান। রূপে কখনোই ধরা পড়ে না অরূপ, অরূপের মোহিত ব্যঞ্জনা। আমাদের অবয়বও ধরতে পায় না মোহন সৌন্দর্যের অপরূপত্ব।

আমার মনে হয়, আমার যা থাকা উচিত ছিল তা ঐ যুবকটি হরণ করেছে আগেই। আমি, এই হতভাগ্য যুবকটি যা চেয়েছিলাম তা পেলাম না। আমার যা কিছু কুৎসিত দিক তা ওর কাছে হয়ে উঠেছিল সুন্দর, আমার খারাপগুলো ওর কাছে বদলে হল অনুপম, তাই ওর কাছে আমার চেহারাটা হল ওর সুন্দর চেহারার আমি যেন প্রাথমিক খসড়া। আমার মত উচ্চতাসম্পন্ন হলেও সে অনেক ছিপছিপে অথচ শক্তিধর। ওর উপস্থিতি জানান দেয় আমার কথা, তবু আমার ভিতর যে মাদকতার অভাব ওর মধ্যে রয়েছে তার পূর্ণতা। আমি রূপ, সে অপরূপ, আমি যদি অমানিশার আকাশ সে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নক্ষত্র-নীলিমা। আমারই আঁখির মত ওর নয়ন, তবু ওর চোখে খেলে সুখের মূর্চ্ছনা, ফোটে স্বপ্নের কুসুম অথচ আমার তা নেই। আমারই মতন সে দীর্ঘনাসা, তবু তার নাক যেন ভাস্করের নৈপুণ্যে অসামান্য; নাকের ফুটো দুটো ওর ঈষৎ বড়ো এবং সেখানেও যেন আবেগের আরেক উল্লাস। ওর মধ্যে রয়েছে এমন এক বীরপনা যার অভাব আমার মধ্যে তীব্র, আসলে যে ভাবনার মূর্ত হলাম আমি তা শুধু খসড়া, আর ও হল সেই খসড়ার উপর দাঁড়ানো আসল-সূক্ষ্ম সুন্দর নিখুঁত মূর্তি। যখন সে হাঁটে, হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়ায়, মহিলাদের অভিবাদন জানায় বা যখন ফুটে ওঠে সৌন্দর্যের নিপুণতা, আর আমি ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যাই, বিষণ্ণতা ফুটে ওঠে মুখে, ঈর্ষার আগুনে পুড়ে মরি। ধিক্কার জন্মায় নিজের ওপর। বড়ো অসহায়, সুন্দর মনে হয় ওর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করলে। মনে হয় শিল্পীর স্টুডিওর আমি এক মৃত্তিকামূর্তি আর সে হল মার্বেলমূর্তি। আমার মধ্যে রয়েছে এবড়োখেবড়ো চেহারা; রয়েছে অমসৃণতা আর তার মধ্যে সব কিছুই যেন হিসেব কষে তৈরী; সবকিছুই পরিমাণ মাফিক; সেখানে নেই বাহুল্য, রয়েছে অনুপম

শিল্পের শোভনতা, মাধুর্য। সকলেরই চোখে পড়ে ওর রূপ, আর আমি হই উপেক্ষিত, অবহেলিত। মাঝে মাঝে মনে হয় বলিষ্ঠতা, দৃঢ় পদক্ষেপের সঙ্গে আমার অবয়বত্ব যুক্ত হয়ে সে পেয়েছে অসামান্যতা, যাই হোক, আসলে সে আমারই অনুকরণ, কেননা ওর আগেই জন্মেছি আমি, এবং আমি না থাকলে প্রকৃতি কল্পনাও করতে পারতেন না ওর বর্তমান রূপ। আমার চেহারা সামনে রেখেই, ওকে আরো সুন্দর করে গড়ে তুলছেন স্রষ্টা। যখন কোন মহিলা ওর অপাঙ্গ চাহনিতে ওর রহস্যময় হাসিতে হয়ে ওঠেন আরো রহস্যময়ী তখন গৌরবে ভরে যায় আমার বুক, হয়ে পড়ি আত্মসুখী। মহিলারা যখন হয়ে ওঠেন মধুরহাসিনী তখন আমি বলে উঠতে চাই, 'কি নির্বোধ তোমরা। আছে কি হোথায় নবীন জীবন, আশার স্বপন ফলে কি হোথায় সোনার ফলে? বরং আমার পানে তাকাও। বলি ঃ কোথা আছ, ওগো, করহ পরশ নিকটে আসি। স্তুতি যদি করতে হয় আমায় করো, কেননা অমন শোভন সুন্দর যুবাতো আমারই কাছে ঋণী। সুতরাং ওর প্রতি বিশেষ সম্ভ্রম দেখানোর কোন মানেই হয় না। অমন দীননয়নে তুমি চেয়ো না।' কান্তির দিক থেকে সফলতা এলেও ঐ যুবক আসলে নির্বোধ, ওর মর্মকোষে বাসা বাঁধে বোধহীন রূপ। আর এই নির্বুদ্ধিতা ওর বিলোল চাহনিকেও হার মানায় বারেবারে। এখন, হ্যাঁ এখন, তেওদোর আমার কাছে কাম্য নয়, যদিও সে সত্যি সত্যিই স্বয়ং কামদেব। বরং ওর রূপ থাকুক ওরই, আমি যেমন আছি থাকি তেমনি। আমি জানি ওর যা নেই আমার তা আছে। মাথার ভিতরে এক বোধ খেলা করে। ওর আছে রূপ, আমার আছে বোধ।



হোমর যুগের মানুষ আমি। যে পৃথিবীতে আমি বাস করি সে আমার নয়। চারদিকে যে অগণন মানুষের ভিড় তারা আমার অপরিচিত। তাদের বুঝতে পারি না, ধরতে পারি না সমাজটাকেও। অ্যালসিবাইডস ও ফিডিয়াসের মতই আমি পেগান। স্বর্গের মতই সুন্দর এই পৃথিবী, আর নিপুণ অবয়বই হল সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত, সেটিই সেরা গুণ। বলা বাহুল্য অধ্যাত্মিকতায় আমার আস্থা নেই, বরং চাই ভুতের মূর্তি, চাই ঊষায় দুপুরের সূর্যালোক। তিনটে জিনিস আমায় আনন্দ দেয় ঃ সোনা, মার্বেল আর বেগুনী বর্ণবিভাস—ঔজ্জ্বল্য, ঘনতা আর রঙ। এসব

দিয়েই তৈরী আমায় স্বপ্ন, তৈরী আমার কল্পনার রাজপ্রাসাদ। কখনো কখনো অন্য স্বপ্নও দেখি, দেখি সংখ্যাহীন সাদা ঘোড়ার ওপর সঙ্গিনীবিহীন, অসজ্জিত, উলঙ্গ যুবক অশ্বারোহীর মিছিল, টিউনিক পরা ব্যাণ্ডবাদ্য সহ যুবতীরা ঘিরে রেখেছে তাদের। মেয়েদের হাতে শোভা পাচ্ছে হাতীর দাঁতে তৈরী পাখা, সে এক মনোরম দৃশ্য। তাদের চারদিকে থাকবে প্রকৃতির অকৃপণতা, সবুজের বসন্ত বাহার। ছন্দে আর মিলে মন্ত্র বাঁধবে পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে, একই সূত্রে গাঁথবে শূন্য আর ধরাতল। শ্যামল প্রান্তর ছড়িয়ে দেবে প্রাণের রঙ, থাকবে না কুয়াশা, উঠবে না কোন রূপ। শরতের রৌদ্রের সোনালী স্নান করাবে বনকে। কোন অনিশ্চয়তার চিহ্ন মিলবে না সেখানে, ভাবাবে না কোন অস্থিরতা। আমার স্বর্গে নেই মেঘের উপস্থিতি। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় রোদের ভালবাসা, চূড়ার উন্মুক্ত নয়নে সিংহ-প্রতিম হরিদ্রার বর্ণ আলিম্পন। হলদে ফুলের থোকায় থোকায় মধু খুঁজবে বেগুনী মৌমাছি। আমার সেই স্বপ্নের ভুবনে ধ্বনি আর রঙের একাকার। যুগ যুগান্তের মোনে হিমাদ্রির সার্থকতা, নিশ্চল সবুজবন্যা। মাঝে মাঝে নাম না জানা পাখীর ডানা ঝাপটানোর সরব সংগীত, অরণ্যের পদমূলে ছায়ার গালিচা। যেদিকে তাকাবো উজ্জ্বলতার দ্যুতি, সব কিছুই করবে ঝকমক। অথচ আদিমতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে প্রকৃতি, পড়বে না সেখানে কৃত্রিমতার কোন স্পর্শ। এই আদিম, বলিষ্ট, অকৃত্রিম জগতই আমার পৃথিবী। এই ভুবনেই আমার অধিবাস। ঘন কালো ওক-বনে খোঁজ মিলবে তূণীর সুশোভিতা জুপিটার-দুহিতা ডায়ানার। পুরনো দিনের শিল্পীদের মতই আমার ছবিতে থাকবে চারটে রঙ, সেই রঙে হাত বোলালেই ভালবাসার অংকুরোদ্গম। প্রাচীন আলোয় আমি দেখতে চাই আমার ভালবাসার ভুবন, দেখতে চাই মন্দ ভালয় মেশানো প্রেমের ভাস্কর্য-প্রতিমা। বাহুদুটো কেমন তার? যথেষ্ট ভাল।

সৌন্দর্যের খামতি নেই। পদযুগল কেমন তরো? পায়ের গোছে তেমন কোন বিশেষত্ব নেই, গোড়ালিও সাধারণ। কিন্তু গলা তার অসামান্য, কাঁধ পুরুষ্টু আর শোভনস্নিগ্ধ। এইরূপ মহিলা মডেল হিসেবে সত্যিই লোভনীয়। এবং এর অঙ্গের বিশেষ বিশেষ অংশ রেখাচিত্রে ফুটিয়ে তোলা যাবে অনাদায়রূপে। এসো, একেই সমর্পণ করি আমরা প্রেম। ভালবাসি তাকে।

এরকমই আমি বরাবর চেয়েছি। সেরকম রমণীই আমার কাছে প্রার্থিত যার চোখে থাকবে ভালবাসার চাহনির বদলে ভাস্কর্যের ইঙ্গিত। যদি আমার কাছে প্যানডোরার বাক্স থাকত তাহলে সেটি আমি খুলতাম না।

কদর্পকান্তি ক্রীতদাস যেমন আমাদের আনন্দ দেয় আমিও ঠিক সেরকম প্রাচীন যুগের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকিয়ে থাকি মহিলাদের প্রতি। খ্রীষ্টান ধর্ম আমার চোখে দিতে পারে নি তার পুনর্বাসন। আমার কাছে সব সময়েই একটু স্বতন্ত্র এবং তুলনামূলক-ভাবে আমার চেয়ে অপকৃষ্ট। কিছু কিছু তার প্রশংসনীয়, স্তুতিযোগ্য, উপভোগ্য। বুদ্ধির ভাঁড়ারে ঘাটতি থাকলেও তারা স্বর্ণপ্রতিম বা হস্তীদন্তস্বরূপ। তোমাকে

আমি আগেও বলেছি যে মেয়েদের সম্পর্কে আমার ধারণা খুব ভালো নয়; বেশী ভাবতেও চাই না। বরং ঘুরিয়ে বলা যায়, হয়তো আমি ওদের বিষয়ে একটু বেশীই আগ্রহী।

আজো আমি ভেবে পাই না মেয়েরা কেন পুরুষ হবার ইচ্ছা ভেতরে ভেতরে পোষণ করে। আমি মানুষকে মনে মনে কল্পনা করি সরীসৃপ, সিংহ বা হস্তীরূপে, কিন্তু কিছু তেই বুঝতে পারি না কেমন করে সবাই পুরুষ হতে চায়।

জীবনে আমি যে কটি কবিতা বা যে কটি স্তবক রচনা করেছি তাতে এই ধারণাকেই করেছি মূর্ত। এখনো সেই সব রচনা প্রায়ই পড়ে থাকি। আধুনিক প্রেমের মর্মবাণী বা অন্তঃসার তাতে নেই। ফরাসী ভাষার বদলে যদি সেগুলো লাতিনে লেখা হতো তাহলে অনেকেই মনে করতেন অগাস্টাসের সমকালীন কোন অক্ষম কবির রচনা এ সব। যে সব রমণীর উদ্দেশে এই সব পংক্তি নিবেদিত তারা এগুলো পড়ে মুগ্ধ হবার বদলে যখন ক্রুদ্ধ হন তখন আমার অবাকই লাগে। সত্যি কথা বলতে কি মেয়েরা শাকসব্জি বা ফুলের ব্যাপারে অনেক কিছু বুঝলেও কবিতা ব্যাপারটা ওদের কাছে দুরূহ। কবিতা ওদের কাছে চিরকালই দুর্বোধ্য। এর কারণও খুব সহজ। কবিদের রচনায় ওরা নিজেদেরই এক একটা জীবন্ত কবিতা হিসেবে দেখতে পায়। অন্তত কবিতার মূল চাবিকাঠি যে তারা তা বেশ ভালমতই জানে। বাঁশি কখনো বুঝতে পারে না সেই ধ্বনি, বাতাস যা তোলে তার শরীরে। মেয়েরা সেই বাঁশিরই মতো। মৃগনাভি হরিণের যে অবস্থা মেয়েদের অবস্থা তার চেয়ে খুব আলাদা নয়।

স্বর্ণাভ বা মদির কেশগুচ্ছ, মায়াবী ত্বকের সুকুমারত্ব, বাহুর সুডৌল আদল, হ্রস্ব পদযুগল, হাতের বিশেষ গড়ন, মদকল বরতনু এবং সুন্দরের অনন্ত তৃষ্ণার বর্ণনা ছাড়া এই সব কবিতায় আর কিছুই ছিল না। সে সব রচনায় ছিল বিজয়ীর বরমাল্য; ছিল পুষ্পবৃষ্টি, অগ্নিক্ষরা সুবাস, চুম্বন, শ্বেত ও বিমোহিত রজনী, ঊষার আবির্ভাবে মনোভঙ্গজনিত ক্রোধের আবেগ। পংক্তিগুলো সঠিক আর চাঁচাছোলা। কোন প্রভু তার ক্রীতদাসকে মোলায়েম করে যেমন কিছু বলে তেমনি সব সূক্ষ্মতা আর প্রকাশের অবগুণ্ঠন সরিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠত তীক্ষ্ম কঠিন স্বর। এই হল ভালবাসা, তাই কোন হৃদয় আর এক হৃদয়ের কাছে প্রেমের প্রত্যাশী নয়। নিবিড়-নীলিমায় অলঙ্কৃত নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে পড়ে এর প্রতিচ্ছায়া। এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না একই সময়ে একই সঙ্গে আকাশে ওড়ার অধীর আগ্রহে কোন যুগল কপোতের ডানা মেলার ছন্দ।

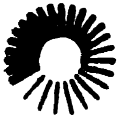
'সিন্থিয়া, সুন্দরীতমা, দ্রুততমা। কে জানে কাল অব্দি তুমি থাকবে কিনা? ইথিওপিয়ান কুমারীর মখমল চকচকে কালো চামড়ার চেয়েও তোমার কেশগুচ্ছ কালো। জানি সকালের পুষ্প ঝরে বনতলে বিষণ্ণ সন্ধ্যায়। জানি আজকের ঝলমলে ফোটা গোলাপের সুবাস কী মিষ্টি, অথচ পরের দিনই সে অপেক্ষা করে মরণের কোলে ঢলে পড়তে, এভাবেই শেষ হয়ে যায় গোলাপ, ঝরে যায় লোক মাতাল-করা গোলাপের পাপড়ি। এসো, গোলাপের মতো তোমার চিবুক থেকে ভরে নিই নিঃশ্বাস; তোমার

চিবুকের মতো গোলাপে খাই চুমো। এসো, সোহাগে সোহাগে মাতাল করে দিই তোমাকে, তোমার গোলাপপ্রতিম চিবুকের স্বাদ নিই প্রাণভরে। সিন্থিয়া, যখন তুমি বৃদ্ধা হবে, কেউ তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না, তোমাকে পাবার জন্যে হবে না বিপুল ব্যাকুল। এমন কি, তোমার বেতনভুক ভৃত্যটিও নয়। আজ যাকে তুমি আমল দিচ্ছ না হয়তো তারই পেছনে ছুটবে মরীচিকার মতো। ক্ষুদ্রতম অসদৃশতাও রচনা করতে পারে প্রবলতম আবেশের কবর।"

এ হল সেই প্রাচীন শোক গাথার সংক্ষিপ্ততম রূপ; সংহত প্রকাশ। এ-এক নিষ্ঠুর বিধান। তবু এরই হেরফের ঘটে বারেবারে, ঘুরে ফিরে আসে একই চেহারা নিয়ে। এই হল মহত্তম ও বলিষ্ঠতম যুক্তি, এই হল অ্যাকিলিসের সওয়াল। হ্যাঁ, প্রেমের ব্যাপারে আমি একটু প্রগল্‌ভ। আসলে এটা এমনই এক বিষয় যা নিয়ে লক্ষ কথা বলা যায়, তবু সব বলা হয় না। বিচিত্র এর গতি, আবেগ, অনুভূতি। বহুবিধ এর রঙ, বিভিন্নতর এর সুর, তাল, লয়। সত্যি কথা বলতে কি, ভালবাসা শব্দটিই বড়ো কুহক, অদ্ভুত মাদকতাময়। এবং এ-ব্যাপারে আমার এত বেশি পড়াশোনা, এত অধিক সংখ্যক মনোজ্ঞ নিবন্ধ পড়েছি যে হাজার হাজার কথা কোথা থেকে এসে ভিড় জমায় মগজে। এর জন্যে কোন অভিনেতার প্রতিভা দরকার হয় না। কথায় বলে না পহেলে দর্শনধারী, পিছে গুণবিচারী। আর এই দর্শনধারী দেখতে দেখতে এই বয়সেই চালসে ধরে যায়। ফলে, মেয়েদের ভাবভঙ্গি দেখলেই বুঝতে পারি কোন্ ধাতুতে কে গড়া। ভোরবেলা যেমন জানান দেয় দিনটা কেমন যাবে তেমনি এদের চালচলন, কথাবার্তার ঢঙ্ দেখলেই আমার জহুরী চোখ চিনে ফেলে মালটি কেমন। হেঁ-হেঁ-হেঁ, শিকারী বেরাল তো চেনা যায় তার গোঁফেই। উপরন্তু লেখার অভ্যেস, কল্পনা করার ক্ষমতা, আমাকে মেয়েদের মনের অলিগলি এমনভাবে চিনিয়ে দিয়েছে যে এই ব্যাপারে কথা উঠলে কিছুতেই বাক্ সংযম করতে পারি না। তবু সেই আমিও মাঝে মাঝে ভ্যাবাচ্যাকা খাই; হাতড়ে বেড়াই যুতসই শব্দ, কিন্তু কিছুতেই সব বলা হয়ে ওঠে না। প্রাচীন কবির মতই নিম্নস্বরে বারবার উচ্চারণ করি— 'সিন্থিয়া, লাস্যময়ী।'

প্রায়ই আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ শোনা যায় যে আমি ধূর্ত আর প্রতারক। পৃথিবীর কেউই তো হৃদয় উজাড় করে কথা বলে না, কেউই ফাঁকা করে দেয় না আপন আবেগ অনুভূতির ভুবন। কিন্তু আমার চারপাশে যারা আছে তাদের মত যেহেতু একটা মাত্র ধারণা বা একমাত্র সেন্টিমেন্ট নিয়ে আমার কারবার নয় তাই মাঝে মাঝে হৈ-হুল্লোড় বা চিৎকার চেঁচামেচির চেয়ে নীরবতাই বেশী কাম্য। আর যদি কথা বলি তবে তা বুকের ভিতর থেকে তুলে আনা শব্দের বদলে হয়ে পড়ে বাজারী কথাবার্তা। আমি যা লিখি তা মেয়েদের জানাতে চাই না। যদি বলি কাউকে, তোমায় নিয়ে এটা আমি লিখলাম তাহলে সে আমাকে ভালভাবে না-ও নিতে পারে। উপরন্তু, প্রেমের ব্যাপারে আমার মানসিকতাকে তারা অপছন্দ করবে বলেই আমার ধারণা। অন্যদিকে পুরুষদের আমি অনেক কথাই বলতে পারি; তাদের সঙ্গে চলতে

ফিরতে হাটতে কইতে কোন অসুবিধে ঘটে না। কোন শব্দ নিয়ে কারো সঙ্গে তর্কে মেতে ওঠা যেহেতু আমার ধাতে নেই, তাই অনেক ব্যাপারই আমি তুচ্ছ জ্ঞানে অবহেলা করি। আমি কী ভাবি আর কি ভাবি না তা নিয়ে কখনো মাথা ঘামাই না, দুঃখের ভিতর আমি আনন্দিত কিনা বা আনন্দের মধ্যে বিষাদ ফুটে ওঠে কিনা—এ সব ব্যাপার নিয়ে ভাববার কখনো ফুরসৎ ঘটেনি আমার। এর জন্যে অবশ্য নিজেকে আমি কখনো দোষী করি না, কস্মিনকালেও আমি নিজেকে দেখিনি উলঙ্গ করে। শরীরটাকে যেমন করে ঢেকে রাখি, তেমন করে কি আমি আমার মুখটাকেও ঢেকে রাখি না? কাপড়ের চেয়ে মুখোস কেন এত নিন্দনীয় আর অন্তর্বাসের চেয়ে কেন খারাপ হবে মিথ্যা?



হায়! পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে। সেই পৃথিবীর একটা দিক যখন গরমে ভাজা-ভাজা হচ্ছে, ঠিক তখনই আরেকটা দিক ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। একটা যুদ্ধে ছ'লাখ মানুষ পর্যন্ত জড়িয়ে পড়ে একে অপরকে টুকরো টুকরো করতে চায়। তা সত্ত্বেও আবহাওয়া কত সুন্দর, ফুলের সমারোহে কি বিলোল চাহনি আর কেলি-পরায়ণতা, এমন কি ঘোড়ার খুরে চাপা পড়েও ফুল হারায় না তার মাদকতাময় বর্ণদ্যুতি, শত বাধা সত্ত্বেও সে ফোটে, সে ডেকে বলে: আমি ফুটেছি, আমি ফুটেছি। আজ হয়তো সংখ্যাহীন ভাল কাজ পৃথিবীতে সুসম্পন্ন হল, কিন্তু তাও একদিন ভুলে যাবে সবাই, বৃষ্টিতে ধুয়ে যাবে সব কিছু, শূন্যতায় মিশে যাবে সেই সব কাজ বজ্র, বিদ্যুৎ, তুষার, ঝঞ্ঝায়। মানব হিতৈষীদের বুক অব্দি পুঁতে রাখা হবে কাদায়, লেলিয়ে দেওয়া হবে কুকুর। সৃষ্টি সব সময়েই নির্মমভাবে বিদ্রূপ করে স্রষ্টাকে, প্রতিটি মুহূর্তে হানে কশাঘাত। প্রত্যেকটি মানুষই অন্যের চেয়ে আলাদা, প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ধাতুতে গড়া তাই প্রেমের বোধও এক-এক জনের কাছে এক এক রকম। প্রেমের আবেদন ক-এর কাছে যেমন গ-এর কাছে কখনোই তেমনটি নয়। এতে ভালবাসার কি কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়? বিট মূল বা মানুষ—যে যে ভাবেই নিক না কেন আলো, সূর্যের কি কিছু এসে যায় তাতে? আমি যদি কিছু করি, আবার যদি কিছু না করি, বেঁচে থাকি অথবা মারা যাই, দুঃখ-কষ্ট ভোগ করি, কিংবা সুখে কাটাই,

কর্পূরের মতো উবে যাই বা ভয়ংকর ভাবে টিঁকে থাকি—তাতে সূর্যের কি হয়? ছোট্ট একটা খড় পিঁপড়ের ওপর পড়লে তার তৃতীয় পা হয়তো ভেঙে যায়; পাহাড়ে ধ্বস নামলে গুঁড়িয়ে যায় গ্রাম—কিন্তু নক্ষত্রের সোনালি নয়ন থেকে ঝরে পড়া জলের চেয়ে এ রকম বিপর্যয় কখনো বেশী অশ্রুপাত করায় বলে আমি মনে করি না। ঘণ্টার ফাঁকা আওয়াজের মত শুনতে না হলে বলি তুমিই আমার সেরা বন্ধু। আমার তো আরো অনেক বন্ধু আছে, অনেক মিসট্রেস আছে কিন্তু তিন বছর বাদে তারা কি আমায় চিনতে পারবে? কারো সঙ্গে রাস্তায় হঠাৎ দেখা হলে কেউ কি আমাকে নাম ধরে ডাকবে, কাছে এসে কুশল শুধোবে? বিস্মৃতি আর শূন্যতাই হল মানুষের অখণ্ড অস্তিত্ব, তার পরিণতি।

ভালমতই বুঝতে পারছি, আমি একা, ভীষণ একা। যথার্থ নিঃসঙ্গ বলতে যা বোঝায় আমি হলাম এখন ঠিক তাই। সবার থেকেই আমি বিচ্ছিন্ন; সকলের চেয়েই আলাদা। যে যে জিনিসের সঙ্গে ছিল আমার সম্পর্ক, যে যে লোকের সঙ্গে ছিল আমার পরিচিতির বাঁধন তা সব ছিন্ন হয়ে গেছে। সব সম্পর্কের সুতোগুলো গেছে ছিঁড়ে। নিজের গতিবিধি সম্পর্কে যে মানুষ ছিল সতত সচেতন আজ সেই মানুষই কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। গোটা পৃথিবীই তার কাছে মনে হয় অচেনা, অজানা; রহস্যময়। মাথার ভিতরে তার ঘুণপোকার বাসা; তারা কুরে কুরে খায় মানুষটির অস্তিত্ব আর সে হয়ে পড়ে ভয়ংকর একা, প্রকাণ্ড মরুভূমি।

এ সব কথা যখন ভাবি তখন আর নিজেকে সামাল দিতে পারি না। নিজেকে বিকৃত, বিকলাঙ্গ বলে মনে হয়। এ ভাবনা যদি আরো পেয়ে বসে আমি পচে গলে নষ্ট হয়ে যাব, আত্মাকে হারিয়ে ফেললেই পোকা এসে কিলবিল করবে। আমি আর তখন আমি থাকব না, আমি হয়ে উঠব ফসিল। বছর খানেক আগেও আমি ছিলাম মানুষ; সব কিছু ছাপিয়ে একটা ভাবনাই বড়ো হয়ে উঠেছিল: আমি চেয়েছিলাম ভালবাসা; সে বয়সে এই স্বপ্নটাই আমাকে উদ্দীপিত করেছে, করেছে প্রাণিত। সেই স্বপ্ন একদিন বাস্তব হতে চলল, হতে চলল শয্যার সঙ্গিনী। কিন্তু না, তা হল না। শেষ পর্যন্ত সব রঙ মুছে গেল, স্বপ্ন হয়ে উঠল দুঃস্বপ্ন, বিভীষিকাময়। আমার মুখের ওপর গজদন্ত ফটক বন্ধ করে দিল আত্মার ভুবন, সব ধ্বনি সব সুর প্রায় শেষ হয়ে গেল। চারদিক থেকে হা হা করে ছুটে এল ব্যর্থতা, হতাশায় ঘিরে ফেলল শরীর। হাত দিয়ে যখন কিছু ছুঁতে পারি তখনই মনে হয় তাঁর অস্তিত্ব বর্তমান। আমার স্বপ্ন বোধ হয় পাথর, চারদিকে আমার সংহত কঠিন রূপের সমাবেশ। আমার সামনে দিয়ে কিছু ভেসে যায় না, ঢেউ তুলে যায় না, সেখানে নেই বাতাস, নেই নিঃবাস প্রশ্বাসের আয়োজন; সব কিছুই লাঞ্ছিত, পযুদস্ত, বিপর্যস্ত। সমস্ত কিছুই আমাকে শেষ করে দিচ্ছে, ধ্বংস করে দিচ্ছে, ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। আমার অবস্থা অনেকটা তীর্থযাত্রীদের মতো। কোন গ্রীষ্মের খরতাপে যে যাত্রিক নদীতে পা ডুবিয়ে একদিন ঘুমিয়ে পড়েছিল নিঃসীম ক্লান্তিতে; আবার যখন সে জাগল; ঘুম তার ভাঙল, সে দেখল চারদিকে তুষার আর তুষার এবং বরফে ঢাকা পড়েছে

তার শরীর—আমার অবস্থা এখন এরকমই যান্ত্রিকের মতো। না, আমি আর কারো ভালবাসা চাইনে, চাইনে কারো বন্ধুতা। একদিন অবশ্য সবই ছিল; ছিল আকাশে রামধনু; হৃদয়ে ছিল প্রজাপতির রঙ। এখন আর কিছুই নেই, এখন সবই ফাঁকা, খাঁ খাঁ শূন্যতা। বেশ কিছু কাল হল সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করেছে, আমার সংস্রব ছেড়ে দূরে সরে গিয়েছে।

মাঝে মাঝে তবু নিজেকে বিশ্বের সেরা সুখী বলে ভাবি, অন্তত নিজেকে সেভাবেই চিত্রিত করি। নিজেকে মনে হয় বিশাল বর্গক্ষেত্রের মতো এক অট্টালিকা। বাইরের দিক থেকে সে বাড়ির কোন জানালা নেই। বাড়ির মাঝখানটায় রয়েছে উঠোন। চারদিকে তার সার সার শ্বেত পাথরের থাম ; আর প্রাঙ্গণের মাঝখানে আরব্য কেতার লাস্যময়ী ফোয়ারা ; একান্তরভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে কমলালেবু আর ডালিম বীথিকা ; গাঢ় হলদে সূর্যালোকের মধ্যেই তারা তাকিয়ে রয়েছে নীল আকাশের মাঝে ঘন-নীলের আকাঙ্ক্ষায়; মৌন নীলের ঈশারায় জাগছে তাদের কোন্ এক কামনা ; দীর্ঘ-তীক্ষ্ণ-নাসা শিকারীগুলো এখানে-ওখানে বসে বসে ঝিমুচ্ছে ; সোনার বেড় দেওয়া খালি পায়ে দশাসই নিগ্রোর দল, আর দামী পোশাক পরা ছিপছিপে গড়নের সুন্দর সুন্দর শ্বেতাঙ্গ ভৃত্যগণ হাতে লোভনীয় সব ঝুড়ি নিয়ে মাথায় কলসী নিয়ে যাচ্ছে এদিক থেকে সেদিক। আমি নিশ্চলভাবে ঝুঁকে বসে আছি এক সিংহাসনে, হাতের কাছেই রয়েছে পোষমানা এক চিতাবাঘ আর পায়ের নিচে অনলংকৃত-অনাবৃত গলায় এক ক্রীতদাস, আমার ঠোঁটের সামনে ধরে রেখেছে ধূমপানের নল, আমি সেই নল থেকে টেনে নিচ্ছি আফিমের স্বাদ, নেশা করতে করতে হয়ে পড়েছি বুঁদ।

নিশ্চয়ই তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে আমার প্রতিশ্রুত ভুমি, এলডোরাডো। এ আমার স্বপ্নের আবাস, তবু এখানে আমি আমার পরিচিত কাউকে বাসিন্দা করতে চাই না, কল্পনাও করতে পারি না আমার কোন বন্ধু এখানে এসে জুটুক, যাকে একবার ভালবেসেছি সেরকম কোন মহিলাকেও বসাতে চাই না আমার নরম তুলতুলে ভেলভেটের সিংহাসনে। আমি সেখানে একাই থাকতে চাই, থাকতে চাই ছায়ার মধ্যে নিবিড়তর হয়ে সময় কাটাতে। যে সব মহিলার মুখমণ্ডল একদিন আমাকে প্রাণিত করত; যে সব যুবতীর কায়া আমাকে দিত মিষ্টি ছায়া, এখন আর তাদের ভালবাসবার কথা কল্পনাও করতে পারি না, তাদের আর ভালবাসতে চাই না; ভাবতেও পারি না একদিন তারা ছিল আমার হৃদয়ের মাঝখানে। এমন মনোরম পরিবেশে কাউকে চাই না আমি সুলতানা করতে। নিগ্রোনী, মিউল্যাটোনী, আর নীলাভ চামড়া ও রক্তিম কেশবতী ইহুদিনী সেখানে ছিল, ছিল গ্রীক; সারসীয়ান্, স্প্যানিছার্ড আর ইংরেজ রমণী—কিন্তু এরা সকলেই আমার কাছে রঙ আর রেখার প্রতীক বৈ অন্য কিছু নয়। তারা নিছকই আনন্দদায়ক যন্ত্র, ফ্রেমবিহীন ছবি; কিংবা স্ট্যাচু। এদের ভিতর থেকে কাউকে তাদের প্রভু একটু কাছে ডাকলেই তারা খুশীতে ডগমগ। মেয়েদের এই একটা সুবিধে যে তারা স্ট্যাচু থেকে মুহূর্তেই বদলে হয়ে যায় জীবন্ত ঃ তখন সে তার খুশীমাফিক চলতে চায়; চলতে চায় আরো নানাভাবে, চায়……

তেওদোরকে আমি দেখি আর অবাক হয়ে শুনি ওর কথা, ওর গান। চমৎকার গাইতে পারে সে, আর আমিও যে কি আনন্দ পাই তা বলা যায় না। আমার উপর তার মহিলাসুলভ আচরণ অসম্ভব প্রভাব ফেলেছিল এবং সেই প্রভাব এত তীব্র যে একদিন তুমুল কথাবার্তার মাঝে ওকে আমি 'ম্যাডাম' বলেই সম্বোধন করে ফেলি! সে কথা শুনে তো সে হো-হো করে হেসেই ফেলল, অবশ্য পরে আমার মনে হয়েছে সেদিন সে জোর করেই হেসেছিল।

যদি সে স্ত্রীলোকই হবে তাহলে এভাবে নিজেকে লুকিয়ে রাখবার উদ্দেশ্য কি? আমি অন্তত এর কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না। সুন্দর, ছিমছাম, শ্মশ্রুহীন যুবক যখন রমণীর ছদ্মবেশ ধারণ করে তখন তার মানে বুঝি; বুঝতে পারি, যে হাজার দুয়ার সাধারণত বন্ধ থাকে তার কাছে তা খুলে যায় অনায়াসে এবং জটিলতার রহস্যাভিযানেও পাওয়া যায় অদ্ভুত আনন্দ, লাভ হয় মাদকতা। আর সেই সযত্ন-সতর্ক ছদ্মবেশী রমণী পৌঁছতে পারে তার কাঙ্ক্ষিত স্থানে, অবশেষে যখন তার ঘোমটা খোলে, আবরণ খসে যায় তখন পুরুষের মনে সঞ্চার হয় বিস্ময়বিহ্বল মুখ। কিন্তু বুঝতে পারি না, একজন সুন্দর যুবতী যখন পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করে দেশে ঘুরে বেড়ায় তখন সে কি কি সুবিধে পায়। আমার তো মনে হয় মহিলাটি এভাবে নিজেরই ধ্বংস সাধন করে। এ-পথে এগিয়ে সে অন্যের প্রণয় আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে রাখে দূরে সরিয়ে অথচ প্রেমইতো তাদের কাম্য, অন্যের কাছ থেকে শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা পাওয়াইতো একজন রমণীর সেরা প্রার্থনা। এ-ছাড়া মেয়েদের জীবনে আছেই বা কি? কিছুই নয়, অথবা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর কিছু। এটাই আমার কাছে বিস্ময় যে, মুখে গুটি বসন্তের দাগ নিয়ে তিরিশ বা তার কাছাকাছি মহিলা কখনোই কোন কিছুর শীর্ষচূড়া থেকে ঝাঁপ দিতে অক্ষম। সব যুক্তি-তর্ক সম্ভাব্য-অসম্ভাব্যতা ছাপিয়েও যেটা আমার কাছে প্রতীয়মান তা হল তেওদোর একজন রমণী, সে নারী। তা সত্ত্বেও যদি আমার ধারণা ভুল হয়, যদি সে সত্যি সত্যিই পুরুষ হয়, তাহলে বলতেই হবে এমন অনুপম সৌন্দর্য যথার্থই দর্শনীয়। কোথা থেকে পেল সে এই রূপ! কি জানি, সব কিছু অধ্যয়ন নয় তো! যদি সত্যি সত্যিই এটা নিশ্চিতভাবে আমার কাছে প্রমাণিত হয় যে তেওদোর মেয়ে নয়, তাহলে, হায় কপাল, আমি জানিনা ওকে আমি তখনো যথার্থই ভালবাসব কিনা!

এ্যাডভেঞ্চার

বন্ধু, হে আমার শোভন হৃদয়, ঠিকই করেছিলে তুমি। কাউকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসার আগে মানুষকে নিপুণভাবে জানার স্বকৃত প্রকল্প থেকে আমাকে সরিয়ে নিতে তুমি যে চেষ্টা করেছিলে সেটাই ঠিক। ভেতরে ভেতরে আমার যে ভালবাসা ছিল তা নিভে গেছে, এমন কি শেষ হয়ে গেছে প্রেমের সম্ভাবনা পর্যন্ত।
সব দিক থেকে কড়া নজর রেখেও শেষ অব্দি ভুল হয়ে গেল। ভ্রান্তিবিলাসেই ভাসিয়ে দিলেম ভেলা, তাদের বলিষ্ঠ বাহুতে দেখলাম কৌতুলোদ্দীপক দৃশ্য। আমরা বেচারী যুবতী মেয়েরা, অসম্ভব সতর্কতা সত্ত্বেও, তিন-তিন প্রস্থ সযত্ন দৃষ্টির দেয়াল তুলেও, শেষ রক্ষা করতে পারলাম না। পেশল বাহুর বলিষ্ঠ ভুবনে আমরা কোথায় চলে গেলাম !
আহ্, গ্রাসিওসা, যখন ঐ ছদ্মবেশের কথা মাথায় ঢু' মারে তখনই তিন-তিনটে বাধা-স্বরূপ অভিশাপের ভয় জেগেছিল মনে। আমি কেন জোর করে হতে চলেছি বিভীষিকা, অপযশ আর কদর্যতার সাক্ষী বলতে বা সেই সব কথাবার্তা শুনতে ! স্বল্প সময়ের মধ্যেই আমি কেমন পবিত্র আর মহার্ঘ অজ্ঞতাসম্পন্ন লাম্পট্যের দেখা পেলাম।
তোমার কি মনে পড়ে সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মায়াময় রূপসী রাত ? বাগান-বীথিকায় হেঁটে চলেছি আমরা, সেই সরু পথ, পথের প্রান্তে এক প্রস্তর মূর্তি, মৃগশাবকের হাতে বাঁশী, (নাক তার ভাঙা, আর আবৃত হয়ে আছে শাবকটি শ্যাওলায়) ডালপালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে রূপালী নক্ষত্র। বাতাসের ডানা থেকে ভেসে আসছে লতা পাতার সৌরভ, কুসুমশয্যা থেকে উড়ে আসছে সুবাস, নীড় থেকে হঠাৎ শিষ দিয়ে উঠল কোন পাখী, গেয়ে উঠল গান। আমরা, যুবতী মেয়েরা সবসময়ে যা করে থাকি কথা বলছিলাম ভালবাসা নিয়ে, কাঙ্ক্ষিত পুরুষ, বিয়ে-সাদির ব্যাপার নিয়ে। কথা বলছিলাম আমাদের দেখা নিখুঁত ভদ্রলোকটির বিষয়ে। পৃথিবীকে আমরা আমাদের মত করে ভাবতে চেষ্টা করি, যেসব কথা শুনি তার এক-একরকম অর্থ করে বুঝতে

চাই নিজের মনোমত, এমনকি এমন সব ছেলেমানুষি প্রশ্ন করে বসি একে অপরকে যা আমাদের পর্বত প্রমাণ অজ্ঞতাকেই বারে বারে জানান দিয়ে যায়। যার কোন মানে হয় না সেই সব ব্যাপার নিয়েও হই বিচলিত। কবিতা, আহ্, কবিতা কত প্রাচীন, কত আদিম! আহ আমরা, দুটি স্কুলছাত্রী কত নির্বোধ ছিলাম!

তোমার স্বপ্নের প্রেমিক ছিল এক সাহসী, গর্বিত যুবক। তুমি চেয়েছিলে তার চুল হবে কালো, থাকবে গোঁফ, হাতে থাকবে তার লম্বা অশ্বতাড়নী, উজ্জ্বল পালক, আর ঝকঝকে বিশাল তরোয়াল। তুমি চেয়েছিলে সত্যিকারের শক্তিধর যুবা, চেয়েছিলে তার কাছে বীরাঙ্গনার মতো সমর্পিত হতে, চেয়েছিলে সে তোমাকে জয় করে নিক। তোমার স্বপ্নে ছিল দ্বৈরথ, ছি মায়াবী সমর্পণ। অনায়াসেই তুমি তোমার দস্তানা সিংহের গুহায় ছুঁড়ে দেবার স্বপ্ন দেখতে, কেননা তুমি চাইছ তোমার প্রেমিক পুরুষ স্প্যানিয়ার্ড, সহজেই সেটি উদ্ধার করে দেবে তোমাকে। তখন এসব আমার কাছে বেশ কৌতুককর মনে হত। যথার্থই ব্লন্ড হলেও তুমি তখন মাত্র স্কুলের ছাত্রী, আর আমি অবাক হয়ে যেতাম বিশ্বের বাতাসে বাতাসে তুমি কিভাবে বিয়ের সৌরভ পাও। বিবাহিত জীবনের স্বপ্ন দিয়ে গড়ে নিয়েছ এই পৃথিবী।

বয়সে তোমার চেয়ে আমি ছ'মাসের বড় হলেও তোমার চেয়ে ছিলাম আমি ছ'বছরের কম রোমান্টিক। তবে একটা ব্যাপারে আমার ছিল প্রচণ্ড কৌতূহল এবং তা আমাকে সব সময়ই তাড়িয়ে বেড়াত। আমার জানতে ইচ্ছা হত পুরুষেরা কি কথা বলে, একে অপরের সঙ্গে কেমন করে সময় কাটায়, বিশেষ করে বৈঠকখানা বা থিয়েটারে তারা কেমন করে ঘন্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। ওদের জীবনের অনেক খুঁত, অনেক অস্পষ্ট দিক আমার চোখে ভেসে উঠত, আমার মনে হত ওরা অনেক কিছু গোপন করে চলে আর সেই গোপনীয়তা ভেদ করার জন্য আমার মন ছটফট করত। চাইতাম ওদের সব রহস্য উন্মোচিত হোক। বাড়িতে যখন কোন ভদ্রলোক আসতেন, আমি তখন অনেক সময় পর্দার আড়াল থেকে তাদের আলাপ-সালাপ, আচরণ ইত্যাদি লক্ষ্য করতাম। তাদের কথাবার্তায় মাঝে মাঝে পেতাম উন্নাসিকতার স্বর, দুনিয়াকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার চেষ্টাও কখনো কখনো দেখেছি, অথচ যখন তাঁরা ঘরে ঢুকতেন সেই সময় তাঁদের দেখলে এসবের কিছুই আঁচ করা যেত না। বুড়ো থেকে গুড়ো— সব পুরুষকেই মনে হত মুখোস পরে এসেছে। এরা সকলেই প্রথার দাস। পরে এসেছে প্রথার মুখচ্ছদ, প্রথাসর্বস্ব সেন্টিমেণ্ট নিয়েই এদের দিন গুজরান। বিশেষ করে মেয়েদের সামনে এদের কথাবার্তাও বড্ড সেকেলে।

ড্রয়িংরুমের কোণের দিকে একটা চেয়ারে বসে থাকতাম আমি দেয়ালের দিকে একটু ঝুঁকে। লোকজনের কথাবার্তা শুনতাম, মাঝে মাঝে বুকের উপর আঙুল বুলোতে বুলোতে পেতাম ফুলের লোভনীয় নরম স্বাদ, চোখ দুটো থাকত আনত, কিন্তু তারই ভিতর থেকে লক্ষ্য রাখতাম সব। সামনে-পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে যা যা ঘটত সবই আমার কাছে হয়ে উঠত স্পষ্ট। জানি পাশের ঘরেও ঠিক একই রকম কথাবার্তা চলত, কোথাও ছিল না নতুনত্বের স্বাদ।

আমি খুব ভালভাবেই লক্ষ্য করতাম যে বিবাহিতাদের সঙ্গে কথাবার্তার ধরন-ধারণে বা তাদের সঙ্গে আচরণে এক ধরনের পার্থক্য বজায় রাখতেন সুকলে। তাদের সঙ্গে রসিকতা চলত, কিন্তু আমাদের বেলায় সেটি জুটত না। ধীরে ধীরে টের পেলাম, সব বিবাহিতের মধ্যে এমন এক সাধারণ জিনিস রয়েছে যা অবিবাহিতাদের মধ্যে অবর্তমান। কিন্তু সেটি যে কি তা জানার জন্য আমাদের ভেতরে ভেতরে সে ঔৎসুক্য বেড়েই চলল।

আমি যে কী প্রচণ্ড কৌতুহল নিয়ে যুবকদের হাসি-ঠাট্টা কথাবার্তা শুনতাম তা তোমাকে এখন বোঝাতে পারব না। নব-দম্পতিরা চোখে চোখে কি সংকেত ব্যক্ত করে তা জানার জন্যে আমার আগ্রহ দিন দিন বরং বেড়েই চলল। নানা জনের নানা ছন্দের কথাবার্তা শুনতে শুনতে আমার বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা ব্যথা জাগে, সে ব্যথার কথা কাউকে বলতে পারিনে। হয়তো এ ব্যথাই আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমার উজ্জ্বল নীলকান্ত মণি। আমি দেখি ওরা হাসে মাঘী-পূর্ণিমার আলোয়, ঠোঁটে ঠোঁটে ফুলে ওঠে ভাষার নীরব ধ্বনি, আছড়ে পড়ে সমুদ্রের সাগ, ওদের সর্ব অঙ্গ পারিজাত ফুলের মত ফুটে ওঠে আর আমার সমস্ত জগৎ সংকীর্ণ হয়ে এমন এক জায়গায় এসে ঠেকে যেখানে আমিই কেবল একলা। কাজেই ওদের একটু আড়াল-আবডালে চোখ মেলে দেখা ছাড়া আর উপায় ছিল না। আসলে আমি একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম, ঘোরের ভিতর বন্দী ছিলাম। ওদের ভাষা আমার কাছে অশ্রুত, অজানা, তবু ওদের ঠোঁট নাড়ার ভঙ্গী দেখে বুঝতে পারি ওরা জিভে জড়িয়ে যে কথাগুলো উচ্চারণ করতে চায় তার মর্মে পেঁছিনো অসাধ্য আমার। হয়তো আমার উপস্থিতিই ওদের ঈপ্সিত সঙ্গীত সাধনার অন্তরায়। কারো কারো বুকের ভিতর হয়তো শ্বাস ফেলে ফাল্গুনী পূর্ণিমার চাঁদ, তবু আমার কোন উপায় নেই। এক সময় তাদের চমক ভাঙে, দ্রুতপদে তারাও বেরিয়ে যায় ঘর থেকে হাল-ফ্যাসানের কেতাদুরস্ত ভঙ্গিমায়।

আমার জীবনের একটা বছর এভাবে কাটালাম। প্রায়ই বুঝতাম তাদের বহু আলোচনার কেন্দ্রে স্থির হয়ে রয়েছি আমি। আমার বয়স, আমার উপস্থিতি, আমার চালচলনও তাদের আলোচনার খোরাক। দেখতে দেখতে এক সময় নিজেকে জড়িয়ে ফেলতাম দুর্বিপাকে, সন্দেহ-সংশয় জটিল আবর্তে নিজেকে বন্দী করলাম।

কদাচিৎ শুনতাম আমার প্রশংসা, আর তা কিন্তু আমাকে তেমন বিচলিত করত না, মনে তুলত না আলোড়ন। আমি যথার্থই সুন্দর কি না সেই সব আলোচনা মোটেই আমাকে নাড়া দিত না, তবু বুঝতাম আমাকে ঘিরে অনেকের মধ্যেই বহু প্রশ্ন উঁকি মারতে শুরু করেছে, আর আমিও আগন্তুকদের বহু সুরভিত কথার সৌরভে বেশ সুবাসিত হতাম।

যদি, হ্যাঁ, আমি যদি প্রেমিকা হতাম, তাহলে জানতে চাইতাম আমার প্রেমিক আমার সম্বন্ধে কি কি কথা বলে অন্যের কাছে। টেবিল ক্লথের ওপর কনুই রেখে, মগজে কিছু মদ নিয়ে সে আমাকে ঘিরে কিরকম ভবিষ্যতের ছবি আঁকে তা জানার আমি চেষ্টা করতাম।

আমি এখন জেনে ফেলেছি, জ্ঞানই আমার মধ্যে জাগিয়ে তোলে ক্রোধ। এটাই সতত ঘটে।

আমার সমস্ত ধারণাই হয়তো পাগলামো। তবু বলি, যা হয়েছে তা তো হয়েছেই, যা জানা হয়ে গেছে তা তো আর অজানা রাখতে পারব না। গ্রাসিওসা, প্রিয় আমার, তোমার কাছ থেকে আর বেশী কিছু শুনতে চাই না ; আমিই পুনরাবৃত্তি করছি, তবু কেউ কেউ যুক্তি মানতে চায় না, বিশেষ করে তোমার মত সুন্দরীর মুখ থেকে যখন কিছু বেরোয় তখন তাকে শুনতেই হয়। অথচ বুদ্ধি নিতে হয় ধূসর পাতলা চুল-অলা পাকা মাথার কাছ থেকে। ষাট বছর ধরে যে বোকা রয়েছে সে-ও কাউকে করে তুলতে পারে চালাক-চতুর।

এ ইচ্ছা আমাকে খুবই যন্ত্রণা দেয়, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারে, নিজেকে সামলাতে পারি না। স্টোভে বসানো কাজুবাদামের মতো আমার চামড়ার নিচে আমি পুড়ে যাচ্ছি। মাথার উপর ঝুলছে আমার নিয়তি-আপেল, আর তার প্রান্তভাগ আমাকে কামড়াতে হবে, আর কামড়াতে পারলেই দেখবো তা তেতো, সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলতে হবে সেটি।

আমার প্রিয়তম ঠাকুমা স্বর্ণকেশী সুবর্ণা ঈভ যেমন খেয়েছিল আমিও ঠিক তেমনি নিষিদ্ধ ফলটিতে কামড় দিলাম।

আত্মীয় বলতে আমার আর এখন কেউ নেই। একমাত্র যে কাকা বেঁচেছিলেন তিনিও গত হয়েছেন। তিনি দেহ রেখে আমায় দিয়ে গেছেন নির্বাধ স্বাধীনতা, যা খুশি করার অবাধ ইচ্ছা। ফলে এত দিন ধরে যে স্বপ্ন আমি লালন করেছি স্বযত্নে তাকে কার্যকর করতে পেলাম সুস্মিত সুযোগ। নিবিড় নিশ্ছিদ্র সতর্কতা অবলম্বন করলাম যাতে না কেউ ধরতে পারে আমার যৌনস্বরূপ। শিখলাম নিপুণতম ভঙ্গিমায় ঘোড়ায় চড়া, তরবারি খেলার কৌশল, শিখলাম বন্দুক চালাতে, অদ্ভুতভাবে পোষাক পরতে, ঢেকে ফেললাম সুন্দরী মেয়ের রূপ, শুধু পারলাম না গোঁফ গজাতে। সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বুঝে নিয়েছি আগেই, এবার স্থির করলাম শহর ছেড়ে চলে যাবো অনেক দূরে, আর ফিরব না যতক্ষণ অব্দি না আমার অভিমত পায় পূর্ণতম রূপ।

কোন প্রেমিক আমাকে কিছু শেখায়নি, আপন বোধেই চিনতে চেয়েছি পুরুষদের, তাদের সম্পর্কে করেছি গভীর অধ্যয়ন। হ্যাঁ, চেয়েছি তাদের পুরোপুরি চিনতে, চেয়েছি ওদের প্রতিটি কোষ টুকরো টুকরো করে দেখতে, ফালা ফালা করে চিরতে চেয়েছি ওদের আবেগ-অনুভূতি, ইচ্ছা-অনিচ্ছার ভুবন। তাদের দেখতে চেয়েছি একা একা, কেননা নিঃসঙ্গ অবস্থায় মানুষকে যেভাবে চেনা যায় ভিড়ের মধ্যে সেভাবে নয়। জনতার মাঝে তার ব্যক্তিসত্তার অনেক কিছু হারিয়ে যায়, অনেক কিছুই গোপন থাকে। ফুলের বাগানে যেমন প্রতিটি ফুলের প্রতিটি পাপড়িকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে চেনা দুঃসাধ্য, তেমনি জনকোলাহলে মানুষকে পুঙ্খানুপুঙ্খ চেনা সত্যিই দুরূহ। ছদ্মবেশ নিয়ে আমি যেকোন জায়গায় বিনা নোটিশেই যেতে পারি, কোন কিছুই আমার কাছে আর অসম্ভব নয়, দেখতে দেখতে আমার ভিতরে এলো আত্মবিশ্বাস, মিথ্যাকেও সত্য

বলে চালাতে ভালো গভীর আস্থা। হায়রে রমণী। তুমি শুধু পুরুষের রোমান্স জানতে চাইলে, চাইলে না তাদের ইতিহাস!

যারা আমাদের ভালবাসে, আর যাকে আমরা বিয়ে করি তাদের মধ্যে কতই না তফাৎ। উভয়ের জীবনযাপন, ধ্যান-ধারণার মধ্যে যে কি বিশাল ফারাক যদি জানতে পারতে। সত্যিই এ এক ভয়াল অজ্ঞতা আমাদের। তাদের আসল স্বরূপটি আমাদের কাছে চিরকালই অজ্ঞাত, মনে হয় তারা শনিগ্রহের বাসিন্দা, অথবা অন্য কোন গ্রহের অধিবাসী। তারা একেবারে অন্য প্রজাতির অন্তর্গত। আমার মনে হয়, পুরুষ আর নারীর মধ্যে নেই কোন মানবতার বন্ধন, একের গুণ অন্যের ত্রুটি, একের মহত্ব অন্যের পাপ, আর এই বৈপরীত্যের জন্যেই পুরুষ এত মর্যাদা দেয় নারীকে, এরই জন্য পুরুষকে শ্রদ্ধা করি, রমণীকে সম্মান জানাই।

এক ঝলকেই স্বচ্ছ হয়ে ওঠে আমাদের জীবন। বাড়ি থেকে স্কুল, আর স্কুল থেকে বাড়ি—এ জীবন সহজেই অনুসরণযোগ্য। এর মধ্যে নেই কোন রহস্য, নেই কোন দুর্জ্ঞেয়তা। আমাদের সুর মূর্ছনা আর রোমান্স অনায়াসেই রূপ নেয় কাঙ্ক্ষিত শীতলতায়। মায়ের সাজানো পোষাক পরেই আমাদের কাটত দিন, আর রাত ন'টা বা দশটার সময়ে আমরা জ্যোৎস্নার মতো ধবধবে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়তাম, পরের দিন সকাল না হওয়া অব্দি আমরা কেমন অনায়াসেই না তালাবন্দী থাকতাম। এ সময়ের মধ্যে কারো মাথায় কিছু মাত্র সংশয়ের মেঘ এসে জড়ো হত না, কোন ব্যাপারেই কেউ দেখত না সন্দেহের সামান্যতম ছায়া।

স্বল্পতম স্ফটিকও এ রকম জীবনের মত স্বচ্ছ নয়।

পুরুষরা যদি আমাদের ব্যাপারে অধিক আগ্রহী হত তা হলে সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত থেকে তারা আরেকভাবে দেখতে অভ্যস্ত হত। আমাদের জীবনটা যেন জীবনই নয়। তাদের কাছে এ যেন কিছু সব্জি-টব্জি, এ যেন শ্যাওলা বা ফুল। গোলাপ কুঁড়ির ওপর জমে থাকা তুষার যেমন মেলে ধরতে দেয় না গোলাপের রক্তরাগ দ্যুতি, তেমনি আমরাও কেন জানি হতে পারি না প্রস্ফুটিত। আমাদের প্রধান কাজ হল মেলে ধরা। অথচ আমাদের নিয়তি হল সলাজ নয়নে আনত হওয়া। আমরা ধরেই নিই ওদের হাতে চাবি দেওয়া কলের পুতুল যেন আমরা।

কিছু জিজ্ঞেস করলে 'হ্যাঁ' 'না' মাফিক কথা বলতেই অভ্যস্ত। ভুলে গেছি ওদের আলোচনার মধ্যে নিজেদেরও পুরোপুরি মিশিয়ে দিতে, অংশ নিতে। যখনই কোন আকর্ষণীয় আলোচনা শুরু হয় তখনই আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় কোন বুড়ো সঙ্গীত-শিক্ষকের কাছে বীণা বাজাতে। হয়তো সে বৃদ্ধ মাষ্টারমশাইয়ের ফুসফুস থাকে তামাকের মারাত্মক ধোঁয়া। আমাদের বৈঠকখানাগুলোয় যে সব মডেল শোভা পায় তাতে ফুটে ওঠে না যথাযথ শারীরস্থানের নিপুণতা, বরং তা আবছা, অস্পষ্ট ধারণাপ্রসূত।

রোমান্টিক ইচ্ছাগুলোকে খর্ব করতে করতে আমরা এক একটা গাড়ল বনে যাই। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাও কিছু শেখায় না, শুধু শেখায় জ্ঞানের আলো থেকে তফাৎ

যাও।

দেহে আর মনে আমরাই সত্যিকারের বন্দী। অথচ একজন যুবকতো সারারাত অনায়াসেই বাইরে কাটিয়ে আসতে পারে, ইচ্ছেমত নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারে আনন্দ সাগরে, প্রাণভরে ওড়াতে পারে অর্থ। এভাবেই কি সে তার চাকরির সার্থকতা নেবে? সারা দিন রাত পুরুষ যা যা করে, যেভাবে কাটায় তা কি কখনো তার দয়িতাকে বলে? না, বলে না। এমনকি যারা খাঁটি সত্যবাদী বলেও বিবেচিত তারাও সব কথা বলে না।

শহর থেকে কিছুটা দূরে আমার যে ছোট্ট খামার আছে সেখানে পাঠিয়ে দিলাম আমার ঘোড়া, কাপড়চোপড়। হৃদয়ের গভীরে ডুব না দিয়েই আমি বদলে নিলাম নিজেকে, হয়ে উঠলাম সুসজ্জিত, চেপে বসলাম ঘোড়ায়, এর জন্যে আমার একটুও দুঃখ হল না, পেছনে পড়ে রইল না কিছু। না রেখে গেলাম আত্মীয়-স্বজন, না বন্ধু-বান্ধব, না রাখলাম একটা কুকুর বা একটা বেড়াল। তবে একটা দুঃখ ঠেলে আসছিল গলায়, চোখ দিয়ে প্রায় জলই গড়িয়ে আসছিল। আর এই যে খামার, এখানে আজ পর্যন্ত মাত্র পাঁচ-ছবার এসেছি, ঘুরে ফিরে দেখেছি গাছের ফাঁক দিয়ে নীলচে ধোঁয়ার রাশি, কিন্তু এ খামার আমার মন হরণ করতে পারেনি কখনো।

আমি বদলে নিলাম আমার পোষাক, পড়ে রইল স্কার্ট ইত্যাদি। বিশ বছর ধরে যেসব পোষাক পরতে আমি ছিলাম অভ্যস্ত, যে সব পোষাক পরে যেতাম জনতার মাঝে, আজ থেকে তা ছেড়ে-ছুড়ে দিলাম। যে ঘরের দরজায় লেখা থাকত এখানেই থাকতেন 'মাডেলিন দ্য মপ্যাঁ' এখন থেকে আর সে সেখানে থাকবে না। মপ্যাঁ হারিয়ে গেছে, তার জায়গায় এসেছে তেওদোর দ্য সেরানস। না, আর কেউ ডাকবে না আমাকে সেই মিষ্টি নাম ধরে, ডাকবে না মাডেলিন বলে। মাডেলিন নামের কোটরে এখানে বাসা বাঁধছে তেওদোর, মাডেলিন হয়ে যাবে স্মৃতি, হারিয়ে যাবে এই নাম অন্ধকার অতলে। এখন থেকে সত্য হয়ে উঠবে তেওদোর, এখন থেকে পরিচিত হবে তেওদোর বলেই।

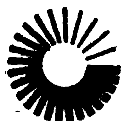
যে ড্রয়ার ছিল বিশ বছরের মেয়েটির অধীনে, এখন সেটি হয়ে পড়ল পরিত্যক্ত। সে ড্রয়ার এখন শুধু মায়া, স্বপ্ন স্মৃতি। হ্যাঁ আমি এখন একজন মানুষমাত্র, পুরুষ শুধু, অন্তত বহিরঙ্গে আমি যুবা-পুরুষই। যুবতী মেয়েটি আর নেই, সে মৃত—মৃত—মৃত।

খামারের মাঝখানে যে বিশাল বাদাম গাছটার ঝাঁকড়া মাথা দেখা যেত দূর থেকে সেটি আর দেখা যাচ্ছে না, আমিও আর নই সেই আমি, এ আমি বদলে যাচ্ছি, এ আমি নতুন করে শুরু করছি নতুন জীবন, রপ্ত করছি নতুনতর আদবকায়দা, এ যেন কোন পড়ে-ফেলা পুরনো গল্পের বই আবার নতুন করে পড়তে শুরু করা।

পুরনো সব দিনের কথা মনে ভেসে উঠছে। স্মৃতির পাহাড় বেয়ে উঠে আসছে ছেলেবেলার হাজার রুপোলি দিন। ভেসে আসছে কত সব ফালতু কথা। মনে পড়ছে আমার পুরনো হাঁটাচলার ভঙ্গি, মনে পড়ছে কিছু দিন আগেও যখন রাস্তা

দিয়ে হাঁটতাম তখন কত যুবকই না আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করত, দূর থেকে অনেকে ছুঁড়ে দিত চুমো। কল্পনায় তারা হয়তো চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিত আমায়। ঘোড়াটাকে চাবুক মারলাম। তীরের বেগে ছুটল সে। ডাইনে বাঁয়ে গাছ-পালাগুলো সাঁ সাঁ করে উড়ে চলে যাচ্ছে, আমার যেন কোন দিকে তাকাবার ফুরসৎ নেই, তবু কানে ভেসে আসছে একটা ডাক, কারা আমাকে ডাকছে, রাস্তার পাশ থেকে কে যেন আমার পুরনো নাম ধরে ডাকছে, বাতাসে বাতাসে পাক খাচ্ছে আমার নাম, 'ম্যাডেলিন, ম্যাডেলিন!'

এগিয়ে চলেছি। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে গানের কলি, কাকার জন্ম দিনে যে গান আমি শিখেছিলাম তার সুর এখনো লেগে রয়েছে কাণে, দেখতে দেখতে ছুটে যাচ্ছে ঘোড়া, ঐ যে বাড়িটার জানলায় ঝুলছে পর্দা তাতে কি আমার হাতের ছোঁয়া রয়েছে? বারবার পুরনো কথাগুলো মনে পড়ছে। মনে পড়ছে নানা রঙের স্মৃতি। হায়রে, স্মৃতি বড়ো দুঃসহ, বড়ো অসহ্য। নতুন ভবিষ্যতে পেঁছিনোয় সে এক দুরন্ত বাধা। একটা অস্বস্তি আমার বুকের ভিতর ঠেলে উঠল। দু-তিনবার সে সময় ঘোড়াকে উল্টো দিকে ফেরাবার কথা ভেবেছি, মনে মনে বলতে চেয়েছি, ফেরো, ফেরো তুমি ম্যাডেলিন।



কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার কে যেন কাণে ফিসফিস করে বলে গেল, "না ফিরো না। এগিয়ে চলো তেওদোর, এগিয়ে চলো। সামনে তোমার উন্মুক্ত প্রান্তর, হাজার সুযোগ। আজ যদি তুমি না শেখো তাহলে আর কোনদিনই কিছু শিখতে পারবে না। তেওদোর মনে রেখো ছুটে চলার মধ্যেই অনাবিল আনন্দ। শুধু ধাও, শুধু ধাও, উদ্দাম উধাও, ফিরে নাহি চাও। চরৈবেতি, চরৈবেতি। এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। আর চলতে চলতে প্রথম যাকে পাবে, যাকে মনে হবে সম্ভ্রান্ত, হৃদয়বান তার সঙ্গেই বন্ধুত্ব পাতাও। তেওদোর! পুরুষ মানুষ বড়ো ভয়ংকর বড়ো রহস্যময়। সব কিছু গোপন রাখার অসম্ভব ক্ষমতা তাদের হস্তগত।"

ঘোড়ার গতি আরো বাড়িয়ে দিলাম। ঝড়ের বেগে ছুটে চলল সে। বন বাদাড়

এগিয়ে চললাম আমি। মাঝে মাঝে পড়ছে ঘন ঝোপঝাড়, পড়ছে দৈত্যর মতো বিশাল গাছ। কোথাও বা অন্ধকার রয়েছে থমকে দাঁড়িয়ে, গা ছমছম করা অন্ধকারে পাতাল পুরীর ভয়ের রাজ্য ভেসে ওঠে বুকের ভিতর। শিউরে উঠলাম আমি, মনে হল কে যেন পিস্তল নিয়ে তাক করে রয়েছে আমার দিকে। আমায় কি গুলি করবে? না, নিজেকে সামলে নিলাম। ভূতের ভয় আমার কোন কালে ছিল না, অথচ কেন জানি চারদিকে থেকে আজ হামলে পড়ছে ভয়, খুবলে নিতে চাইছে আমার সাহস। কিন্তু ভয় পেলে তো আমার চলবে না। সাহসে বাঁধলাম বুক; ভয়কে বললাম দূর হঠো। অভিনয় শেষে যেমন মঞ্চে নেমে আসে পর্দা তেমনি সূর্যের স্বর্ণশোণিমা সমতলে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে দিল, গোধূলি সমাগত। খরগোস আর বিচিত্রতর পাখীগুলো মাঝে মাঝেই ছোটাছুটি—ওড়াউড়ি করছে, ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে, দূরের বস্তু সব রক্তিম হয়ে দেখা দিল। আকাশের গায়ে কোথাও কোথাও ধূসর আতার রঙ, কোথাও লাইল্যাকের মৃদু আভা, কোন কোন অংশে বাতাবী লেবুর সবুজ; কোথাও বা কমলা রঙের ছোপ। আকাশের এ-এক বিচিত্র রূপময় ছবি। দেখতে দেখতে ডেকে উঠল রাতের পাখী, শিস দিল, নিভে গেল দিনের শেষ আলো, এলো অন্ধকার, বাঘের থাবায় নিচে যেমন থাকে ভয়াল রাত তেমনি গাঢ় শ্লেট রঙের আঁধার নামল। ভেসে এলো ঝিঁঝিঁর সুর, অরণ্যের ভিতর থেকে নানান ধ্বনি। যে-আমি একা কোন দিন রাতে বেরোইনি, সে কিনা এমন গহীন অরণ্যের মধ্য দিয়ে চলেছে একা একা! ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলাম রাত আটটা। উফ্‌! সে কি ভয়াল অভিজ্ঞতা। গ্রাসিওসা, কল্পনা করতে পারো কি আমার তখন মনের অবস্থা কেমন। ভয়ে আমি বিহ্বল, হৃদস্পন্দন বেড়েই চলল। শেষ পর্যন্ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আহ্‌, সে কি শান্তি, কী আনন্দ। বাগানের শেষ সীমায় প্রায় পেঁছে গেছি। দূরে দেখা গেল আলোর রেখা, নক্ষত্রের মতো শহরের আলোক বিন্দু দেখতে পেলাম, ধীরে ধীরে ভয় খসে গেল, সরে গেল। আলোর নক্ষত্রগুলোকে মনে হল আমার বহু বন্ধুর চোখ; যেন সেই চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে।

এতক্ষণ বাদে ঘোড়াটাও যেন প্রাণ ফিরে পেল। তার আনন্দও আমার চেয়ে কোন অংশে কম হল না। সে গন্ধ পেল অশ্বশালার। স্বজাতির গন্ধ পেয়ে সে উদ্বেলিত হল। লায়ন রোজ হোটেলে সে সটান আমাকে নিয়ে গেল।

সরাইখানার জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল আলোর রেখা। অশ্বরক্ষকের কাছে ঘোড়ার দায়িত্ব দিয়ে আমি ভিতরে গেলাম, গেলাম সোজা রসুইখানায়।

লাল আর কালো চোয়াল নিয়ে অনেকগুলো উনুন দেখলাম। দেখলাম দু-দুটো বিশাল বিশাল থলথলে কুকুর। আমাকে দেখে তারা হাই তুলল, কিন্তু তেড়ে এলো না। বরং আমাকে তেমন আমল না দিয়ে গুটিসুটি মেরে আগুনই পোয়াতে লাগল। ভাবলাম, কুকুরগুলো পর্যন্ত আমাকে ভ্রূক্ষেপ করে না। ওদের কাছে গেলাম, আদর করার মতো লোমশ গায়ে একটু চাপড় দিলাম; কিন্তু না; কোন কিছুতেই ওদের রা নেই। অবাক লাগল আমার; অথচ আমাকে দেখলে আগে সব

জন্তুই কাছে এগিয়ে আসত।

সরাইখানার মালিকটি এবার এগিয়ে এলো আমার কাছে। জানতে চাইল কি কি দিয়ে নৈশভোজ সারব। কাঠাল গাছের গুঁড়ির মতো ভুঁড়ি সর্বস্ব এই গোলগাল মানুষটা দেখতে অদ্ভুত। নাক তার লাল, কটা চোখ আর মুখের প্রকাশভঙ্গি তার বিচিত্র [illegible] ছানা। প্রতিটি কথাই সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল। দেয়ালে ঝুলিয়ে সাদা বড়ো বড়ো কিচেন-ছুরিগুলোর সামনে ওর এমনতরো উপস্থিতি আমাকে বেশ ভয় পাইয়ে দিল, এগুলো হয়তো নানান উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হয়। আমি বললাম, কি কি চাই। সে কথা শুনেই একটা কুকুরকে কষে লাথি মারল। ক্যঁক করে উঠল জন্তুটা। তারপর এক চক্কর ঘুরে নিল। আমার দিকে একটু অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে লোকটি অন্যদিকে চলে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম ঠায়, কোনদিক থেকেই কোন কিছুর আশা দেখলাম না। মনে হল এ সময় এসে ওদের আমি বড্ড ঝামেলায় ফেলেছি। মনে মনে ঠিক করলাম, ওদের উপযুক্ত বখশিস দিতে হবে। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রান্নাঘরের দিকে ফের তাকালাম।

ঘরের সিলিং-এ তাকালে দেখা যায় আড়াআড়ি ওকের কড়িকাঠ, আর তার রঙ চুল্লি ও লণ্ঠনের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় হয়ে রয়েছে কালো। তাকে সাজানো রয়েছে নীল, রুপোলি, বাদামী রঙের বাহারী বাসন কোসন। দেয়ালগুলো চিত্রিত, খাবার ঘরে বিরাট টেবিল, আশপাশে দুজন চাকর ঘোরাফেরা করছে, সাজাচ্ছে কাপ-প্লেট, কাঁটা, ছুরি, ওদের নাড়াচাড়ার শব্দে ভেসে আসছে ক্ষুধার সুর, পেটের মধ্যে নাড়ি-ভুঁড়ি তালগোল পাকিয়ে যেন হাঙর-খিদে নিয়ে অপেক্ষা করছে কখন খাবার আসবে। মোটামুটি ভাবে সরাইখানাটা ছিমছাম, আরামদায়কও বটে। মালিকটিকে যতই হোৎকা বলে মনে হোক না কেন, এর ব্যবস্থাপনা মোটের ওপর মন্দ নয়। মাঝে মাঝে আমার প্রাচীন কালের গ্রীক-রোমান পরিবেশের ছবি ভেসে উঠছিল মনে। বাইরে এখন বৃষ্টি পড়ছে, বইছে দামাল বাতাস। ছাট আসছে জানালা দিয়ে, বেশ লাগছে এখন এ রকম পরিবেশ, আবহাওয়া। ঝড়ের রাতে এ আমার আশ্চর্য অভিসার।

এই পৃথিবীর কোন লোকই আমাকে এখন চিনতে পারবে না—ভাবতে ভাবতে হাসি পাচ্ছিল। সত্যিই তো, কেউ ভাবতেও পারবে না মাডেলিন তার উষ্ণ সুখশয্যা ছেড়ে, ঘুমোতে যাবার সময় যার হাতে থাকত উপন্যাস, যে বালিশের নিচে বই রেখে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ত, পাশের ঘরেই হয়তো যার প্রেমিক থাকত শুয়ে, বা শুয়ে থাকত কোন দাসী—যে একটু মাত্র শব্দেই জেগে উঠত, ছুটে আসত উৎকণ্ঠায়, সেই মাডেলিন—সুন্দরী যৌবনবতী মাডেলিন কিনা বাড়ি থেকে প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দূরের এক মফঃস্বলী সরাইখানায় খড়ে ঠাসা চেয়ারে বসে আছে!

হ্যাঁ, মাডেলিন আর নেই, নেই তার অবশেষ। যেমন হারিয়ে গেছে তাদের স্কুলের বান্ধবী, তেমনি সেও হারিয়ে ফেলেছে তার অস্তিত্ব। ব্যালকনি বা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে যে দেখত সীমাহীন আকাশ, যে পেত যুঁইফুলের সুবাস, যার চোখে থির থির করে কেঁপে উঠত সমতলের শোভা; রূপ মেলে ধরত গোলাপ বাগান; অঙ্গে

অঙ্গে শিহরণ তুলত রজনীগন্ধা বায়ু সেই মার্ডোলিন আর নেই। সে গড়তে পারে নি কোন স্বপ্নের মিনার, বানাতে পারেনি কল্পনার রাজকুমারকে নিয়ে স্বপ্নমদির রাজ প্রাসাদ। তোমার সুশ্রী স্বপ্নের মতো কোন স্বপ্নের পেছনে সে ছুটে বেড়ায় নি। কোন মানুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করার আগে সে জানতে চেয়েছে মানুষের মন, সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে, সেই মানুষের হৃদয় মেপে দেখতে চেয়েছে সে। সব কিছুই সে এসেছে ছেড়ে ছুড়ে,—সে ফেলে এসেছে তার ঝলমলে ভেলভেট, রেশমী পোশাক, কণ্ঠহার, অলঙ্কার, ফেলে এসেছে পাখী আর ফুল। স্বেচ্ছায় অস্বীকার করেছে তার প্রতি অন্যের বিনম্র-ভালবাসা, অস্বীকার করেছে আপন বুকের অমৃত কুম্ভের মাদকতা। অনায়াসেই সে ছেড়ে চলে এলো ওই চন্দন যার অঙ্গের বাস তাম্বুল বন কেশ, সহজেই ছেড়ে দিল রত্নখচিত পোশাক। একদিন যে নিজেকে মনে করত তোমার চেয়েও সুন্দরী, সাজসজ্জাই ছিল যার বহু সাধনার ধন, যার নামের মধ্যে ছিল রমণীয়তার চরম উৎকর্ষ—অনিন্দ্য সৌন্দর্য, একই সঙ্গে যে ছিল কবিতা কল্পনালতা ও ও শৌর্যের মধুর উজ্জ্বলতা, যে ছিল পৃথিবীর তাবৎ ভুষণে ভুষিত, সেই যুবতী মার্ডোলিন সব কিছু পরিত্যাগ করে জীবনের জ্ঞান নেবার তাগিদে বেরিয়ে পড়েছে একা একা।

এ সব একদিন জানতে পারলে লোকে বলবে মার্ডোলিন পাগল ছিল, সে উন্মাদিনী। গ্রাসিওসা, প্রিয় আমার, তুমিও হয়তো মনে মনে এ রকম কথাই ভাবছ। কিন্তু বন্ধু, আমার মনে হয় সেই সব রমণীই উন্মাদ যারা না জেনে শুনেই হাওয়ায় ভাসিয়ে দেয় আপন আত্মা। একটা বীজ অন্তত একটা গাছের জন্ম দিতে পারবে কি না, না জেনেই যারা এলোমেলো ভাবে পাথরে-পাহাড়ে আপন ভালবাসার বীজ বুনতে চায়, আমার মতে সেই সব রমণীই হল আসল পাগল।

অন্তর সম্পদে সমৃদ্ধ না হওয়া সত্ত্বেও কাউকে ভালবাসব—এ যে ভাবতেই পারি না। উফ্, গ্রাসিওসা এ যে ভয়ংকর দাঁতাল ভাবনা। পাপবিদ্ধ চোখে আমার নিষ্পাপ আত্মাকে শুইয়ে দেবো ভাবলেই শিউরে উঠি। না, না, না, এ যে অসম্ভব। জানি, নদীর স্রোতে জলের সঙ্গে কাদা থাকে, কিন্তু একটু থিতোলেই কাদা নিচে পড়ে যায়, জল স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, কিন্তু সেই স্বচ্ছতা কখনো স্ফটিকের মতো আর হয় না। ভেবে দেখো, কোন মানুষ তোমাকে স্পর্শ করল, চুমু খেল, তন্ন তন্ন করে তোমার শরীর দেখল, তারপর সে হয়তো বলল, "ও ও রকমই দেখতে মোটামুটি, কোন বিশেষ স্থানে রয়েছে ওর বিশেষ চিহ্ন, ছায়ায় আবৃত তার আত্মা, এ-একারণে সে হাসে আর ঐ ঐ কারণে সে কাঁদে, তার স্বপ্ন আসে আর যায়, এই আংটি হল ওর কেশস্মারক, তার হৃদয়ের ভাঁজে ভাঁজে রয়েছে নানান চিঠি, সে এমনভাবে আমার দিকে তাকায়, এমনভাবে যত্ন নেয় যে ওটাই হল তার ভালবাসার স্বাভাবিক প্রকাশ।"

আহ্, ক্লিওপেট্রা, এখন আমি বুঝতে পারি কেন প্রতিদিন ভোরে তুমি তোমার পূর্ব-রাতের প্রেমিককে হত্যা করতে। আমার মধ্যে যথেষ্টই ছিল অভিশাপের অভাব তাই দেখতে পেয়েছিলাম চাপা নিষ্ঠুরতা। ওগো আনন্দদেবী, মানুষের স্বভাবচরিত্র

বিষয়ে তোমার যে কী গভীর জ্ঞান ছিল তা বুঝতে পারি বর্বর উন্মাদনার মধ্যে। জানি, তুমি কাউকেই জীবন্ত থাকতে দাও না। পাছে তোমার শয্যার সকল গোপনীয় প্রকাশ হয়ে পড়ে, তোমার অগ্নিক্ষরা ওষ্ঠ থেকে উচ্চারিত প্রেমের সংগীত কেউ যেন পুনরুচ্চারণ না করে। একই কথা দ্বিতীয়বার বলা যায় না। এ কারণেই তুমি তৈরী করে রেখেছ তোমায় ঘিরে মায়াবী ভুবন। যে পুরুষটি প্রতিটি মিনিটে মিথ্যের বেসাতি করে, প্রিয়তম নারীর সঙ্গেও করে অনুরক্ত প্রণয়ীর অভিনয়, যার চরিত্রে হাজার হাজার নিঃসন্দিগ্ধ নীচতা আর তুচ্ছতার সমাবেশ, যা ভালবাসা বলে মনে হয়, দেখা যায় ঝাড় লণ্ঠনের আলোয় তার রূপ কি ভয়ংকর, কুৎসিত, যাকে দেখলে মনে হয় স্বপ্নের নায়ক—রোমান্টিক পুরুষ, বাস্তবে সে হল সত্যিকারের গাদ্যিক, রূঢ়। ক্লিওপেট্রা, তুমিই চিনতে পেরেছিলে পুরুষদের; আহ্, সুন্দরীতমা ক্লিওপেট্রা, যাদুকরী ক্লিওপেট্রা, তুমিই ওদের ফালাফালা করে দেখেছ ওদের রূপ আর স্বরূপ।

না; আমার মধ্যে নেই সেই ক্লিওপেট্রার মায়াবী ক্ষমতা। যদি থাকতও সম্মোহনী বিদ্যা তবু আমার পক্ষে তা ব্যবহার করা সম্ভব হত না। সে শক্তিই আমার নেই। আমি পারব না ক্লিওপেট্রার মতো আমার প্রেমিককে খুন করতে, পারব না আমার বিছানা থেকে উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব-রাতের শয্যাসঙ্গীকে হত্যা করতে, বরং প্রেমিক হিসেবে কাউকে মনোনীত করবার আগে তাকে বাজিয়ে দেখব বারবার, অন্তত দুবার তাকে ঝালিয়ে নেব বিশেষ নজরে। দরকার হলে দুবারের বদলে তিন-তিনবার তাকে পরীক্ষা করে দেখব। যদি আমার প্রার্থিত পুরুষের কোন কথাবার্তায়, আচার আচরণে কখনো ব্যথিত হই, দুঃখ পাই, তবু চট্ করে তাকে বিদেয় দিতে পারব না। অন্তত নতুন কাউকে খুঁজে না পাওয়া অব্দি নূতনতর স্বপ্নের ভূমি না পাওয়া পর্যন্ত আমি ছাড়তে পারব না আমার প্রথম প্রেমিক। জানি, উপন্যাসে যে সব নায়ক, যে সব হৃদয়বান বিশুদ্ধ প্রেমিকের কথা লেখা থাকে বাস্তবে তা কখনো সম্ভব নয়। তেমনি খাঁটি মানুষ, সুন্দরতম হৃদয় কখনো খুঁজে পাওয়া যায় না, যাবে না।

বাইরে ঝড় উঠেছে প্রচণ্ড। সোঁ সোঁ বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝরছে বৃষ্টি অনেকগুলো ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন সরাইখানায়। ঝড়ের জন্যেই হয়তো তাঁদের বেড়ানোয় দাঁড়ি টানতে হচ্ছে এখানে। সকলেই বেশ সৌম্যদর্শন যুবক। সবচেয়ে যিনি বড়ো তাঁরও বয়স তিরিশের বেশী নয়। পোশাক-আশাকে বেশ বোঝা যায় ওঁরা খুবই অভিজাত পরিবারের, এবং আদব কায়দায় সেটি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একজন কি দুজনের মুখের গড়নটা সুখকর, অন্যদের মোটামুটি। কথাবার্তায় খুবই উচ্ছল, প্রাণবন্ত।

তাঁরা আমাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন। হয়তো মেয়ে বলে মনে করছিলেন। হঠাৎ টের পেলাম, ওদের কথাবার্তার সুর কেমন বদলে গেছে। বলাইবাহুল্য, আমিও ওঁদের প্রতি কৌতুহলী হয়ে উঠছিলাম। এবং সেটা ওঁরা বুঝেছিলেন ভালমতই। ওঁদের কথাবার্তার মধ্যে লেগেছে এবার সংযমের রেশ; চোখের কোণে লেগেছিল আলতো হাসির আলো। সুনির্বাচিত শব্দচয়নে ওঁদের কথাবার্তায় ফুটে উঠত কুসুমমঞ্জরী।

কথাগুলো বেশ ঝলমলে, যেন ভেলভেট বা সাটিনে মোড়া। এমন জায়গায় আমি বসেছিলাম, যাকে এককথায় বলা যায় ঘরের কেন্দ্রস্থল। বিশেষ ভঙ্গিমায় বসে থাকা আমার চেহারাটা ও'দের যে মনে ধরেছে তার আঁচ পেয়েছি ঢের আগেই। নিজেও মনে মনে ভেবেছি সুন্দরী যুবতীর বদলে আমাকে ছিমছাম কান্তিময় যুবক বলেই নিশ্চয় মনে হচ্ছে।

স্বীকার করছি, আমাকে ওঁদের মনে ধরেছে। আর আমিও ক্ষণিকের জন্যে ভুলে গিয়েছিলাম যে আসলে আমি মেয়ে, শুধু মাত্র ছেলের পোষাক পরেছি। পরমুহূর্তেই অবশ্য সে ভুল শুধরে নিতে দেরি লাগেনি। মনে হয়েছে ও'দের সঙ্গে বরং একটু কথা বলি। ভেবেছি, আলাপটা সেরে নিলে ক্ষতি কি!

তবু পারিনি। ভেতরে ভেতরে কেন জানি গুটিয়ে গেছি। চুপচাপ বসে রইলাম চেয়ারে। হাত দুটো ভাঁজ করে দু'গালে ঠেকিয়ে রাখলাম, যেন কিছু চিন্তা করছি। অপলকে তাকিয়ে রইলাম রান্নাঘরের দিকে, দেখছি ছাড়ানো মুরগীটা কেমন করে লালচে বাদামী হচ্ছে, দেখছি পাশের হতভাগ্য কুকুরটা কেমন চকচকে চোখে সেদিকে তাকিয়ে।

এক সময় আমার পাশে এসে দাঁড়ালো আগন্তুক দলটির সর্ব কনিষ্ঠ সদস্যটি। সে হাসল। আমাকে জানাল যে যদি আমার আপত্তি না থাকে তাহলে ওদের সঙ্গে একত্রে ভোজন সারতে পারি। এ-ও জানাল যে একা একা বসে খাওয়ার চেয়ে দলে বসে খেলে খাওয়াটা বেশ যুৎসই হয়। এভাবে যে আমাকে প্রস্তাব করবে তা কল্পনাও করতে পারিনি। আমি সম্মতি জানালাম। এক সময় সাপার এলো, আমিও ভিড়ে গেলাম ওদের দলে, খাওয়া শুরু হল।

কুকুরদুটো এক সময় বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ করল। ওরা হয়তো ওদের ভাগ্যকে ধিক্কার জানাল।

খেতে খেতে অল্পস্বল্প কথা হল। ওঁরা সকলে—জায়গায় যাচ্ছেন, সেখানে ওঁদের জন্যে অপেক্ষা করছে অন্যান্য বন্ধুরাও। আমিও আমার কিছু পরিচয় দিলাম। দেখতে দেখতে আলাপ বেশ জমে উঠল। আমি বললাম যে সবে মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাড়া পেয়েছি। এবার যাব এক আত্মীয়ের বাড়ি। এ-কথা সে-কথা হল। এক সময় ওরা জানতে চাইল আমার কোন মিসট্রেস আছে কিনা। বললাম, নেই। সঙ্গে সঙ্গে ওরা হো হো করে হেসে উঠল। হাসির ছড়্‌রায় মুহূর্তের জন্যে নিজেকে বিব্রত বোধ করলেও সামলে নিলাম। ওরা দেখি ঢক ঢক করে সাবাড় করছে একের পর এক গ্লাস। অথচ অনভ্যস্ত আমি কেমন করে যে ওদের সঙ্গে তাল মেলাব ভেবে পাচ্ছিলাম না। খেতে খেতে স্বাভাবিক ভাবেই এলো মেয়েদের প্রসঙ্গ। এ-ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটে থাকাটা ঠিক মানায় না তাই তাতে যোগ দিলাম পুরো মাত্রায়। তা ছাড়া এ ব্যাপারটা এমন কিছু দুরূহও নয়। আমি দেখেছি পুরুষেরা যখন একটু নেশার মাত্রা চড়ায় তখন তারা ধর্ম টর্ম বা সৌন্দর্যতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার পরই মেয়েদের ব্যাপার স্যাপার নিয়েই গুলতানি করে বেশী।

আমার নতুন বন্ধুরাও এখন মাতাল। তারা নিজেদের সঙ্গে করেই এনেছিল মদ তবু তাদের আলোচনায় নৈতিক দিকটা কখনো ছোট হয়ে দেখা দেয়নি। ওদের হাব-ভাবে, মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছিল ওরা দারুণ বেহেড। ওদের মধ্যে একজন, একেবারে হঠাৎই, ডান হাতটা দিয়ে একজন পরিচারিকাকে আমুদে ঢঙে জড়িয়ে ধরল, আর একজন তো শপথ করেই বসল সে চুমু খাবেই। শপথ করেই ক্ষান্ত হল না, চুমুতো খেলই, উপরন্তু এমনভাবে ওর গলা জড়িয়ে ধরল যে পরিচারিকাটি ঠিক এসময়ে কি করবে বুঝতে পারল না। সেই লোকটি ওর ঘামে ভেজা জবজবে গলা, দুটি পাহাড়-চুড়োর মতো বুকে এমনভাবে হাত ঘষাঘষি শুরু করবার চেষ্টা করল যে পরিচারিকাটির লাল মুখ আরও লাল হল, এবং সে ত্রস্তভাবে তার বুক থেকে হাতটা ঝটকা মেরে সরিয়ে দিল। লোকটি খিল খিল করে হেসে উঠতেই মেয়েটি গলায় হাত বুলিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। না, বুকের ওপর ঝুলে থাকা সোনার ক্রশটি ঠিকই আছে। লোকটি সত্যিই অদ্ভুত। এমন ভাব দেখাল সে যেন তার প্রেমিকাকেই আদর করছে। পরিচারিকাটির কাছ থেকে বাধা পেয়েই সে ফিসফিসিয়ে তাকে বলল ডিশটি বদলে দিতে।

সত্যি সত্যিই ওরা আমুদে। চোখে মুখে সব সময়ে খুশরী রঙ। পরিচারক-পরিচারিকাদের সঙ্গে ওদের এমন ব্যবহার আমার যে খুব খারাপ লাগছিল তা অবশ্য নয়। আমার মনে হয়েছিল, ওরা ওদের উচ্ছল মিসট্রেসদের রেখে এসেছিল বলেই বোধ হয় এমন আচরণ করছে। তবু আমি ভাবিতে পারি না, কেমন করে আমার প্রেমিককে বলব, তার যে ঠোঁট আমার জন্য গচ্ছিত তার সেই ঠোঁট যেন অন্য কাউকে চুমু দিয়ে মাটি না করে।

সঙ্গীটি চুম্বনের মধ্যে এমন আনন্দ পাচ্ছিল যেন সে ফিলিস বা অরিয়েনকেই জড়িয়ে ধরে গভীর আবেগে চুমু খাচ্ছে। আবার আমার মনে হল, এ বোধ হয় এর আগে কাউকে কোনদিন এমন ভাবে চুমু খায়নি।

দলটির রুচি যেন কেমন লাগল। ওরা বোধ হয় একটু কথাই শিখেছে তা হল 'শয়তানের সঙ্গেই থাকে মহৎ ইচ্ছা আর লিকলিকে মেয়েরা', এমন কি একজন বলেও ফেলল এ কথা সঙ্গে সঙ্গে, অন্যান্যরাও ঘাড় নেড়ে এতে সায় দিল।

আরেকজন বলল, 'সত্যিই ভদ্রমহোদয়গণ, আমি হতভাগ্য। আজ খোলাখুলিই বলছি; এ মুহূর্তে আমার প্যাশন খুব তীব্র।'

'উনি যথার্থই মাননীয়া মহিলা। না না, হাসবেন না আপনারা, কেন তিনি সম্মানীয়া হবেন না? থামুন, আর যদি না থামেন তবে গোটা বাড়িটাই আপনাদের ছুঁড়ে মারব।'

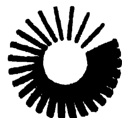
'বাঃ বাঃ, চমৎকার। তার পর?'

'আমার প্রেমে উনি পাগল। আমি জানি ওঁর মতো মহৎ সুন্দর হৃদয় পৃথিবীর কারো নেই। হ্যাঁ, আমি খুব ভাল করেই জানি, যেমন করে জানি আমি ঘোড়াদের নাড়ি নক্ষত্র। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি; ওঁর মন একেবারে ফার্স্ট ক্লাশ। কি নেই তাঁর? শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা; স্বার্থত্যাগ; নম্রতা; সভ্যতা-ভব্যতা,—যা যা

কল্পনা করতে পারেন তার সব গুণই ও'র মধ্যে বর্তমান। শুধু নেই একটা জিনিস —তা হল ওঁর ফিগারে নেই পনেরো বছর বয়সী মেয়েদের মাদকতা। তবে তিনি নিশ্চয়ই সুন্দরী, আহা! কী সুন্দর মখমলের মতো হাত, ছোট ছোট পা; যেমন সুন্দর তাঁর মন তেমনি মেদবিহীন ঝলমলে শরীর। হায়! আমার কপালটাই খারাপ। বন্ধুগণ, আমায় করুণা করুন।'

বুঝতে পারলাম ম'দ গিলে নিয়েছে ওকে, ও এখন মাতাল, প্রচণ্ড মাতাল। কিন্তু দেখলাম, কথা বলতে বলতে ওর চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়ছে। ও কাঁদছে।

পাশের লোকটি ওকে সান্ত্বনা দিল। বলল, 'জিনেৎ সব পুষিয়ে দেবে। তার মন অত সূক্ষ্ম নয়, দেখতেও যেমন মোটাসোটা তেমনি মনটাও। অনায়াসেই সে এই মুহূর্তে অন্য লোককে দেহ দিয়ে পর মুহূর্তে অন্য পোষাকে আচ্ছাদিত হতে পারে। এবং ভিতর দিয়ে গলে যাবে হাতীও।'



হে শুদ্ধতমা নারী! যদি তুমি জানতে পেতে সরাইখানায় বসে একজন অচেনা লোকের সামনেও কেমন করে তোমার প্রেমিক তোমাকেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হৃদয় বলে মনে করে। তোমার আত্মত্যাগের কথা কত অনায়াসেই গর্বের সঙ্গে সে উচ্চারণ করে। বন্ধুদের সঙ্গে বসেও সে কেমন অলজ্জ ভঙ্গিমায় তোমাকে মেলে ধরছে, তোমার গুণগুলো তুলে ধরছে। হে নারী, যখন সে একথা বলছে; যখন সে কান্নায় ভেঙে পড়ছে, তোমার কথা বলতে বলতে যখন সে আবেগে থর থর করে কাঁপছে তখন হয়তো তুমিও 'বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে না শুনে কাহারো কথা।' হয়তো তুমি পথ চেয়ে বসে আছ তারই জন্যে, হয়তো ভাবছ এ পথ দিয়েই সে ফিরবে, সে ফিরবে।

যদি তোমাকে কেউ বলে যে তোমাকে ছেড়ে চলে যাবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তোমার প্রেমিক সরাইখানার একজন সাধারণ পরিচারিকাকে ভালবেসে তাকে চুমু খেয়েছে তাহলে তুমি তা বিশ্বাস করবে না জানি অথচ, তা-ও ঘটে।

ওদের কথাবার্তা আরো বেশ কিছুক্ষণ চলল। বেশীরভাগই বোকা বোকা কথা;

ছ্যাঁচড়া রসিকতা, এলোমেলো আলোচনা। তবু এই রাত আমাকে দারুণ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করাল। অনেক কিছু শিখলাম, জানলাম পুরুষদের কিছু কিছু সেণ্টিমেণ্ট। নীতিবাগিশদের বিশ গাড়ি বোঝাই নীতিকথার বই আমাকে যা না শেখাতে পেরেছে তা আমি এক লহমায় এখানে জেনে ফেললাম।

আমার মুখেও পড়েছিল দুঃখের ছোপ, বিষণ্ণতার ছায়া। ওরা আমার দিকে তাকাল; কিন্তু আমি বুঝতে দিলাম না কিছু ওদের। সত্যি কথা বলতে কি, ওদের কাছে নিজেকে লুকোতাম। তাছাড়া, প্রথম প্রথম ওদের দেখে যা মনে হয়েছিল, এখন তার কিছুটা বদলে গেছে। তবে, ওরাও যে পুরোপুরি মুখোশ পরা মানুষ নয়, সে কথা কবুল করতেই হয়। আমিও যে নিজেকে মুখচ্ছদে আবৃত করে রেখেছি, সেই মুখচ্ছদ-পরা আমি আর মুখোশহীন আমিতেও খুব তফাৎ নেই।

যে সব মেয়ে রোমাণ্টিক স্বপ্ন দেখে বা যারা দাম্পত্য কলহে মত্ত থাকে তারা যদি এরকম অভিজ্ঞতা লাভ করত তাহলে অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত আধ ঘণ্টায়।

ওদের কথাবার্তা তখনো চলছে। কেউ বলছে নিজের কথা, কেমন করে জয় করল পৃথিবী—অর্থাৎ তার কাঙ্ক্ষিত মেয়েকে। কেউ কেউ নিজের গর্বে গর্বিত, ফুলিয়ে, ফাঁপিয়ে বলে চলল প্রেমিকার গল্প, কেউ কেউ মেয়েদের উপর পুরুষের নির্ভরতার কথাও সবিস্তারে বর্ণনা করল। প্রত্যেকেই যেন সুখী। আমার অবাক লাগছিল এই ভেবে যে এরা প্রেমকে কত সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে। হায়রে! প্রেমের গতিপথ কি এতই সহজ সরল পথ বেয়ে চলে।

এক সময় আলোচনার প্রসঙ্গ বদলে গেল। ওরাও যেন এখন মানুষ। ওদের কথাবার্তায় এখন ঝলমল করে ওঠে সুন্দর পৃথিবী, নারী জাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, বিনম্র ভালবাসা। কিভাবে আচরণ করলে মেয়েদের আস্থা অর্জিত হয়, কত সুন্দর সুন্দর শব্দ প্রয়োগে ঝরে পড়ে মননের দীপ্তি,—সেসব আলোচনাও চলল। এবার তারা প্রত্যেকেই যেন আবিষ্কার করতে চলেছে তাদের স্বপ্নমদির ভুবন।

এক সময় খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকল। এখন বিশ্রাম নেবার সময়, ঘুমোবার পালা। কিন্তু দেখা দিল সমস্যা। গোটা সরাইখানায় যে কটি বিছানা আছে তার চেয়ে দ্বিগুণ সংখ্যক মানুষ আমরা হাজির। কে কোথায় শোবে এই ভাবনাটা আমায় খোঁচাতে লাগল। হয় সব পর পর সারি বেঁধে ঘুমোতে পারি, নয়তো এক-এক বিছানায় জোড়ায় জোড়ায় ঘুমোতে হবে। আমার ক্ষেত্রে এটা এক দারুণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ালেও অন্যদের কাছে ব্যাপারটা একেবারেই তুচ্ছ। আমি তো জানি, আসলে আমি কে। অথচ সেকথা তো প্রকাশ করতে পারি না। তাছাড়া এতটা সময় যাদের সংগে কাটালাম, তাদের থেকে হঠাৎ আলাদা হয়ে গেলে বিশ্রী হবে। আবার তাদের সামনে জ্যাকেট খুলে ফেলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, নিজের বুকদুটো যতই শক্ত করে বেঁধে রাখি না কেন; উপরের ঢিলে-ঢালা জামা কিছুতেই খোলা যাবে না। কিন্তু ব্যাপারটা যে আমাকে ভাবাচ্ছে সেটা টের পেয়ে গেলে ওরাও অন্য কিছু মনে করতে পারে, এমনকি কোন ব্যাপারে সন্দেহ জাগাও অসম্ভব নয়। তবে এটা মানতেই হবে; সঙ্গীরা

কেউ দানব-দৈত্য নয়, তারা মানুষ, ভালই মানুষ।

শেষ পর্যন্ত এক এক বিছানায় জোড়ায় জোড়ায় শোওয়াই ঠিক হল। আমাদের জন্যে একটা ঘর বরাদ্দ হল। সেখানে একটিমাত্র খাট আর সেই খাটে যে ঘুমোতে এলো সে হয়ে ছিল ভয়ংকর মাতাল। খাটটা দেয়ালের দিকে ছিল। সঙ্গীটি ধুপ করে খাটে এসে পড়ল। তার শরীর আর তার ভার বইতে পারছিল না বুঝলাম। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সে, খাটের একটা ধারে তার গা এলিয়ে পড়ল। একটা হাত আর পা ঝুলে রইল মেঝের সঙ্গে। মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল সে। এবং যাকে বলে কুম্ভকর্ণের ঘুম ঠিক সেই রকম গাঢ় নিদ্রায় সে ডুবে গেল। হাজার দামামা বাজালেও তার ঘুম ভাঙবে না এখন। আমি আবার জ্যাকেটটা খুলে ফেললাম, জুতো খুললাম, আর ওর শরীরের ওপর দিয়ে দেয়ালের দিকটায় চলে গেলাম শুয়ে পড়ব বলে।

তাহলে পুরুষের সঙ্গে একই বিছানায় আমি ঘুমোচ্ছি। এটা খুব খারাপ সূচনা নয়, কি বলো! স্বীকার করছি, মনে আমার জোর থাকা সত্ত্বেও ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করছি। না, কিছুতেই ঘুম আসছে না। পরিস্থিতিটা নিশ্চয়ই অদ্ভুত আর অভিনব। না, বন্ধু, এ কোন স্বপ্ন নয়, একেবারে বাস্তব। আশ্চর্য, আমি যেখানে ঘুমোতে পারছি না, সেখানে আমার শয্যাসঙ্গী কেমন বেঘোরে ঘুমোচ্ছে।

সঙ্গীটির বয়স প্রায় তিরিশ হবে। বেশ ছিমছাম দেখতে। চোখের পাতা কালো হলেও গোঁফ তার সোনা রঙ। লম্বা কালো চুল, চিবুকে একটু লালচে আভা, ঠোঁটের কোণে লেগে রয়েছে আলতো হাসি।

কনুইর উপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে আমি উঠে বসলাম। নিভু-নিভু মোমের আলোয় দেখতে লাগলাম তার রূপ।

ওর আর আমার মাঝে কিছুটা ফাঁকা জায়গা ছিল। সে যেমন বিছানার একেবারে একটা ধারে শুয়েছিল আমি তেমনি ছিলাম উল্টো দিকের কিনার ঘেঁষে।

ছেলেদের সম্পর্কে আমার কত বিচিত্রই না ধারণা ছিল। ওদের মধ্যে দেখতাম আমি ভয়াল রূপ। অবশ্য এখনো আমার মধ্যে ভয় যে ছিল না, তা নয়। বুকের ভেতরটা বেশ তোলপাড় করছিল, অস্থিরতা বাড়ছিল, কিছুতেই ঘুমোতে পারছিলাম না। একটা অজানা ভাবনা থেকে থেকে আমায় কুরে কুরে খাচ্ছে। না, ঘুম আসছে না। ঘুমোতে পারছি না।

চারদিকে এখন নিস্তব্ধতা। সরাইখানা ডুবে গেছে নিশ্ছিদ্র নীরবতায়। দূরের আস্তাবল থেকে মাঝে মাঝে ঘোড়ার খুরের শব্দ পাচ্ছি। এক সময় মোমবাতিটা নিভে গেল। অন্ধকার নেমে এলো।

আমাদের মাঝখানে কালো পর্দার গাঢ়তম কালিমা নেমে এলো। হঠাৎ করে আলো নিভে যাওয়ায় আমার মনে যে কি প্রতিক্রিয়া হল তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারি না, তুমিও কল্পনা করতে পারবে না। আমার মনে হল সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, এমনকি আমি আমার জীবনটাকেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। ইচ্ছে হল এক সময় উঠে পড়ি, কিন্তু

কি করি বলতো ? এখন মাত্র দুটো বাজে, চারিদিকে অন্ধকার, আর আমিও তো ভূতের মত সারাটা বাড়ি ঘুরে বেড়াতে পারি না। যতক্ষণ না ভোর হয় ততক্ষণ আমাকে বাধ্য হয়েই বিছানাতেই পড়ে থাকতে হল।

দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে আবোল-তাবোল কিসব ভাবছি, বরং বলা যায় ভাববার চেষ্টা করছি। কিন্তু না, থেকে থেকে শুধু একই ভাবনা আমায় খুবলে খুবলে খাচ্ছে। তা হল, পুরুষের মতো আমি এক বিছানায় আর এক পুরুষের সংগে শুয়ে আছি, ঘুমোচ্ছি। একবার ইচ্ছে হল পাশের লোকটিকে জাগিয়ে দিই, কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল আসলে তো আমি মেয়ে। কোন সন্দেহ নেই, আমি যে সামান্যতম মদ গিলেছিলাম তারই জন্যে হয়তো আমি এরকম ছন্নছাড়া চিন্তা করছি। অথচ অন্য কিছু করার আর আমার উপায় নেই। আবার ভাবলাম, না ওকে তুলে দিই। কিন্তু এবারও পারলাম না। আবার ধাক্কা খাচ্ছি। সব কিছুই তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

যে লোকটি আমার এত উত্তেজনার কারণ তাকে যে আমি ভালবেসে ফেলেছি, তা নয়। সে যে মেয়ে নয়; এটাই হল তার একমাত্র আকর্ষণ, আর সেটাই আমার মগজে ঘুরপাক খাচ্ছে বারবার। পুরুষ! আহা পুরুষ! পনেরো বছর বয়স থেকেই যাদের হাত থেকে নিজেদের সব সময়ে সযত্নে রক্ষা করতে চাই, যাদের ইতিহাস প্রায় কিছুই জানিনা যাদের মনের খবর রাখতে পারে শুধু দেবতা বা শয়তান, যারা অল্পেই খুশী হয়, সেই পুরুষের পাশেই কিনা পুরুষবেশী আমার মতো একটি মেয়ে শুয়ে রয়েছে!

পুরুষ! আহা পুরুষ! একটা আনন্দমেশানো ভাবনা আমার ভারী মাথায় ভেসে বেড়ায়। যে সামান্যতম স্বরূপে তাদের জানি, তা-ই আমার ইচ্ছাকে খুশী করে, জ্বল-জ্বলে করে। ক্ষণিকের জন্যে আমার মধ্যে কৌতূহল জাগলেও আমি ফিরে এলাম পুরণো ভাবনায়। এ সমস্যার সমাধান কেমন করে হবে ? কোন বই পড়তে পড়তে যেমন মনে হয় পরের পৃষ্ঠাতেই হয়তো সব কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠবে আমার এখনকার অবস্থাও প্রায়ই তাই। সৌম্যকান্তি যুবক, ছোট্ট বিছানা, অন্ধকার রাত। আর কয়েক গ্লাস শ্যাম্পেন গিলে মাথা ভার ভার একটি মেয়ে। কী বিচিত্র কম্বিনেশন! তবে সব কিছুই শেষমেষ ভালয় ভালয় চুকল, কিছুই ঘটল না।

ধীরে ধীরে অন্ধকার ফিকে হাত লাগল। ফুটে উঠল ভোরের আলো। জানালাটা দেখতে পেলাম। উঠলাম বিছানা ছেড়ে, এগিয়ে গেলাম, জানালার ভেতর থেকে ঘরে একটু একটু করে আলো আসছে, দেখতে দেখতে বাইরের ছাইরঙা চেহারাটা বদলে একেবারে দিনের আলোয় ভরে যাচ্ছে প্রকৃতি। বিষণ্ণ প্রকৃতি কেমন করে ক্রমে ক্রমে ঝকমকে হয়ে গেল, আর তার সংগে সংগে আমার ভেতর কেমন রোমাঞ্চ হচ্ছিল তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। নিজেকে মনে হল জয় করে নিয়েছি সব। মনে হল আমার মাথায় শোভা পাচ্ছে বিজয়ীর মুকুট।

অন্যদিকে, আমার শয্যাসাথী ডান দিকে মেঝের উপর গড়িয়ে পড়ল।

আমি উঠে পড়লাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেজেগুজে নিয়ে জানালা খুলে দিলাম।

আঃ কী ফুরফুরে বাতাস ! আমি যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। চুলগুলো ঠিক করে নিতে আয়নার সামনে গেলাম, এবং অবাক হয়ে দেখলাম আমার বিষণ্ণ মুখখানা। যে আমার মুখ সবসময় ঝলমল করত, সে আমার একী চেহারা ?

আমরা এখনো ঘুমিয়ে রয়েছি কিনা দেখতে এলো অন্যান্যরা। তারা এসেই মেঝেতে পড়ে থাকা বন্ধুকে একটা লাথি কষাল, সেও উঠে পড়ল।

শুরু হল আবার আমাদের যাত্রা। যে যার ঘোড়ায় চড়ে বসে শুরু হল নতুন অভিযান।

না, আজ আর নয়। এখানেই এ যাত্রা শেষ করছি। পরে এক সময় আবার বলা যাবে আমার অ্যাডভেঞ্চারের কথা। বরং এই ফাঁকে, গ্রাসিওসা, ওগো সুন্দরীতমা, আমাকে একটু ভালবাস। যেমন করে তোমায় আমি ভালবাসি। আর, আজকে তোমাকে যা বললাম তার ভিতর থেকে তুমি নিশ্চয়ই আমার চরিত্রের একটা দিক খুঁজে পাবে।

রোজালিন ও অরল্যাণ্ডো

অনেক কিছুরই আর অর্থ নেই কোনো, অনেক কিছুই দাঁতে দাঁতে কড়কড় করে হিংস্র রব তুলছে। সব কিছুই ক্লান্তিকর। বড্ড একঘেয়ে। হ্যাঁ, অনেক কিছু ব্যাপার আছে যাকে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায়।

আরো কিছু কিছু ব্যাপার আছে যা ভাবলেই মুখটা বিষ-তেতো হয়, গা ঘিন ঘিন করে, ইচ্ছে করে সব কিছু লন্ডভন্ড করে দিই। উপন্যাস লেখা এমনিতেই শ্রমসাধ্য, ক্লান্তিকর, কিন্তু তার পাণ্ডুলিপি আবার যদি পড়তে হয়; অথবা স্বপ্নের নায়িকাকে যখন দেখা যায় আমারই নাকের ডগায় বসে অন্যের সংগে খুনসুটি করছে বা কোন মুটেকে যদি বলা যায়, আহ্ তোমাকে সম্রাটের মতো দেখাচ্ছে তখন ভীষণ রাগ হয়। মনে হয় কে যেন কাটা ঘায়ে নুন ছিটোচ্ছে। ইচ্ছে করে এইসব বিরক্তিকর—একঘেয়ে ব্যাপার-স্যাপারকে জোড়া পায়ে লাথি মারি। এরকমই বিচ্ছিরি লাগে শীতকালটা, কেননা চারদিকে তখন বরফ আর বরফ; গরমকালটা তেমনি পাজি বদমাস, কেননা সূর্য্যিব্যাটা তখন রাগে গর্‌গর্ করতে থাকে, চামড়া-টামড়া পুড়িয়ে দিতে চায়। তবু আমার ধারণা, স্বর্গ-মর্ত-পাতালে সবচেয়ে ক্লান্তিকর মর্মান্তিক ব্যাপার হল ট্রাজেডি নির্মাণ। নাটক ট্রাজেডি হলে খারাপ লাগে না, কিন্তু বাস্তবের ট্রাজেডি যে কী ভয়ংকর তা ভাবলেই সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যায়।

এরকম আরো অনেক ভাবনা আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারে। কুশ্রী কদর্যতায় টুকরো টুকরো হয়ে যায় বহু সম্ভাবিত আলোকপর্ণার পাপড়ি। চারিদিক থেকে উঠে আসে অন্ধকার—যন্ত্রণার অন্ধকার। এলোমেলো ব্যাপার-স্যাপারে নাজেহাল হয়ে যাই। অথচ কি যে করব তা ও ভেবে পাই না।

যন্ত্রণা। সারা শরীরে যন্ত্রণার দাপাদাপি। চিন্তায় একটা কর্কশ কান্নার দমকা, পায়ে পায়ে শেকলের টান। জিভটা তেতো, বিস্বাদ। যেদিকে তাকানো যায়, দেখি ঘিরে আছে অন্ধকারের দুর্গ, সেখানে মাকড়সার জাল, ঘুণপোকার গান, সেখানে একটু একটু করে কুঁকড়ে ঝরে যেতে থাকে সব শুচিস্মিত ভাবনা।

সবাই আমরা হাসির খোরাক। সবারই মস্তিষ্কটা কংক্রীটের মতো জমাট বাঁধা। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রেমিক-প্রেমিকাও অনেক সময় হয়ে দাঁড়ায় উপহাসের পাত্র-পাত্রী। অসময়ে অনেকেই নিজের নিজের কবর খোঁড়ে, অনেকেই আগের থেকে মরে যায় ভিতরে ভিতরে। কালো বা সাদা পোশাক পরে নেয়, শরীর থেকে বেরোয় কান্নার সুর, ছড়িয়ে পড়ে চিতার রংধরা আকাশের আলো। ঘাড়ের ওপর ছড়িয়ে রাখে চুল, মখমল-কালো চুলে আর্তির অমানিশা, বিরাট শূন্যের হাহাকার। এ সবই করুণ উপহাসের সামগ্রী। আহ্, ওহো, উফ্, হায়—ইত্যাদি ইত্যাদি ধ্বনির মানে যে কী সে আমি জানি না। এ রকম প্রলাপ-বকা প্রেমিক-প্রেমিকার কপালে উপহাস ছাড়া কীই বা জুটতে পারে? এ ছাড়াও অনেক কিছু বেশ কৌতুককর। সত্যিকারের চালিয়াৎ, ফেরেববাজদের বদলে কেউ যখন চারশোবিশের অভিনয় করে তখন আমার হাসি পায়। মুচি না হয়েও কেউ যখন মুচির ভাবভঙ্গি নকল করে মুচি সাজে তখনও মনে হয় কাতুকতু দিয়ে কেউ যেন হাসাচ্ছে।

তাই বলে নাটক আমি ভালবাসি না, তা ঠিক নয়। আসলে, অভিনয়টা মঞ্চেই মানায়। আমি জানি, নিত্যনাটের খেলা চলছে দিন-রাত। তবু বলব, আমার কাছে সেই মঞ্চসজ্জা বা মঞ্চাভিনয়ই সুখসেব্য যা হবে অদ্ভূত, বিচিত্র, খেয়ালীকল্পনার উৎস। এরকম এক উৎকল্প থিয়েটারের কথাই তোমাকে বলছি। ধরো সেই মঞ্চের পাদ-প্রদীপের আলো হয়ে আছে জোনাকী, পরিচালকের ডেস্কে বসে আছে গুবরে পোকা। ঝিঁঝিঁ পালন করছে একটা ভূমিকা, নাইটিঙ্গেল তুলছে একটা সুর, পরী উড়ে এল ফুলের পাপড়ির ভেতর থেকে। পরীর পা দুটো হাতীর দাঁতের চেয়েও ঝকঝকে সাদা, পিঠে তার দুটো ডানা, কাঁধে তীর-ধনুক। পরীর ঢোকার সংগে সংগে মর্তে একসংগে ফুটে উঠল ফুল, তৈরী হল আলো আঁধারীর মিষ্টি পরিবেশ, ঝরে পড়ল সঙ্গীতের সুরমূর্চ্ছনা।

প্রজাপতির ডানায় ওঠে পর্দা। ডিমের কুসুমের চেয়েও নরম পেলব পর্দা ওঠে ধীরে ধীরে। দর্শকের আসনে বসে আছে কবি-শিল্পী, আত্মার কারিগর! অর্থাৎ প্রেক্ষা-গৃহ কবিদের আত্মায় ভরাট।

আমেরিকা আবিষ্কারের আগে যে রহস্যময়তা ছিল ভূমণ্ডলে, তার চেয়েও রহস্যময়, অভিনব এর দৃশ্যসজ্জা। অথচ নানান রঙে চিত্র বিচিত্র নয়। সবই একই রঙা—সবুজ বা লাল বা নীল বা হলুদ।

চরিত্রগুলোও কোন দেশ কালের সীমায় বন্দী নয়। তারা যে যার ইচ্ছেমতো চলে, ইচ্ছেমতো হাসে-কাঁদে-খেলে। দর্শক বুঝতে পারে না এর পর কি ঘটবে, জানতেও পারে না এদের এবম্বিধ আচরণ। এরা খায় না, পান করে না, তাদের নেই কোন পেশা, নেই আস্তানা। তাদের চালচুলো নেই, নেই জমিজমা, পয়সাকড়ি, ঘর-গেরস্থালি। মাঝে মাঝে তাদের হাতের তালুতে থাকে হীরে; পায়রার ডিমের মতো ঝকমকে হীরের টুকরো।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদে পোষাক-আষাকও বিচিত্র। নানা রুচির ছোঁয়ায় এরা অপূর্ব-

অদ্ভুত। আসলে এদের পোষাকে কোন নির্দিষ্ট জাতির ছাপ নেই—না ইংরেজ, স্প্যানিশ, তাতার, তুর্কী, ফরাসীর। অথচ সব জাতের রুচিরই কিছু না কিছু ছাপ রয়ে গিয়েছে।

এদের অভিব্যক্তিও বিচিত্র। এরা চেঁচায় না; কথা বলে না। হাসতে এদের মানা, কাঁদতে এদের বারণ, অথচ কী সুন্দর স্পষ্ট এদের অভিব্যক্তি। মূর্খ অভিনেতাটিও এক সময়ে বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে ওঠে, আবার তুখোড় বুদ্ধিমান অভিনেতাটির অভিব্যক্তিতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে নির্বুদ্ধিতার চরম। কেউ কাউকে নিয়ন্ত্রণ করে না, কাউকে নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই, অথচ সবাই চলে যাচ্ছে ছন্দের তালে তালে। এই কল্পিত অভিনয়ে সবাই রাজা, সবাই প্রজা। একে নিশ্চয়ই 'অ্যাজ উই লাইক ইট' বলতে পারা যায়।

আচ্ছা; তুমিও তো এরকম একটা নাটক পড়তে পড়তে চলে যেতে পারো স্বপ্নের মোহময় পরিবেশে, সেখানে তুমিই তোমার পূর্ব পরিচয় হয়তো ভুলে যাবে। ক্ষণিকের জন্যেও মনে জাগবে না তুমি কে, তুমি কি, তুমি কেন। বিস্মৃতির প্রদোষ অন্ধকারে হারিয়ে যাবে তুমি, বিলীন হবে তোমার পরিচয়।

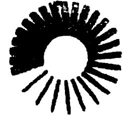
বিশ্বাস করো, তোমায় আমি ঈর্ষা করি। ঈর্ষা হয়, যখন দেখি ধবধবে চুল নিয়েও সবুজ প্রাণের প্রতীক আদম তোমাকে অনুসরণ করে। তুমি যখন নির্বাসিত হও, তখনো তুমি সংগ্রামী, তুমি বিজয়ী। এমন কি, তুমি সর্বস্বান্ত হলেও, রোজালিন তার কণ্ঠহার পরিয়ে দেয় তোমার গলায়। তুমি হতভাগ্য হলেও প্রেমে তুমি জয়ী। অত্যাচারে জর্জরিত তোমাকে দেশ ছাড়তে হলেও দেখি তোমার নিগ্রহকারীর কন্যা তোমায় অনুসরণ করে চলে সমুদ্রতলা অবধি।

তোমাকে আশ্রয় দেবার জন্যে কৃষ্ণপ্রতিম আরডেন্সেরও পত্রিল বিশাল বাহু তৈরী হয়ে থাকে, মৃত্তিকাগর্ভে তোমার শয্যা তৈরী করে রাখতে অরণ্য সঞ্চয় করে নমনীয় শৈবাল, রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে তোমাকে বাঁচাতে তৈরী করে রাখে ধনুর মতো খিলান। বাসন্তী শিশির করে তোমায় করুণা, আর তোমার দুঃখে দুঃখী হয় হরিণ আর হরিণ শিশু। পাহাড় ছুটে আসবে তোমার কাছে, হয়ে উঠবে তা তোমার ডেস্ক, তার উপর রেখে লিখবে তুমি তোমার প্রেমপত্র আর ঝোপঝাড়ের কাঁটা মসৃণ মখমল হয়ে তোমার পেনের নিব হবে। যখন তোমার বুকে ভালবাসা থির থির করে কেঁপে উঠবে, উথলে উথলে উঠবে আবেগ তখনই সূর্যমুখী পাপড়ি মেলে রোজালিনকে লিখবে তুমি চিঠি—স্বপ্নমদির পত্র।

আহা! কোথায় সেই যুবা অরল্যান্ডো! কোনখানেই বা পত্রিল বাহুর আরডেন্স! ব্যর্থতায় আমাদের চোখের জল মুক্তো হয় না, আমাদের বেদনা তোলে না কোন প্রতিধ্বনি। অথচ আমাদের অশ্রুনিষিক্ত সনেট কখনো রোজালিনরা পড়ে না।

এখন আর আমি আগের মত নই। পাখীরা আমায় ধার দিল তাদের পালক। সোয়ালো থেকে ঈগল সকলের ঝরা পালককে গুছিয়ে নিলাম ডানা, মেখে নিলাম রোদের সুবাস, ভরে নিলাম আকাশের গান। এ ডানার ক্ষিপ্রতায় উড়ে যাব দূর দেশে, সেই অচেনা

অজানা দেশে আমাকে কেউ নাম ধরে ডাকবে না, জাগিয়ে তুলবে না পুরণো স্মৃতি। অপার ভুবন, উদার গগন, শ্যামল কাননতল—আমাকে ভুলিয়ে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে। আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে, ফুল মোরে ঘিরে বসে, কেমনে না জানি জ্যোৎস্নাপ্রবাহ সর্বশরীরে পশে। অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে আমি উড়ে যাব কোন ভুবনমোহিনী মায়ায় ; পুঞ্জিত আঁধার ঠেলে ঠেলে কনকের কান্তি এঁকে ডানা মেলে উড়ে যাব আমেরিকা, তারপর আফ্রিকা, তারপর এশিয়া। উড়ে যাব উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণে। আমি উড়ে যাব কবি কল্পনার নির্বাক ইশারায়, নীলিমায় মৌন স্বপ্নময়ূর ডানায় উড়ে যাব স্ফটিক আলোকে। উড়ে যাব, আমি উড়ে যাব দূরে আরো দূরে।



হায়! নাই, কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ। শুধু দূর আকাশের তরে নেশাখোর মক্ষিকার তৃষ্ণা নিয়ে আসে দুদণ্ডের অশ্রু অমানিশা। ভুল, সবই ভুল। এখন বুঝতে পারি, আমি ব্যর্থ। জন্মলগ্ন থেকেই আমি এক বিশাল ভুলের বোঝা। যে জীবন আমি যাপন করছি, তা আমার নয় ; যে জীবন আমার পাওনা ছিল, তা কখনো মিলল না। যে পথে আমি চলতে যাই সে পথ কখনো খুঁজে পাই না। হারিয়ে যায়, সমস্ত সরণী শুধু দূরে সরে যায়। যখন মনে হয় আকাশে উড়ে যাই, তখনই দেখি বাতাস ভারি; আমার কিছু করবার থাকে না। দেখি, ডানা ছড়িয়েও আমি বন্দী, আবার ডানা গোটানোরও ক্ষমতা আমার নিঃশেষিত। না পারি উড়তে, না পারি হাঁটিতে। যখন মাটিতে, আকাশ তখন ডাকে : আর যখন আকাশে, তখন দেখি মাটির হাতছানি। আমি বুঝতে পারিনা, আমি কি করব। শীতের বাতাস খসিয়ে নেয় পালক, মাটিতে নামলে পায়ে ব্যথা দেয় পাথর। চারদিকে ধূসর পাণ্ডুরতা, স্বার্থপর লোলুপতা আর কোন একটা নিভৃত মরণের কেন্দ্রের দিকে নিঃসঙ্গ শিথিল পায়ে এগিয়ে যাওয়া আমাদের নিয়তি। দুঃস্বপ্নের ঘোর যেন কিছুতেই কাটে না। এই জীবনটাই যেন ক্লান্তি, ভিড় আর দমবন্ধ উদয়াস্ত। অজানা যন্ত্রণায় থমকে থাকে অন্ধকারের আড়ালে। প্রেম, আহা, কি মায়াময় শব্দ। তার ভিতরেই তো জ্বলে সূর্যমুখীর আলো, ছড়িয়ে পড়ে গুলমোহরের পর্ণ, কবিতার কুসুমমঞ্জরী। তবু, আমি, বড়ো

হতভাগা। আমিই হলাম হতভাগ্য হিপোগ্রিফ। যেদিন থেকে সাগর ভালবাসল চাঁদকে, মেয়েরা প্রতারণা করল পুরুষকে—সেই আদিলগ্ন থেকেই আমি যেন বেঁচে আছি সব দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা বুকের মধ্যে পুষে রেখে। আমিও হলাম কিম্ভুত-কিমাকার কিমীর‍্যার মতো। সেই কিমীর‍্যা—যাকে টুকরো টুকরো করেছিল বেলেরফন্, যার মাথাটা ছিল কুমীরের, থাবাটা সিংহের, শরীর ছিল ছাগলের আর লেজ ছিল ড্রাগনের—সেই দানব কিমীর‍্যাই আবার অবয়বত্ব পেল আমার ভিতর।

বুকে আমার কুমারীর নিটোল স্বপ্ন আর বেশ্যার মাতাল আবেগ, ইচ্ছারা আমার সিংহের মতো গতিময়, চিন্তা-ভাবনা ছাগলের মতো বিশ্রামবিহীন ও এলোমেলো, ঘৃণা আমার ঝাঁঝালো বিষ।

সত্যিই আমার মন এক অদ্ভুত দেশ। এ-এক চরম বৈপরীত্য ও বিচিত্রতায় ভরা নিদর্শন। সেখানেও বসন্ত আসে, ফোটে ফুল, ছড়ায় রঙ। সেখানেও সূর্যোদয়ের বাহার, সূর্যাস্তের স্বর্ণশোণিমার প্লাবন। আবার সেখানেই নোংরা ঘোলা জলের নর্দমা; কঙ্কালের রাশি, মরা কুকুর, পচা-গলা ব্যাঙের পাহাড়। সেখানে বুনো কাঁটার ঝোপঝাড়; বিষাক্ত সাপের হিসহিসানি। এখানের সব কিছুই বিষে ভরা—ঘাস, ফল জল, বাতাস, আলো, ছায়া—সব কিছুই ভয়ংকর মারাত্মক। যে দিকেই তাকাবে বীভৎসতা, বিভীষিকার আশ্চর্য আদল।

এই বিশ্বে আমি এখন অবাঞ্ছিত। ফুরিয়ে গিয়েছে অন্যের প্রয়োজন। কবর থেকে উঠে আসা ভূতের মত আমাকে সে তাড়িয়ে বেড়ায়, পাণ্ডুরতায় ভরে যায় আমার প্রকৃতি; বিষাদ-ধূসর হয়ে যায় স্বভাব, আমি যে বেঁচে আছি—সে কথাও মানতে চায় না আমার রক্ত, চামড়া হয়ে ওঠে বিবর্ণ, শিরায় শিরায় বয় ক্যানেলে আটকে থাকা বদ্ধ পচা জল। মানুষের হৃৎপিণ্ডের মত ধ্বনিত হয় না আমার হৃদস্পন্দন, ফুসফুসে ভরে না বিশুদ্ধ বাতাস। সঙ্গীদের মতো নেই দুঃখ-আনন্দের অনুভূতি। সকলের কাছে যে ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা অনভিপ্রেত, আমার কাছে তারই হলো সবচেয়ে জোরালো দাবী। মেয়েরা যখন আমাকে আর ভালবাসে না, তখনই ওদের ভালবাসি আমি তীব্র ভাবে, আবার যখন আমার মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে ঘৃণা, বিতৃষ্ণা, তখনই ওদের কাছ থেকে আসে ভালবাসার কুসুমাঞ্জলি। এ-এক আশ্চর্য ব্যাপার, কিছুতেই আমাদের সময় ঠিকমতো চলে না, একই সুরে, একই তালে লয়ে বাঁধা পড়ে না দুটি হৃদয়। যেমন ঠিক মুহূর্তটি বেছে নিয়ে আমি পৌঁছতে পারি না আর এক হৃদয়ের ফুটে ওঠার সময়, তেমনি হয়তো এমন সময়ে পৌঁছই যখন সব কিছুই মনে হয় অর্থহীন, মনে হয় ভ্রান্ত পণ্ডশ্রম। কখনো মনে হয় নিজেকে উপস্থাপনা করেছি গবাক্ষে, আবার কখনো মনে হয় আমি এক ক্লান্তিহীন স্তম্ভের শরীর।

স্বাভাবিক ভাবে বস্তুর দিকেই আমার ঝোঁক, আর শিল্পকলায়, আমার মতে, প্লাস্টিকের স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি বুঝতে পারি শিলামূর্তি, কিন্তু বুঝতে পারি না জীবন্ত মানুষকে। মাঝে মাঝে নিজেকেই নিজের মনে হয় অচেনা, মনে হয় স্রষ্টার আমি এক প্রচণ্ড কৌতুক। নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে উঠি বারবার, সে স্বর

আমার বলে মানতে চায় না মন, বরং ভাবি, এ স্বর কারো কাছ থেকে ধার-করা। তাহলে, সিলভিয়ো, আমি বুঝতে পারি বোকাসোকাদের। বুঝতে পারি বুদ্ধিবিহীন কার্যকলাপ, ধরতে পারি এলোমেলো দুঃস্বপ্নের তাৎপর্য। যা কিছু নিয়মবিরুদ্ধ, যা কিছু অস্বাভাবিক, যা কিছু উৎকল্পনা—আমার কাছে তাই হল স্পষ্ট, অর্থময়। ফলে, কিছুক্ষণ আগে তোমাকে যে খেয়ালী-নাটকটির কথা বলেছি, তা অন্যের কাছে অর্থহীন—দুর্বোধ্য বলে ঠেকলেও আমার কাছে তার আবেদন গভীর। অন্যের চেয়ে সে নাটক আমাকে বেশীই খুশী করেছে। আর সেই নাটকই আমরা অভিনয় করব বলে স্থির করেছি। তার প্রস্তুতিও চলছে।

তেয়োদোর, রসেটি আর আমি, তারই বিষয়বস্তু, খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনায় মস্ত। নাটকটির প্রয়োগবিধি, দৃশ্য পরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ে বাঁধল আমাদের মধ্যে তর্ক। আগেও বলেছি, আবার কবুল করছি যে, রসেটি সব সময়েই আমার রুচিকে তারিফ করে। মনে করে কবিদের রয়েছে অবাধ কল্পনার অধিকার, তবে প্রথা মেনে চলা তাদেরও উচিত, আর আমি মনে করি, সব সময়েই স্বচ্ছ করে ফোটানো দরকার লেখকের বক্তব্য।

সে যাই হোক, অধিকাংশ শ্রোতা-দর্শকই মনে করে, এ ধরনের নাটক মঞ্চের পক্ষে অনুপযুক্ত। শুধু তাই নয়, এ রকম উদ্ভট নাটক অভিনয়ই করা উচিত নয়। আমি বলতে চাই, ও ধরনের মনোভাব একদিক দিয়ে সত্য হলেও অন্যদিক দিয়ে ভ্রান্ত অর্থাৎ অংশতঃ সত্য, অংশতঃ মিথ্যে। 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট্' যে নিঃসন্দেহে অভিনয়-যোগ্য সে কথা আমি জোরের সঙ্গেই ওদের কাছে তুলে ধরলাম। শুধু যে মঞ্চ উপযোগী তাই নয়, আমার মতে, যারা নতুনত্বে বিশ্বাসী, কল্পনাবিলাসী তাদের কাছে নাটকটি অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য।

এই নাটকটিই অভিনয় করবার ইচ্ছে জেগেছে ভীষণ ভাবে। বুঝতেই পারছ আমি নিয়েছি অরল্যান্ডোর ভূমিকা আর রসেটি রোজালিনের চরিত্র। আমার মিসট্রেস হিসেবেও বটে, এ-বাড়ির অংশতঃ মালিক হিসেবেও রোজালিনের ভূমিকাটি রসেটিকেই পুরোপুরি মানাবে। আর তেওদোরের অভিনয়ে মূর্তি পাচ্ছে বিষাদ করুণ জেমস। মঞ্চ সাজানোর দায়িত্বে ছিল এক যুবক চিত্রকর। শিল্পীটি চমৎকার। তার হাতের কাজ খুব সুন্দর, কল্পনাশক্তি দারুণ। রঙের অদ্ভুত খেলায় সে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলল পুরণো গাছের গুঁড়ি। জীবন্ত হয়ে দেখা দিল পাথর, পাহাড়, মেঘ।

আমাদের কস্ট্যুমের ভারও নিল সে। কি কি ধরনের পোষাক-আষাক পরব সে ব্যাপারে আমার ভূমিকাটিও নেহাৎ কম ছিল না। ত্রুবাদুরদের মতো কারো কারো সাজসজ্জার ব্যবস্থা হল।

মেয়েদের মধ্যে কিছু কিছু আপত্তি উঠল। কেউ হয়তো বলল, এত ছোট্ট স্কার্ট আমি পরব না। আমি বললাম, এতেই তো সুন্দর মানাবে। তোমার অমন সুঠাম পা, মাখনের মত উরু সত্যিই বড়ো লোভনীয়। কাউকে হয়তো বললাম, তোমার বুক তো আর সাধারণ বুক নয়। ও হল দুটি পাহাড়ের দুই যমজ চুড়ো।

মাঝখানের উপত্যকায় লুকিয়ে রয়েছে কত স্বপ্ন, কত কবিতা। সেই উপত্যকায় কত পাখীর গান, কত ঝর্ণার সুর। শেষ পর্যন্ত, আমার কথাই মেনে নিত সবাই। থিয়েটারের ক্ষেত্রে আমিই হয়ে উঠলাম সর্বেসর্বা, এ-ব্যাপারে কোন সমস্যা এলেই আমার মত ছাড়া তার সমাধান সম্ভব হত না। আসলে আমিই হয়ে দাঁড়ালাম সর্বঘটের কাঁঠালি কলা।

সিলভিয়ো, বিশ্বাস করো, আমার মাথায় সব সময়েই নানান চিন্তা খেলে বেড়াত। মাইকেল এঞ্জেলোরও কি এত কল্পনাশক্তি ছিল ?

হ্যাঁ, সিলভিয়ো, আমার মগজে এত বেশী ভাব, কল্পনার ছড়াছড়ি যে পৃথিবীর কোন কবির মস্তিষ্কেও এত নেই। আমার তো মনে হয় না, এই পৃথিবীর সত্যিকারের প্রতিভাবানেরা আমার চেয়ে বেশী প্রতিভাধর। জানি, এক একটা শতাব্দী ভরাট করে রাখে এক একজন শিল্পী। তাদের সৃজনীক্ষমতার অলৌকিক আলো ছড়িয়ে পড়ে শিল্পে, সাহিত্যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে। তারা চায় নিজের নিজের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র স্বরাট হয়ে উঠতে। ফলে যখন কোন প্রতিভাবান দেখে তার সৃষ্ট ভুবনে তার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী এসে হাজির হয়েছে, তখন অনেক সময় সে নিজের জায়গা বদল করে ফেলে। নব-নব সৃষ্টির উম্মাদনায় মাতাল হয়ে যায়।

এমন কি, অনুকারক দেখা দিলেও আসল মানুষটি কখনো কখনো বিচলিত হয়। প্রথম প্রথম অনুকারক পেলে শিল্পীমন খুশিই হয়, কিন্তু যখন দেখা যায় অনুকারকের জনপ্রিয়তা আদত শিল্পীর খ্যাতিতে ভাগ বসাচ্ছে তখন সে আর চুপ করে থাকতে পারে না। বাস্তবে দেখা যায়, প্রতিধ্বনি সব সময়েই ধ্বনিকে ব্যঙ্গ করে। আর গ্রহীতা মানুষটির উপহাস না করে উপায়ও থাকে না। এটাই সত্য যে লোকচক্ষে নিজেরই গুরুত্ব বোঝাতে প্রতিধ্বনি সততই ধ্বনিকে ব্যঙ্গ করবেই। তখন, বাধ্য হয়েই আসল মানুষটিকে, সৃজনক্ষম সত্তাটিকে, বদলাতে হয় স্বসৃষ্ট পথ পরিক্রমা। আপন চিন্তা-ভাবনা অনুভূতিকে ভিন্ন খাতে বইয়ে দেয়—অনুকারদের দৌরাত্ম্য থেকে নিজেকে বাঁচাতে।

এ কারণেই দেখি, বহু প্রতিভাবান মহৎ শিল্পী আপন সৃষ্টির পথ পরিহার করে ধরে হঠাৎ নতুনতর পথ। নতুন মাটিতে বোনে বীজ, ফোটায় ফুল। সে বুঝতে পারে —চিনতে পারে নিজেকে, বলে, সত্য যে কঠিন।

আমার বেলায় অবশ্য ধরতে পারি না, সত্যি সত্যিই এ পৃথিবীতে আমার কিছু দেবার আছে কিনা। যদিও মাঝে মাঝে মনে হয়, আমিও ভালবাসতে পারি। আমার জীবনেও কোন কোন অসম্ভব যে সম্ভব হয় তা টের পাই। তবু মনে হয়, সত্য হই নি, এতদিন যেমন ছায়া ছিলাম তেমনিই রয়ে গেলাম। আমি বুঝতে পারছি একটা বিরাট হাঁ করে গ্রাস করে শূন্যতা। নিবিড় নৈরাশ্য বসে বুকের ভিতর জাঁকিয়ে।

সামনে পেছনে আমার অন্ধকার। আমি দেখেছি; পৃথিবীর সব ক্ষমতাবানই ভেতরে ভেতরে সংকীর্ণ। তাদের যে-চিত্তের ওপর আলো ঝলমল করে, সমস্ত আকাশের

ছায়া পড়ে, সেই আলো-ছায়ার জাফরি দিয়ে তারা নিজের মনকে মেলে ধরতে পারে না কোনো গানের একটি কলির মতো। প্রকৃত পক্ষেই দেখলাম, মনটা তাদের ছোট বলেই সৃষ্টি তাদের বড়ো। তবু মানতেই হবে, কবিতা একেবারে আলাদা জিনিসে গড়া। কার ভাল লাগে না-লাগে আমি জানি না, শুধু জানি কবিতা আমাকে নন্দিত করে; ধন্য করে, সুন্দর করে। কবিতাই আমার প্রেম, কবিতাই প্রণাম।

আমি সুন্দরের উপাসক। প্রাণভরে লক্ষ্য করেছি তার উপস্থিতি। সমর্পণ করেছি তাকে কনকাঞ্জলি। তবু, বলি আমি কোন ভাস্করের হাতে-গড়া মূর্তি নই। আমি মানুষ, আর মানুষ বলেই যা কিছু অসুন্দর-কুৎসিত তাকে আমি ঘৃণা করি। ভালবাসি ছবি, গান, কবিতা। চাই, এমন কবিতা লিখতে, এমন ছবি আঁকতে, যা আমায় রাতারাতি পেঁাছে দেবে খ্যাতির শীর্ষে। আমায় যদি কেউ ভালবাসে (হায়রে, পৃথিবীতে কি এমন কেউ আছে যে ইচ্ছে করে এই সমস্যায় জড়িয়ে পড়বে,) সেই ভালবাসার উচ্চারিত শব্দ কবিতার চেয়ে নিটোল হতে পারে না।

কিন্তু, যা ভাবি তা কোন দিনই লিখতে পারি না। নীরব কবিত্বের কি কোনো দাম আছে ?

যাই হোক আজও রিহার্সাল হয়েছিল। অনেকেই উপস্থিত ছিল তখন। আমিও কেন জানি না ভীষণ আন্দোলিত ছিলাম। একমাত্র তেওদোর ছাড়া আমরা সবাই যে-যার পোশাক পরে তৈরী হয়ে রয়েছি। একজনকে পাঠালাম তেওদোরের ঘরে, কেন তার দেরি হচ্ছে। সে জানিয়ে দিল, এক্ষুণি তৈরী হয়ে সে আসছে।

সে এলো। করিডরে শুনলাম ওর পদধ্বনি। যে ধ্বনি অন্য কারো কানে এসে পেঁাছয় না আমি তা টের পেয়ে যাই ঢের আগে। আমার মনে হয়, ওর মত হালকা চালে পৃথিবীর আর কেউ কখনো হাঁটতে পারে না। ওর হাঁটা-চলা, ওর চলন বলন আমার কাছে এত জানা যে দেয়ালের ওধারেও সে কি করছে তা আমি বলে দিতে পারি। তেওদোরের পায়ের ছন্দে হৃদস্পন্দন দ্রুতগতিতে ঊর্ধ্বমুখী হল। মনে, হল আমার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে চলেছে একটু তাড়াতাড়িই। তারপর সে এলো। এলো দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মুহূর্তটি অবশেষে।

দরজাটা খুলে গিয়েই আবার ধীরে ধীরে বন্ধ হল। চার দিক থেকে ভেসে এলো মুহুর্মুহু করতালি, অভিনন্দনের জোয়ার। মেয়েদের মুখগুলো ঈষৎ লাল হয়ে উঠল। রসেটির মুখে বিষণ্ণতার ছায়া, দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বসে রইল। সব সময়েই আমার মনে ছিল সংশয়, আমি ভাবতাম রসেটি তেওদোরকেই ভালবাসে। বিশ্বাস করতে শুরু করলাম, রসেটির ভুবন জুড়ে তারই অস্তিত্ব।

শুধু রসেটিই একা নয়, সেখানে বসেছিল আরো তিন-চারজন সুন্দরী রমণী। কিন্তু কেন জানিনা, তাদের মনে হল এখন কুরূপা। সূর্যের আলোয় যেমন হারিয়ে যায় তারার মায়াবী উজ্জ্বলতা, তেমনি তাদের সৌন্দর্য হয়ে পড়ল ম্লান। একসময় যে সব পুরুষ তাদের পেয়ে নিজেদের মনে করেছিল ধন্য, ভেবেছিল পেয়ে গেছে আপন আপন মিসট্রেস, এখন তাদের দাসী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারল না।

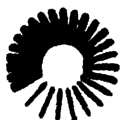
আমার চোখে তখন আলোর উৎসব। গোধূলির স্বর্ণশোণিতপ্লাবনের বদলে শুভ্রতার অমল বিভাস। মনে হল, সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সৌম্যকান্তি যুবকের বদলে এক লাস্যময়ী নারী। চিত্তহারিণী রমণীর উজ্জ্বল আলোয় ঘটবে প্রাণপূর্ণ স্বপ্নের উদ্ধার। কয়েক মুহূর্তের জন্য সেখানে সে দাঁড়িয়ে রইল। (হায়রে কত নির্বোধ আমি! এতদিন ওকে পুরুষ বলে ভেবেছি! না, ওকে তো মেয়ে ছাড়া কল্পনাও করা যায় না!) দর্শকদের দৃষ্টি আটকে রইল ওর দিকে। আলোয় আলোয় ভরে গেল ওর শরীর। ঝলমল করে উঠল মাথা থেকে পা। তার দীর্ঘ বাদামী কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ ময়ূরের পেখম মেলে ছড়িয়ে রয়েছে ঘাড়ের ওপর। আঃ কী লোভনীয় চকচকে ঘাড়, কী পরম সুন্দর অনাবৃত স্তন! এমন নিখুঁত অনুপম রূপ কি মার্বেলেও ফুটে উঠত! ত্বকের ভিতর দিয়ে সব কিছু যেন স্বচ্ছ হয়ে ফুটে উঠেছে। আহ্, অমন শুভ্র রূপ অমন রঙীন মেদ আর কোথায় পাওয়া যাবে! ঘাড় তার হার মানায় মরালীকে। অমন মসৃণ মখমলের মত ঘাড়, ছন্দহিল্লোলিত কোমল শরীর, অমন চুলের বাহার, অমন জীবন্ত কবিতা আর কোথাও পাওয়া যাবে। সেই মুহূর্তের আমার আবেগ আমার অনুভূতিকে যদি ফুটিয়ে তুলতে চাই তাহলে অন্তত পঞ্চাশ পৃষ্ঠা তোমাকে লিখতে পারি। কিন্তু ভাষারও যে কি বিশ্রী সীমাবদ্ধতা তা তোমায় কেমন করে বোঝাব। আমার জানা এমন কোন শব্দ নেই, উপমা নেই, ভাষার ভাঁড়ার নেই যা দিয়ে নিপুণ ভাবে বর্ণনা করতে পারি, পরিমাপ করতে পারি রমণীর সুডোল পৃথুল স্তন। কিম্বা তাদের মনোরম মাংসল নিতম্ব। এমন মোহনীয় সৌন্দর্য দেখবার পর স্থির করলাম আমাকে ভাস্কর হতে হবে, যে ভাবেই হোক মূর্তি দিতে হবে এরকম অনন্য প্রতিমার দেহ ভঙ্গিমা। নইলে পাগল হয়ে যাব। ওরকম মাতাল-করা ঘাড় নিয়ে বিশ বিশটি সনেট লিখলেও সব বলা হবে না। আমি চাই এমন কিছু একটা করব, যাকে স্পর্শ করতে পারব, আঙুল দিয়ে ছুঁতে পারব, আর তা হয়ে উঠবে প্রায়-জীবন্ত। জানি, চিত্রকর নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে তার উপস্থিতি; কিন্তু সেটাই শুধু বাইরের দিক থেকেই হবে। একমাত্র ভাস্কর্যেই ফুটে উঠতে পারে জীবন্তের অবয়ব দেহ ভঙ্গিমা। তাতেই থাকতে পারে সচল প্রাণের নিশ্চল রূপ। জীবন্ত মানুষটির সমস্ত রূপ ছন্দ আর ঐশ্বর্য নিপুণায়িত হয় ভাস্কর্যে। আঙুল দিয়ে তাকে ছুঁতে পারি; ঘুরে ফিরে দেখতে পারি। আলো ছায়ার খেলায় তারও রূপ হয়ে উঠতে পারে অসামান্য। তবু, হ্যাঁ, তবু তার মধ্যে দুটো জিনিসের অভাব থেকে যায়। প্রথমত জীবন্ত মানুষের মাখনের মত নরম শরীর তার থাকে না, সে একটু কঠিন হয়ে পড়ে, দ্বিতীয়তঃ সে কথা বলতে পারে না, পারে না স্বপ্নের সুর শোনাতে। ছোট্ট এই দুটো ত্রুটিই থাকে ভাস্কর্যে।

তার পোষাকের রঙ বদলায় দিনে রাতে, আলো ছায়ায়। যদি হয় আকাশী নীল ছায়ায় হবে সোনা ঝরা রূপ। আর রেশমী মোজায় ঢাকা তার গোল গোল পা দেখলে ভেতরে ভেতরে সুড়সুড়ি জাগে, আঙুলে শোভা পাচ্ছে অনেকগুলো আংটি, সেই যেন অনেক স্মৃতির স্মারক।

ঘরের ভেতর এগিয়ে এলো সে খানিকটা। মুখে ছড়িয়ে পড়েছে লাল আভা। উপস্থিত দর্শকদের সকলেই একটু নড়ে চড়ে বসল। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল তাদের মধ্যে। সোরগোল উঠল। সকলেই বলাবলি করতে লাগল, এ কেমন করে সম্ভব? সকলেরই চোখে মুখে বিস্ময়ের রঙ। সত্য সত্যিই কি এ তেওদোর দ্য সেরানস? এই কি সেই দারুণ অশ্বারোহী, দ্বৈতযুদ্ধে অসামান্য দক্ষ, ক্ষিপ্রতর ক্রীড়াবিদ তেওদোর? না কি এ হল তার যমজ বোন? কেউই নিশ্চিত হতে পারছিল না এ ব্যাপারে।
তেওদোর এমন ভাব দেখাল যেন সে জীবনে কখনো অন্য পোষাক পরেনি। তার হাঁটাচলায়ও কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না, আগের মতই সে তার গুণগ্রাহী নিয়ে মত্ত হয়ে রইল। সকলেই অবাক হয়ে গেল। তাজ্জব বনে গেল তার সুদর্শন চেহারায়। একি স্বপ্ন, না মায়া, না বাস্তব? আহা, কী কমনীয় মুখ! কী অপূর্ব ছন্দোময় শরীরের বাঁধুনি। ওগো সুন্দরী রোজালিন, এছাড়া কেই বা হতে পারে তোমার অরল্যাণ্ডো?
আমি ভেতরে ভেতরে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। ভাবছিলুম, এছাড়া কেইবা রোজালিনের অরল্যাণ্ডো হতে পারে?
নিজের দিকে তাকালাম ভয়ে ভয়ে। কৌতূহলও বজায় রইল পুরোমাত্রায়। আমার মনের মধ্যে চলছিল বিপ্লব। বুঝতে পারছিলাম এরকম ভালবাসা কোনদিনই আগে পাইনি। যৌবনের জন্য এমন মাদকতা, এমন আগ্রহ উদ্দীপনা কোনদিনই তো আসেনি। আমার বসন্ত কি রোদনভরাই রবে? না, তা থাকতে পারে না। এই তো সেই সময় এ সময়েই বহে চলে যায় গন্ধমদভরে অলস সমীরণ। এখনইতো আনন্দছন্দের হিন্দোলে মুখরিত ধরাতল, যৌবনের উল্লাসহিল্লোল বসন্ত। আহা, বসন্ত। পবনে পবনে ছড়িয়ে দাও তোমার কেশররেণু, খোলো খোলো হৃদয়দল খুলে, হৃদয় দোলায় দুলে, উড়িয়ে নাও আমায় যৌবনের ডানায় ডানায়। এসো এসো, আমার বসন্ত তুমি এসো। এইতো আমার ভালবাসার কাল মধুমাস।
ভাবতে ভাবতে আমি নিজেকে প্রায় হারাতে বসেছিলাম। এক সময় টের পেলাম তেওদোরের আকর্ষণ বড়ো তীব্র হয়ে বাজছে, আর যখনই তা বুঝতে পারলাম, একরকম জোর করেই, ভয়ে ভয়ে নিজেকে সরিয়ে সমর্পণ করলাম রসেটির বাহুবন্ধনে। যদিও রসেটি আর তেমন করে আমায় নাড়া দেয় না, তার প্রতিও নেই আমার ব্যাকুল বাসনা। মনে মনে এখন একের ভিতর আরোপ করলাম অন্যের সৌরভ। ভেতরে ভেতরে তৃপ্তিও বোধ করলাম তাতে। ভাবতে লাগলাম তেওদোর মেয়েই, এবং আমি যদি ওর প্রেমে না পড়ি তাহলে জীবন—যৌবন মিছে সব। এ-ও ভাবলাম, ওকে আমি ভাল না বাসলেও সেতুবন্ধের ভূমিকায় ও আমার কাছে এসে আমাকেই ভালবেসে ফেলেছে।
আমার অভাবিত আবেগের জন্যে এখন কিছুটা করুণা হয়। হোক না করুণা, হোক না দুঃখ, তবু বলি, ওকে আমি ভীষণভাবে কাছে পেতে চাই। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে, দুনিয়াকে দুমড়ে-মুচড়ে বলতে চাই, চাই চাই তোমাকে কেবলি। কিন্তু জানি, যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই। জানি, মর্মে মর্মে দুরন্ত জ্বালায় পুড়তে

পুড়তে খাক হয়ে গেলেও আমার প্রেমের প্রার্থিতকে কখনোই পাবো না। বলতে পারি, যাকে চাই, সে আমার নয়। আমি চির অতৃপ্ত-অখুশী। ফলে রসেটির সঙ্গে আমার শীতল সম্পর্কই রইল অব্যাহত।

যে দৃশ্যে তেওদোর তার ঘর থেকে শেকল খুলে নিয়ে আমাকে ছুঁড়ে দিল, তখন তার চাউনিতে যে নম্রতা, যে প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর ছিল তা আমার পক্ষে তোমাকে বোঝানো দুঃসাধ্য। কী অসামান্য ভঙ্গিমায়, ছন্দহিল্লোলে সে বলল, 'হে দুঃসাহসী নাইট, এতে জড়িয়ে রেখো আমার স্মৃতি, তোমাকে দেবার মতো যদি অধিক কিছু থাকত তাহলে সেটাও দেবার জন্য প্রস্তুত এই মেয়েটির স্মৃতি তুমি বহন কোরো।' শুনতে শুনতে আমি কেমন হয়ে যাচ্ছিলাম। ভেতরে ভেতরে দারুণ তোলপাড় হচ্ছিলাম। এখন ভাবি এমন আবেগমদির স্বরের কি আমি যোগ্য? আমি কি বইতে পারি তোমার ভার? পারিনি, তাকে কিছুই বলতে পারিনি, যদিও সে চেয়েছিল আমি বলি কিছু বলি। হায়রে অরল্যান্ডো, বেচারা অরল্যান্ডো।



তৃতীয় দৃশ্যে আবার রোজালিন এলো। এবার তার পুরুষের বেশ, নাম, গানিমেড, সঙ্গে তার ভাইঝি সিলিয়া। সে-ও তার নাম ভাঁড়িয়ে হয়েছে আলিয়া।

এই দৃশ্যটি আমাকে অভিভূত করতে পারেনি। মেয়েদের পোষাক-আষাকেই আমি অভ্যস্ত, অন্যকিছু দেখতে আর ভাল লাগে না। ফলে, পুরুষের বেশে যখন তেওদোর এসেছিল তখন আমি বিষন্ন ছিলাম। হয়তো এর প্রয়োজন ছিল। কেননা, দুঃখকে ভালমত বোঝানোর জন্য চাই সুখ, বেদনা ফোটাতে চাই আনন্দের প্রকাশ। অন্ধকারের তীব্রতা বোঝাতে যেমন দরকার মার্তণ্ডের দারুণ প্রতাপ।

ত্রয়োদশ লুইর সমকালীন রাজপোষাকে হয়েছিল সে সজ্জিত। মাথায় ছিল টুপি, তাতে ছিল ঢিলে ঢালা পোষাক।

পুরুষের চেহারাতেও বেশ মানিয়েছিল। চালচলন কথাবার্তা সব কিছুই ছিল তার ভয়ংকর পুরুষালি। যেমন চওড়া পাছা, তেমনি বিশাল বুক। তাকে দেখলে ক্ষণিকের জন্যেও কারোর সন্দেহ জাগবে না যে সে ছেলে না মেয়ে।

তবু, থেকে থেকেই কে যেন আমার কানে কানে বলে চলল, তেওদোর ছেলে নয়, সে

মেয়ে। আমার চোখ মনও কিছুতেই মানতে চাইছিল না তেওদোরকে ছেলে বলে। সত্যিই সে অদ্ভুত। ক্ষণে ক্ষণে তার বিচিত্র রূপ, বিচিত্রতর ছলনা।
তুমি কি এ নাটকটা পড়েছ? বোধ হয় না। এক পক্ষকাল ধরে আমি শুধু নাটকটি পড়েছি, বারবার আবৃত্তি করেছি, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছি প্রতিটি শব্দ। আমার ধারণা আমি যেভাবে বুঝেছি, যে-ভাবে নাটকটির আত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছি, এমন আর কেউ কখনো হয়নি।
যাই হোক, তোমার যদি ইচ্ছে হয় নাটকটা পড়ে দেখো, অবশ্য তোমার না পড়া থাকলেও তোমার কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই, কেননা যতই মনে মনে চাও গল্পটা আমি এখুনি থামাতে পারব না। তুমি পড়েছ ধরে নিয়েই, আমি চালিয়ে যাব তার কাহিনী, বিশেষ করে আমার বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায় এমন অংশটাতো তোমাকে জানাতেই হবে।
বনের ভেতর দিয়ে রোজালিন হেঁটে চলেছে, সঙ্গে রয়েছে সিলিয়া। এধার-সেধারে ঝোপ-ঝাড়, কোথাও বা সারবাঁধা রাঙচিতার বাহার। কয়েকটা গাছের ডাল ছাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে রোজালিন জিজ্ঞেস করল—'এমনভাবে কে নষ্ট করেছে সতেজ সপ্রাণ গাছগুলো?' বলা বাহুল্য, অরল্যান্ডের সঙ্গে অনেক আগেই দেখা হয়েছিল সিলিয়ার। সেই জানাল কে তুঁতগাছের ঝোপের ওপর রেখে দিয়েছিল প্রেম-নিবেদিত কবিতা।
একসময় অরল্যান্ডোর মুখোমুখি হল রোজালিন। প্রথম পরিচয় তাদের খুবই সাধারণ। রোজালিন জানতে চেয়েছিল কটা বাজে। তারপর হলো নানান কথা। কথার পিঠে কথা হল। কোন কোন কথার দ্যুতি ঠিকরে বেরুতে লাগল। লোহার পাত আগুনে গরম করে যখন হাতুড়ি পেটানো হয়, তখন যেমন অনেক ফুলকি বেরোয় তেমনি ওদের কথাবার্তা থেকে ছিটকে আসতে লাগল অনেক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। নক্ষত্রের মতো জ্বল-জ্বলে সংলাপে রোজালিনে জানতে চায় কে এমন হৃদয় নিঙড়োনো কবিতা লিখতে পারে? অরল্যান্ডোকে সে বলল যে সে জানে কিনা সেই বেদনাবিদ্ধ কবির নাম। এ ও জানালো যে সে (রোজালিন) তার হৃদয়ের রোগ সারানোর পথ বাতলে দিতে পারে। অরল্যান্ডো স্বীকার করল যে সে-ই হল সেই রক্তাক্ত যুবক, যে তার বুকের উপর এক একটা শিরা ছিঁড়ে অশ্রুসিক্ত কবিতার পংক্তি রচনা করেছে। অরল্যান্ডোই হল সেই প্রেমবিদ্ধ যুবক। রোজালিন বলল, তাহলে তুমিই সেই প্রেমিক? অথচ তোমার মধ্যে তো এমন কোন লক্ষণ নেই যাতে বোঝা যাবে তুমিই সেই প্রেমিক। তোমার না আছে শঙ্খগ্রীবা, না আছে তোমার ঘন কালো চোখ। পায়ের মোজা ঝুলে পড়েনি গোড়ালিতে, জামার বোতামগুলিও খোলা নেই, জুতোও বেশ চকচকে আর ফিতেও মজবুত করে বাঁধা। যদি সত্যিসত্যিই কারো প্রেমে পড়ে থাক তাহলে তুমি পড়েছ নিজেরই ব্যক্তিত্বের সঙ্গেই। নিজের প্রেমেই তুমি বন্দী। ফলে, তা সারাবার কোন পথ আমার জানা নেই।'
আমিও গোপন করলাম না আমার আবেগ। বললাম, 'ওগো সুন্দরীতমা, আমি তোমায়

বোঝাতে চাই যে আমার ভালবাসা তোমায় ঘিরেই।'
এমন অদ্ভুত অভাবিত উত্তর সে আশা করেনি। কোন কবির পক্ষে লেখায় যা ফুটিয়ে তোলা যায় তা যে এমন মুখোমুখি কেউ বলতে পারে তা সে ভাবেনি। তবু আমি তেওদোর কে বললাম সে কথা। হয়তো, তখন তার ঠোঁটের কোণে খেলে যাচ্ছিল বাঁকা বিদ্যুৎ। তবু সুন্দর লাগছিল ওকে। অব্যক্ত মাধুর্য যেন ছড়িয়ে পড়েছে মুখে; কপালে চিক চিক করে উঠছে ভোরবেলায় প্রসন্নতার আলো। তার যৌবন টলমল অপরূপ মুখে আমি দেখতে পেলাম মহানুভবতার রামধনু রঙ।
'আমায় কি এসব বিশ্বাস করতে হবে? বরং, যে মেয়ে তোমায় ভালবাসে তার কাছেই এসব কথা তুমি বলো। তার কাছেই খুলে দাও তোমার হৃদয়ের গোপন দুয়ার। জানি, মেয়েরা অনেক কিছুই গোপন করে, বিবেকের কাছে ঝুড়িঝুড়ি মিথ্যা বলে; তবু তুমি যেহেতু নিজের কাছে বিশ্বস্ত, যেহেতু তুমি রোজালিনকে উপহার দিয়েছ তোমার ভালোবাসার অর্ঘ্য, তখন আর তোমার দুঃখ কিসের?'
যখন সে জানে যে এই কবি অরল্যাণ্ডো ছাড়া আর কেউ নয় এবং রোজালিনই তার আকাঙ্ক্ষিতা, তখন রোজালিনই হতে পারে তার শুশ্রূষাকারিণী। কখনো সে হাসে কখনো কাঁদে, কখনো মুখে তার বসন্তের বর্ণময় উদ্ভাস, আবার কখনো মুখে বর্ষার জলভরা কালোমেঘ, একদিন সে তার প্রেমিককে জানায় উষ্ণ অভ্যর্থনা, আর একদিন তার ব্যবহারের ফুটে উঠে নিদারুণ শীতলতা। প্রেমের পথই বোধহয় বিচিত্র, জটিল। ভালবাসার গতি বোঝা ভার। বড়ো সর্পিল তার গতি। তাই সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি দুঃখ যায় তার ঠাঁই। অথচ একমাত্র ভালবাসাই সারাতে পারে সমস্ত রোগ। ভালবাসার আকাশেই জ্বলে হৃদয়ের শুকতারা; প্রেমই জীবনের ধ্রুবতারা। যতই শুধাই, ওগো বিদেশিনী, তুমি হাস শুধু মধুরহাসিনী; বুঝিতে না পারি কি জানি কি আছে তোমার মনে। অরল্যাণ্ডো অসুস্থ। রোজালিন তাকে শুশ্রূষা করতে চাইল। শুধু একটি শর্ত আরোপ করল সে। বলল, 'তোমাকে আমি সারিয়ে তুলতে পারি অরল্যাণ্ডো, যদি তুমি আমায় রোজালিন বলে ডাকো, আর রোজ একবার করে আসো আমার কুঁড়েঘরে।' অরল্যাণ্ডো বিস্মিত, হতবাক। সে বলল, 'অনায়াসেই যেতে পারি হে যুবক।' সঙ্গে সঙ্গে রোজালিন বলল, 'না, না, না; আমায় তুমি রোজালিন বলে ডেকো।'
আমাকে বোধহয় ভুল বুঝেছে। ভেবেছে, যা নেই আমি হয়তো তাই খুঁজছি। কিন্তু মনে হল, তেওদোর আমার প্রেমে পড়েছে, আর আমিও মনে মনে স্থির করলাম তার বিশ্বাসে আমি চিড় ধরাবো না। এমন কোন কথাও বললাম না যাতে আমি তার কাছে প্রতিপন্ন হই নিমকহারাম। নিশ্চয়ই চালাক চতুর মহিলা বুঝতে পারছিল আমার ভেতরে তখন কি তোলপাড় চলেছে। কি অসম্ভব অস্থিরতায় আমি দুলছি। অথচ আমাকে কোনদিনই একটি মুহূর্তের জন্যেও কোন অভিজাত সুন্দরী কুমারী প্রতারিত করতে পারেনি।
এমনি করে কেটে গেল নিষ্ঠুর সময়।

যখন ভাবি এসব কথা তখন মনে হয় স্বপ্নের ভিতর দিয়ে হাঁটছিলাম আমি। মনে হয়েছে, পাখীর পালকে তৈরী বিছানায় নরম বালিশে মাথা রেখে কোন সুন্দরীর উদ্দেশে বলছি, 'আমি প্রেমে পড়েছি।' কিছুতেই যেন উচ্চারণ করতে পারলাম না 'আমারও টাকা আছে।'

ভোরবেলা উঠলাম ঘুম থেকে। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম নিজেকে। নিজেদের ওপর শ্রদ্ধা বোধ হল। কবিতার পংক্তির মতোই সুসজ্জিত করলাম কেশ।

আমিও হয়তো সবচেয়ে সুখী জীবন কাটাতে পারতাম, সুখী কুকুরের লেজ নাড়ার মত আমিও পার করে দিতে পারতাম দিনগুলো রাতগুলো।

কিন্তু ভগবান আমায় তার জন্যে তৈরী করেন নি।

যে আমাকে নাড়া দিয়েছে, বিচলিত করেছে, ঈশ্বরও তাকে তৈরী করেছে আর এক ভাবে। তার দেহে নারীর রূপ, চলনে রমণীয় রমণী ভঙ্গিমা, কিন্তু তার হৃদয় হলো পুরুষের।

প্রেমিক আমার দক্ষ শিকারী, অঙ্গে তার নানান আঘাতের চিহ্ন। অনেকের সঙ্গেই করেছে সে বহুবার দ্বৈতযুদ্ধ, অন্তত তিন চারজনকে সে মেরেছে, নইলে আহত করেছে। ঘোড়ার পিঠে সে হয়ে ওঠে অসম সাহসিক, ভয়-ডর বলতে কিছুই থাকে না। বহু ঘাটের জল খাওয়া, বহু যুদ্ধের প্রাজ্ঞ সেনাপতি সে। যে কোন সুন্দরী হৃদয়ের পক্ষে এইসব গুণ সুদুর্লভ, তবে আমার ক্ষেত্রে তার কোন ব্যতিক্রম ঘটল না।

কারণ ছাড়াই আমি হুসলাম। ভিতরে ভিতরে আমি ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি; বিধ্বস্ত হয়েছি। এবং গত দু'মাস আমার কাছে দু'বছর বলে মনে হল। শুধু দু'বছরই বা বলি কেন এ যেন দুই শতাব্দী। বিচিত্র ভাবনায় আমি ছিলাম উত্তেজিত, নানান দুশ্চিন্তায় মনমরা, আশা নিরাশার দোলায় ভয়ংকর দোদুল্যমান। আলো-অন্ধকারে, রোদে-মেঘে আমার জীবনটা হয়ে উঠেছিল প্রবল অস্থির। মাঝে মাঝে মনে হয় কেমন করে আমি এতদিন বেঁচে আছি। যখন ভাবি এসব তখন বড়ো অবাক লাগে। চিমনির ভিতর দিয়ে আলোর শিখা দেখা গেলেও আমার শরীরের ভিতর দিয়ে ফুটে ওঠে না আমার চিন্তা-ভাবনা, স্বপ্ন-আবেগ। আমি এক উদভ্রান্ত ইচ্ছার বিভীষিকাময় রাজত্বে রয়ে গিয়েছি, সেখানে কেউই দেখতে চায় না আমার আমি-কে। আমার হৃদয়ের অলিগলিতে প্রতিটি মুহূর্তে যতসব ভাবনার আলো পড়ে সেসব জিনিস রসেটি বরাবরই উপেক্ষা করেছে, সহজে বলা যায় উপেক্ষা সে করেছে আমাকে। যত তাকে কাছে পেতে চেয়েছি ততই সে সরে গেছে বরং মনে হয়েছে তেওদোরকে সে ভালবেসেছে বেশী করে। আমার সঙ্গে তার ব্যবহারে এসেছে হিমের পরশ, আমারও শীতল আচরণ এতে জুগিয়েছে রসদ, আমি যেন ওর এখন প্রাক্তন প্রেমিক বা পুরণো প্রভু। এখন যেন আমি আর ওর বিশ্বাসের আশ্রয়স্থল নই। তেওদোরের আচরণে কোন পরিবর্তন নেই, আমার ব্যাপারে নেই ওর উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ-সংশয়। সহজভাবেই

মেনে নিয়েছে সে আমায়। একেবারে ঘরোয়া স্বরে কথা বলে, বন্ধুত্বের ছোঁয়া থাকে তাতে। সমবয়সীর সঙ্গে লোকে যেমন দিলখোলা হয়, আমার সঙ্গে তোওদোর সেভাবেই কথা বলে। আমরা এই দুজন সব বিষয়ে আলোচনা করি—গল্প, কবিতা, এবং আরো অনেক অনেক বিষয়। তবে এমন কোন কথা হয় না—যা গোপনীয় বা রহস্যময়।

বোধহয় সে জানত তার ছদ্মবেশ আর বেশীদিন চলবে না। অবশ্য আমিও সেব্যাপারে কিছু জানতাম না। তবু, রোজালিনের উচ্চারিত অনেক সংলাপই যে দ্ব্যর্থবোধক ছিল, অনেক কথাই যে রেখেঢেকে বলা হয়েছিল, যা ইচ্ছে করে কুয়াশাবৃত রাখা হয়েছিল তা ধীরে ধীরে টের পাচ্ছিলাম।

সেই দৃশ্যটির কথা বারবার মনে পড়ে। রোজালিন অপেক্ষা করে রয়েছে অরল্যাণ্ডোর জন্যে। কিন্তু আরল্যাণ্ডো এসে পেঁছিতে পারেনি। ভিতরে ভিতরে দারুণ অস্বস্তি বোধ করছে রোজালিন, সঙ্গে রয়েছে আলিয়াঁ। সাধারণতঃ সব প্রেমিকই তার প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে নির্দিষ্ট সময়ের ঢের আগে এসেই হাজির হয়, অথচ অরল্যাণ্ডো এসে তখনো পেঁছিল না। মনে মনে দারুণ গালাগাল দিতে লাগল। আলিয়াঁকে তো একসময় বলেই ফেলল; 'আলিয়াঁ, আহা তুই যদি জানতিস তাহলে বুঝতে পারতিস আমি প্রেমের কোন অতলে ডুবতে বসেছি।' বলাইবাহুল্য, অসামান্য ভঙ্গিমায় একথা উচ্চারণ করেছিল সেদিন রোজালিন। কোমলতা, বিচ্ছিন্নতা, আর উৎকণ্ঠার অপূর্ব মিশ্রণে সেই সংলাপ মোচড় দিয়েছিল আমার অন্তরে। থর থর করে কাঁপছিল তার ঠোঁট, ঝরে পড়ছিল আবেগের মদিরতা, মনে হচ্ছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটবে কোন বিপর্যয়, হবে বিস্ফোরণ।

ওহো! তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে রসেটি রোজালিনের ভূমিকায় অভিনয় করতে চায়নি। যদিও আমি মনে মনে ওকেই নির্বাচিত করেছিলাম রোজালিনের জন্যে। বরং রসেটি আর একটি ছোট্ট চরিত্রের অভিনয় করতে চেয়েছিল সেটি হল ফেবে। ফেবে ছিল মেষপালিকা, ভালবাসত মেষপালক সিলভিয়ুসকে। চাঁদের মতই শীতল হল ফেবে, হৃদয় তার তুষার, আর সে তুষার গলে না কোন অগ্নিতাপেই। তুষার জমে জমে এত পুরু আর শক্ত হয় যেন হীরে, কিন্তু সেই হীরেও গলে যায় যখন ফেবে দেখে উর্দিপরা ভৃত্যের বেশে গানিমেডরূপী রোজালিনকে। বরফ গলে হয় অশ্রু, হীরে হয় মোমের চেয়েও নরম। গর্বিতা ফেবে একদিন উপেক্ষা করত প্রেমকে, আর আজ সেই প্রেমেরই আলোয় সে আলোকিত। হৃদয়ে তার মুঞ্জরিত প্রেম, সঞ্চারিত ভালবাসার সুর। বেচারা সিলভিয়ুসকে চিঠি দিয়ে পাঠাল রোজালিনের কাছে। চিঠিতে মেলে ধরল তার মন, ছড়িয়ে দিল ভালবাসার রঙ, ফুটিয়ে তুলল আবেগের বর্ণময় ফুল। হতভাগ্য সিলভিয়ুসকে স্পর্শ করল রোজালিন, ঝরে পড়ল করুণা, জানাল ফেবের ভালবাসার প্রতিদান দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রত্যাখ্যাত হল ফেবের প্রেম। বোধহয় এটারই দরকার ছিল তার। তবে রোজালিন তাকে জানাল যে সিলভিয়ুসের সঙ্গে সে যেন খারাপ ব্যবহার না করে, এবং তার মনে যেন

জাগিয়ে রাখে আশার ভুবন।

রসেটি তার অভিনয় সুন্দরভাবেই সম্পন্ন করে। তবে তার চোখে মুখে ছিল বিষণ্ণতার ছায়া; ছিল ভগ্ন মনোরথের বেদনা। রোজালিন যখন বলেছিল, 'পারলে তোমায় ভালবাসতুম' তখন রসেটির গাল বেয়ে বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। ফেবের কাহিনীর সঙ্গে নিজেকে হয়ত মিলিয়ে নিয়েছিল রসেটি, একের বেলায় যা সুখের, অন্যের ক্ষেত্রে সেটাই হয় দুঃখের, বেদনার। আমার ভাগ্যটা সত্যি সত্যিই খুব ভাল, নইলে কেনই বা তেওদোর হবে বাস্তবিকই মেয়ে। দুঃখ হয় রসেটির জন্যে, কেননা তেওদোর আসলে পুরুষ নয় এবং সে তার সঙ্গে এমন প্রণয়বিমুগ্ধ সময় কাটাল যেখান থেকে একদিন তার পতন হবে, খান খান হয়ে যাবে স্বপ্নের মিনার।

নাটকের শেষ মুহূর্তে গানিমেডের ভৃত্যবেশ ছেড়ে বেরিয়ে আসবে আসল রোজালিন, জানা যাবে যে সে মেয়ে, ডিউক চিনতে পারবেন তাঁর কন্যাকে, অরল্যাণ্ডো ফিরে পাবে তার মিসট্রেসকে। ঝরবে পুষ্পবৃষ্টি, মঞ্চ জুড়ে দেখা দেবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। তিনটি বিবাহ অনুষ্ঠান হবে সুসম্পন্ন। অরল্যাণ্ডো বিবাহ করবে রেজ্জলিনকে, ফেবে করবে সিলভিয়ুসকে আর ভাঁড় টাচস্টোন করবে অড্রিকে। ধীরে ধীরে শেষ হবে কাহিনী, মঞ্চে নামবে পর্দা।

নাটকটি নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। এ যেন নাটকের ভিতর নাটক। আমরা যে যার অভিনয় করলাম তা হয়ে উঠল প্রতীক, হয়ে উঠল বাস্তবের পূর্বাভাস। ভিতরে ভিতরে যে স্বপ্ন আমরা লালন করেছি তারই বাস্তব প্রতিলিপি যেন অন্যতর দ্যোতনায় আমাদের কাছে দ্যোতিত।

না, আমি আর অন্ধকারে হেঁটে বেড়াব না। হতে পারব না আর বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত পথিক। তেওদোরকে আমি আরো সুনির্দিষ্টভাবে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করব। ওর সঙ্গে কথা বলব স্পষ্ট করে। বিশবার অন্তত ভেবেছি ওর সঙ্গে কি কি কথা বলব; কিন্তু আশ্চর্য, কোনদিনই সেকথা উচ্চারণ করতে পারিনি। কতদিনই তো ও আর আমি একসঙ্গে কাটিয়েছি পার্কে, পাশাপাশি হেঁটেছি, গল্প করেছি; কত বিষয়ে আলোচনা করেছি, কত কথা বলেছি ঘরের ভিতর, কখনো আমি গিয়েছি ওর ঘরে, কখনো ও এসেছে আমার কাছে, তবু সব কথা স্পষ্ট করে বলতে পারিনি। যখনই যা কিছু বলতে চেয়েছি, দেখেছি অন্য কথা এসে ভিড় করেছে মুখে, কিছুতেই পূর্বসংকল্পিত কথা ওকে বলতে পারিনি। বলতে চেয়েছি, তেওদোর তোমায় আমি চিনে ফেলেছি, এবার খসাও তোমার ছদ্মবেশ,' কিন্তু পারিনি। বলতে চেয়েছি, 'তেওদোর তোমায় আমি ভালবাসি,' কিন্তু বলতে পারিনি। বরং ভালবাসার বদলে শুনিয়েছি ওকে বৃষ্টির গল্প, বলেছি ঝলমলে আবহাওয়ার কথা। অথচ জানি, যে সুযোগ আমি পেয়েছি এমন অনেকের ভাগ্যেই জোটে না।

আঃ, স্বাধীনতা কি রোমাঞ্চকর! প্রেম কত রমণীয়! ভালবাসার রঙেই মরা গাছে ফোটে ফুল, পাখীরা গায় গান, বনে বনে ছড়িয়ে থাকে সুমিষ্ট সুবাস, পাহাড়ের ঢালে ঢালে সোনাঝরা ফুল আর রুপোর মুকুল। প্রেম, আহা প্রেম, সে যে নিঃসঙ্গ আবার

সে যে কোলাহল মুখরিত। সে সুর, সে গান, সে ছন্দ আবার সে-ই ভয়ংকর বিস্ফোরণ, অগ্ন্যুৎপাত। প্রেমের নির্জনতায় শোনা যায় দুটি হৃদয়ের ধ্বনি, একে অপরের বাহুতে নেয় আশ্রয়। দুই নৈঃশব্দের মাঝখানে স্পন্দিত বীজের মতো থাকে ভালবাসা, হতে চায় মুকুলিত। আলোয় আলোয় পৃথিবী হয়ে ওঠে রহস্যময়ী, সমস্ত আকাশ আলো মেঘ পাখীর ডানায় বোনা হয়, দেহ হয় মর্মরিত, লাগে সততার দীপ্ত। ভালবাসার রোদে-জ্যোৎস্নায় ভাসে পৃথিবী। আহা; প্রেম যেন সূর্যে জ্বলা পাহাড়ের চূড়ো, তা যেন অন্ধ বনের মাথায় নীলগাই চাঁদ। আমি সেই ভালবাসাই চাই। বুকের শিরা উপশিরা ছিঁড়ে বানাতে চাই ফুলের বাগান, অন্ধকারে উৎস হতে হতে চাই উৎসারিত আলো। একে যখন অপরের বুকে ঝুঁকে পড়ব, বাহুতে মাথা রাখব; তখন পায়ে পায়ে নেমে আসে যেন আকাশ, আর আমরা সেই বিশাল আকাশে উড়ন্ত দুজোড়া সোনালী ডানার পাখী হয়ে যাই।

আজ সকালে বেরোলাম। ভ্যাপসা গরম, আকাশে নেই নীলের ছিটে, ভেসে যাচ্ছে পশমী মেঘ। দিগন্ত চেনা দায়। দূরে দূরে উইলো লাগছে ছবির মতো।

আমি হাঁটছি, হাঁটছি, হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি, শরৎ এলো বুঝি। আহা গরমটা তাহলে চলে গেল!

গাছগুলো প্রায় ন্যাড়া হলেও কিছু কিছু কচি পাতা তখনো উঁকি মারছে মাথায়। নাহ্ আশা আছে। জানো, মরে যাওয়া ঋতু আমায় ভীষণ ভাবিয়ে তোলে। মনে হয় সময় জোরে ছুটে যাচ্ছে, আর আমিও সমান তালে এগিয়ে চলেছি মৃত্যুর দিকে।

ওকে নিয়ে আমি কিছুই স্থির করতে পারছিলাম না। একবার ভাবলাম; ওকে চিঠি লিখবো। কিন্তু সেটা কি হাস্যকর ঠেকবে না? রোজ যার সঙ্গে দেখা হয়, কথা বলি, তাকে চিঠি লিখছি ভাবলেই কেমন কৌতুক বোধ করি।

শেষ পর্যন্ত চিঠিই লিখলাম। এবং এটাও স্থির করে দেখলাম, তেওদোর যখন ঘরে থাকবে না, তখন আমি তার টেবিলের মাঝখানটায় ওটা রেখে আসব। হ্যাঁ, এটাই আমাকে করতে হবে, যতই নাটুকে মনে হোক না কেন, এছাড়া উপায় নেই।

স্বপ্নের মিছিল

তোমায় আমি কথা দিয়েছিলাম যে আমার অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী পুরো জানাব। কিন্তু লেখার ব্যাপারে আমার যে কি ভয়ংকর আলসেমি তা তো তুমি জানোই। তুমি এও জানো তোমাকে আমি কত ভালবাসি। তুমি শুধু আমার চোখের মণিই নও, তোমার সম্পর্কে আমার কৌতূহলও প্রচণ্ড। এমনকি ঈভ বা সাইকিকে জানার জন্যেও আমার এতখানি আগ্রহ নেই। সে যাই হোক, তোমায় যখন কথা দিয়েছি তখন সেকথা আমার রাখতেই হবে, আর তার জন্যে যদি দিস্তে দিস্তে কাগজও লাগে আমার পিছু হটলে চলবে না।

ভাবতে পারো তুমি যে, এই পৃথিবীতে আমি আমার প্রিয়তম বন্ধুর কাছ থেকে ১৮ লীগ দূরে রয়ে গেছি। হে মন শান্ত হও, ধৈর্য ধরো। জানি, হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না, ফিরে আসবে না সেই ছেলেবেলার মন মাতানো দিন। যদি পরতো পারতাম আমার স্কার্ট, তাহলে নিশ্চয়ই ফিরে আসতো আমাদের ছেলেবেলা।

চুলোয় যাক এসব ভাবনা। সেই ভয়ংকর রাত শেষ হলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম সরাইখানা ছেড়ে। শুরু হল আমাদের একই সঙ্গে যাত্রা, একই দিকে চললাম আমরা। সকলেই পঞ্চমুখ আমার ঘোড়ার প্রশংসায়। দেখতেও যেমন সেটি সুন্দর, ছোটেও তেমনি জোরে। আমি যেভাবে লাফ দিয়ে চড়ে বসলাম ঘোড়ার পিঠে তাতে সঙ্গীরা সব অবাকই শুধু নয়, ভয়ও পেল। তাদের অবস্থা বুঝতে পেরে আশ্বস্ত করলাম। বললাম, ভয়ের কিছু নেই, এভাবেই আমি অভ্যস্ত। জোরে ছুটিয়ে দিলাম ঘোড়া এবার।

সকলকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে এগিয়ে যেতেই আমি থামালাম আমার বাহন। ক্ষণিকের জন্যেও ওদের মনে সন্দেহ জাগল না যে সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় ফেরত একজন যুবা কেমন করে এত ভাল অশ্বারোহী হতে পারে। আমাকে ঘিরে সংশয়ের মেঘও ছায়া ফেলেনি। বরং যেভাবে তারা আমায় আপন করে নিয়েছিল তা ভাবাই যায় না।

মেয়েদের পোষাক-আষাক ছেড়ে পুরুষের বেশ ধরলেও আমি ভুলতে পারি না মেয়ে হিসেবে আমার গর্বিত অস্তিত্ব। তবু পুরুষের মধ্যেই কাটাতে লাগলাম দিব্যি। বাইরের দিক থেকে আমি বেশ দশাসই পুরুষই বনে গেলাম, একমাত্র যে ব্যাপারে মনে মনে শঙ্কা ছিল তা হল পুরুষের সাহস কোথায় পাব। যতই হোক, প্রকৃতির নিয়মেই মেয়েদের চেয়ে পুরুষ বেশী শক্তিশালী। তাও ম্যানেজ করলাম। সত্যি কথা বলতে কি আমি কখনোই রোগা-পটকা ছিলাম না, তবে পুরুষের যে-নিষ্ঠুরতা তার গর্ব তা-তো আমার নেই। আমি নিজেকে কিছুটা ষণ্ডামার্কা, খানিকটা উদ্ধত করতে চাই; কেন না তাহলে সমাজে কল্কে পাওয়া সম্ভব, পায়ের তলায় পাওয়া যাবে মাটি। স্বাভাবিকভাবেই আমার পরিবর্তিত সত্তা ভোগ করতে পারবে যাবতীয় আনন্দ, উৎসব।

অবশ্য ব্যাপারটা বলা যত সহজ, কাজ ততটা নয়।

যার সঙ্গে আমি একই বিছানায় রাত কাটিয়ে ছিলাম আমার সেই সঙ্গীটির ব্যবহারে আমি মুগ্ধ। সে সব সময়েই আমার পাশে পাশে চলেছে তার ঘোড়া নিয়ে।

আমি অবশ্য তাকে প্রেমিক বলে ভাবতে পারি না কখনো। এমন কি সে যদি আমাকে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর ও দামী আংটিও উপহার দেয় তবু তাকে আমি অন্য কিছু ভাবতে পারি না। সত্যের খাতিরে আমাকে বলতেই হবে যে সে বেশ চালাক চতুর, পড়াশোনাও করেছে এবং তার রয়েছে এক হাস্যরসিক মন। জানি, হাসিটা শুধু মুখের নয়, হাসিটা মনেরও। তবু তার কিছু কিছু ব্যাপার আমায় পীড়া দেয়। বিশেষ করে মেয়েদের ব্যাপারে কথা বলতে গেলে সে এমন অবমাননাকর কথা বার্তা বলে যা শুনলে রাগে জ্বলে যায় শরীর, ইচ্ছে করে ওর চোখ দুটোকে উপড়ে ফেলি। যদিও সে অনেক নির্মল সত্য কথা বলে, তবু কেন জানি না মেয়েদের ব্যাপারে নিষ্ঠুর সত্যভাষণ আমায় দুঃখ দেয়। আসলে কি জানো? আমি পুরুষের পোষাক পরলেও, ছদ্মবেশ ধারণ করলেও, মনে মনে তো জানি আমি মেয়েই।

আমার সেই সঙ্গীটির সঙ্গে আমার বেশ দহরম মহরম হয়েছে। সে-ও মাঝে মাঝে আমার কাছে আসত কখনো কখনো আবার সঙ্গে নিয়ে আসত তার এক বোনকে। ভগ্নীটি বিধবা হলেও শোকের চিহ্ন তার চোখে মুখে দেখিনি। সে থাকে তার এক বৃদ্ধা খুড়ীর সঙ্গে, পুরণো ম্যানসনে। এই বোনকে সঙ্গে নিয়েই একদিন সে এলো আমার কাছে। নানান গপ্পো সপ্পোর পর সে আমাকে তাদের বাড়িতে যাবার অনুরোধ করল। সঙ্গত কারণেই আমি রাজি হইনি। তবু সে নাছোড়বান্দা। এত জোরাজুরি করতে লাগল যে বাধ্য হয়েই বলে ফেললাম ঠিক আছে থাকা যাবে। সে বলল, ঐ শুধু গেলেই চলবে না, অন্তত দিন পনেরো থাকতেও হবে। শেষ পর্যন্ত রাজিই হতে হল, এবং সে রকম ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফেলল সে।

তারপর একদিন চললাম সেই ম্যানসনের উদ্দেশে। সঙ্গী আমার সেই একদিনের শয্যার সেই যুবকটি। সেই দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পথ। রাস্তাটা একজায়গায় এসে দুদিকে বেঁকে গিয়েছে। ডান দিকে বাঁক নিলাম আমরা। হঠাৎ সে বলে উঠল,

'এই তো এসে গেলাম, আর কি!'

অবশেষে আমরা এসে পেঁছলাম নির্দিষ্ট জায়গায়।

সার সার গাছ আর ফুলের বাগানের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা দেখলাম অনেকগুলো বাড়ি। অনেকগুলো ব্লক ভাগ করা। কোন কোন বাড়ি সবে তৈরি হয়েছে কোন কোনটা বেশ পুরণো, কোনটা আবার পুরোপুরি তৈরি না হয়েই অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মাঝখানের ব্লকের বাড়িগুলোর জানালা সব খোলা রয়েছে। বিস্তৃত ব্যালকনি।

চার পাঁচটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

তাদের চেঁচামেচি বেড়ে গেল আবার আমাদের ঘোড়াদুটিকে ঘিরে। এক-একটা কুকুর এমন লাফিয়ে উঠছে যেন ঘোড়ার ঘাড়ই কামড়ে ধরবে। তবে সঙ্গীর ঘোড়াটার ওপর তেমন কোন হামলা হল না। কুকুরগুলো বোধহয় চিনতে পেরেছে তাদের পুরণো দোস্তকে।

চেঁচামেচিতে একজন সহিস বেরিয়ে এল। একে দেখতে অবশ্য পুরোপুরি সহিসের মতো নয়। তবু সে এগিয়ে এসে ঘোড়াগুলিকে নিয়ে গেল আস্তাবলে।

আমরা একটা ব্লকের সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগলাম। পায়ের আওয়াজেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক একটা ঘরের দরজা খুলে গেল। সে ঘরের মানুষ আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে মনে হল।

একদম উপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক মহিলা। সে একটু জায়গা করে দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। আমার সঙ্গীটি তার কাছাকাছি পেঁছুতেই মহিলাটি ঝুঁকে পড়ে ওর মুখে চুমু খেল। সঙ্গীটিও ওকে জড়িয়ে ধরে স্নেহভরে চুমু খেয়ে পাঁজাকোলা করে উপরে তুলে নিল।

'আলকিবায়েডস্, তোমার মত ভাই পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই আপনাকে বলতে হবে না যে এ আমার ভাই?'

আমি যে কি জবাব দেব বুঝতে পারছিলাম না। মনে মনে বললাম, ভুল সবই ভুল। ভাবলাম, তোমার ভাই হওয়া যেমন কিছুটা দুর্ভাগ্যের, তেমনি তোমার প্রেমিক হওয়া। যাই হোক, সে মুহূর্তে আমার মনে হল আমি যেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী এবং অসুখী নাইট। আমি শুধু হাসলাম। তারও মুখে লাগল আলতো মিষ্টি হাসির ছোঁয়া।

কথা বলতে বলতে আমরা একটা নিচু হলে ঢুকলাম। ঘরখানা বেশ সাজানো গোছানো।

'তোমার আমার কথা তোমার খুড়ীকে জানিয়ে আসি আলকিবায়েডস্।'

'না, না, বোন, এটা এমন কোন জরুরী ব্যাপার নয়। এসো, সেরানেস, বরং একটু বসি, কথাবার্তা বলি। হ্যাঁ, আমার সঙ্গী এই ভদ্রলোকটিকে তো চেনো। ইনিই হলেন তেওদোর দ্য সেরানেস। কয়েকদিনের জন্যে এখানে থাকবেন উনি। এঁকে আদর-অভ্যর্থনা করবার জন্যে তোমাকে বিশেষ যত্ন নিতে হবে না, উনি নিজেই সব নিজের মতো করে নিতে পারবেন।' [আমিও প্রায় একই কথা আবার বললাম।]

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন সুন্দরী। আবার শুরু হলো কথাবার্তা, এলো নানান প্রসঙ্গ।

কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকেই ওঁকে লক্ষ্য করছিলাম বারবার। একটু বেশী মনোযোগ দিয়েই নজর করছিলাম তাঁকে।

বয়স তাঁর তেইশ-চব্বিশ হবে। বলতে বাধা নেই, ওঁর ভিতর আমি দুঃখের লেশমাত্র দেখিনি। বিষাদ প্রতিমা বলে কখনো মনে হয়নি। ওঁর হাতে ছিল সুন্দর কেম্ব্রিকের রুমাল, এবং সে রুমাল চোখের জলে ভিজেছিল বলে তো মনে হয় না।

কাঁদতে কাঁদতে অনেকের চোখ লাল হয়, কিন্তু সে সবও হয়নি। মুখে সব সময়েই ম্লান হাসি লেগে রয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হত ওঁর বোধ হয় মন ভাল নয়, শত হলেও স্বামী মারা গেছে সদ্য সদ্য, টুকরো টুকরো হয়ে গেছে ওঁর স্বপ্নের পৃথিবী, চারদিকে শুধু অন্ধকারের থাবা। কিন্তু না, সে সব জিনিস ওঁর মধ্যে দেখিনি, আর দেখিনি বলে ভালও লাগত। প্রকৃত প্রস্তাবে বিধবা মহিলাটি ছিলেন ঠাণ্ডা প্রকৃতির। ওঁর সব কিছুর মধ্যেই ছিল স্নিগ্ধ রুচির ছাপ। সুচতুর নারীর দৃষ্টি নিয়েই ওঁকে আমি বিচার করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। হাত-পায়ের গড়নটি বেশ সুন্দর-অভিজাত অভিজাত। তাঁর কালো পোষাক আষাকও বেশ স্নিগ্ধ রুচির পরিচায়ক। বিশ্বাস করো, আমি যদি বিধবা হই তাহলে ওঁর পোষাকের প্যাটার্নেই আমি তৈরি করব আমার পরিচ্ছদ। ওই পোষাকে ওঁকে সত্যিই চমৎকার মানিয়েছিল। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললাম, তারপর ওপরে উঠে গেলাম খুড়ীকে দেখতে।



একটা বড়ো আরাম কেদারায় বসে রয়েছেন তিনি, পা রেখেছেন একটা চৌকির ওপর, আর একপাশে একটা কুকুর। আমাদের দেখেই কুকুরটা তার কালো মাথা তুলে বিকট আওয়াজ করল।

বৃদ্ধাদের সম্পর্কে আমার বরাবরই একটা বিশ্রী ধারণা রয়ে গিয়েছে। তাদের দেখলেই আমার কেমন ভয়-ভয় করে, করুণা জাগে। আমার মা গত হয়েছেন অনেক দিন আগেই, তিনি যখন মারা যান তখনও তিনি যুবতীই ছিলেন। তবে যদি তিনি বৃদ্ধ বয়সে মারা যেতেন, যদি দেখতে পেতাম কেমন করে ধীরে ধীরে তাঁর চেহারা বদলে

যাচ্ছে, চামড়া ঝুলে পড়ছে, চুলে পাক ধরছে, চোখের দৃষ্টি কমে আসছে, তাহলে অভ্যস্ত হয়ে যেতাম মানুষের পরিবর্তনে। কিন্তু তা হইনি। আমার চারদিকেই দেখেছি যৌবনের মিছিল, দেখেছি প্রজাপতির মতো ফুরফুরে যুবক-যুবতী। স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধাদের সম্পর্কে আমার কোন সুস্থ ধারণা গড়ে ওঠেনি। অবাক হয়ে তাই দেখলাম ঐ যুবতী মহিলাটি বৃদ্ধার হলদে কোঁচকানো কপালে কি অনায়াসেই না লাল ঠোঁট দিয়ে চুমু খেল। বলাই বাহুল্য, আমার তখন গা ঘিন ঘিন করছিল।

বৃদ্ধাকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে এক সময় তিনিও যথেষ্ট সুন্দরী ছিলেন। হয়তো তিনিও ছিলেন একদিন উড়ন্ত পাখীর মতো মুক্ত ছন্দে উৎফুল্ল উত্তাল, বুকের মধ্যে ছিল রহস্যে মধুর দ্বীপ, হতো হৃদয়ের উজ্জ্বল উৎসব। ডালিমের লাল ঠোঁটে, বক্ষের বিজয়তটে, বসনহীন তনুর উচ্ছ্বাসে কতো লোক হয়তো পেয়ে যেত স্বপ্নময় চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র আকাশ। এখন আর নেই সেই অলস অঙ্গের ভঙ্গি, নেই প্রমদার কামারুণ কটাক্ষ বিলোল, নই সেই মদনবিহ্বল চুম্বন। এখন স্নায়ুতন্ত্রে রোমাণ্টিক সূর্যাস্তের অবিকল দুঃখের গুঞ্জন, লীলায়িত দেহরেখার শতছিন্ন মাধুরী।

তাঁর শিথিল অবয়বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই শোভা পাচ্ছে বিগতদিনের পোষাক। মাথায় তাঁর নক্সাকাটা টুপি। একদিন যে দীর্ঘবাহু ছিল বহু সূর্যোদয়ের সঙ্গী, বহু হৃদয়ের স্বাক্ষর বহন করছে যে বাহু যুগল, তা এখনও মাঝে মাঝে এমব্রয়ডারি করে, তোলে ফুল, কাটে নক্সা। এভাবেই কাটায় তারা অলস সময়, মৃত্যুর জন্যে গোণে দিন। তিনি আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। উষ্ণতায় ভরিয়ে দিলেন মন। চোখের কোল দিয়ে ঝরে পড়ছিল উল্লাসের বৃষ্টি, নম্রতার উজ্জ্বল দ্যুতি। প্রাচীন মহিমায় প্রোজ্জ্বলিত মহিলা কথা বললেন মধুক্ষরা স্বরে।

মন আমার ভরে গেল তাঁর মধুরিমা ব্যবহারে। কি যে অসম্ভব আন্তরিকতা দুলে উঠল তাঁর কণ্ঠে তা আজ বর্ণনা করতে পারব না। চোখের কোণ দিয়ে ধীরে ধীরে জল গড়িয়ে পড়ছে তাঁর গালে। স্মৃতি ঠেলে ঠেলে দিনগুলো তাঁর এগিয়ে আসছে। বুকের ভিতর রিণ রিণ করে কাঁপছে বেদনার সুর। বৃদ্ধাটি আমার ওপর চোখ বোলালেন বারবার। দেখলাম টস টস করে অশ্রু ঝরছে। তিনি বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'কিছু মনে করো না বাছা; তোমাকে দেখে আমার নিজের ছেলের কথা মনে পড়ছে। ঠিক তোমারই মতন ছিল সে দেখতে। কিন্তু আজ আর সে বেঁচে নেই, যুদ্ধে মারা গেছে।'

এ বাড়িতে কয়েকদিন বেশ কাটালাম। আমার প্রতি যত্নের কোন ত্রুটি ছিল না, বরং একটু বেশী আদর আপ্যায়ণই পেয়েছি। চাওয়ার আগেই পেয়ে গিয়েছি কোন কিছু আমার দরকারী জিনিস।

সমস্ত খুঁটিনাটি তোমাকে বলার কোন কারণ নেই। এমন কি, র-এর সঙ্গে আমার যা যা হয়েছিল তাও সব বিস্তারিত বলছি না।

পুরুষ হিসেবে কৌতুককর অথচ নিপুণ ভূমিকা পালন করতে হলে আমাকে যে

আমার বন্ধুর সেই বিধবা বোনের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। সেই মতো করে চললাম আমি। শুরু করলাম ওর পাশে পাশে ঘুরতে, ছায়ার মতো। হাত থেকে দস্তানা পড়ে গেলে আমি তুলে দিই, চেয়ারে হেলান দিয়ে যখন বসে তখন ওর রূপে মুগ্ধ হই। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যখন সে যায় আমি তখন ওকে জড়িয়ে ধরতে চাই, ঘোড়ায় যখন চাপে তখন ওকে সাহায্য করি, যখন হাঁটে তখন পাশাপাশি আমি হাঁটি, যখন উপন্যাস পড়ে আমি তখন ওর কাছাকাছি থাকি। এমন কি একসঙ্গে দুজনে গান গাই। আমার চোখে মুখে সব সময় ঝরে পড়ত ওর প্রতি আমার গভীর প্রেমের সুর। এক কথায় বলা যায়, হয়ে উঠলাম, ওর যোগ্য। বললাম, তোমারি যোগ্য গান বিরচিব বলে, বসেছি বিজন নব নীপবনে; পুষ্পিত তৃণদলে।
সত্যিকারের প্রেমিককদের মতই আমি নিপুণ আচরণ করে চললাম। তাদের কথা বলার ঢঙ, হাঁটাচলার ছন্দ, আচার-আচরণের ভঙ্গিমা ফুটিয়ে তুললাম সাবলীল গতিতে। আর যখন একা থাকতাম তখন মনে মনে হাসি পেত, ভাবতাম মেয়েরা কত ভুল করে। যাই হোক, আমার মধ্যে সিরিয়াসনেসের অভাব ছিল না।
বৃদ্ধা মাকুইস ও আলকিবায়েডস মাঝে মাঝে দুজনকে একসঙ্গে দেখতে পেত। ওরা কি ভাবত বলতে পারব না। আমাদের দেখে আলতোভাবে হাসত, তারপর চলে যেত। মাঝে মাঝে কষ্ট হতো এই ভেবে যে এই আনন্দঘন মুহূর্তগুলো আমি ঠিক মতো উপভোগ করতে পারি না, কেন না আমি যে মেয়ে! আহা, আমি যদি সত্যি সত্যিই পুরুষ হতাম আর পেতাম এমনই এক সুন্দরী বিধবা। আহা! পুরুষ হয়ে যদি এমন করে ভুলিয়ে দিতে পারতাম কোন সদ্য বিধবাকে তার সম্প্রতি লোকান্তরিত স্বামীর স্মৃতি। আশ্চর্য, মানুষ এক তাড়াতাড়ি প্রিয়জনের স্মৃতি ভুলতে পারে! কয়েক দিনের মধ্যেই কোন মহিলা বেমালুম ভুলতে পারে স্বামীর কথা!
এভাবে শুরু করলেও একদিন আমি পিছু হঠে যেতে পারি, নিজেকে সরিয়ে নিতে পারি ভালবাসার খেলা থেকে। কিছুদিন কাটানোর পর একমাস বাদে আবার ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে র-এর কাছ থেকে বিদায় নিতে পারি অনায়াসে। আমার মনে হল আমার বিদায়কালে সুন্দরী নিজেকে সান্ত্বনা দেবে এবং আমাকে পুনরায় দেখতে না পেলে অনায়াসেই ভুলে যাবে আমার স্মৃতি।
কিন্তু মাঝে মাঝে আমারও ভীষণ আবেগ জাগত। বুঝতাম আগুন আর ভালবাসা নিয়ে খেলা করা যায় না।
আমার বোধ জন্মাল, আমাকে দেখবার আগে রসেটি ভালবাসার অ-আ ক খ-ও জানত না। যুবতী রসেটি বিয়ে করেছিল তার চেয়ে বয়সে ঢের বড়ো এক মানুষকে। তার কাছ থেকে সে স্নেহ পেয়েছে, কিন্তু পায়নি ভালবাসার বিচিত্র সাধ। গাঁয়ের মানুষের প্রতি তার কোন দুর্বলতা ছিল না, উপরন্তু তার ব্যবহারে ছিল আশ্চর্য শীতলতা। ভিতরে ভিতরে সে নিজেকে গুটিয়ে রাখত। হাস্য-পরিহাসের অন্তরালে ঢেকে রাখত ভালবাসার জন্য তার সুতীব্র কামনা। বৃদ্ধা টিথোলাস মারা যাওয়ায় বরং সে বেঁচে গেছে। সেই বুড়ো তাকে কোন দিনই খুশী করতে পারেনি, জাগাতে পারেনি

ওর অঙ্গে অঙ্গে কোষে কোষে বিদ্যুতের শিহরণ। এখন বিধবা হয়ে সে তবু নিজেকে ফিরে পেয়েছে, আপন সৌন্দর্যে তবু যশগুণ্ণ হবার সুযোগ এসেছে।
প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম ওর সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতাটুকুই বজায় রাখব। কিন্তু পরে ধরতে পারলাম, শীতল ব্যবহারে ওর হৃদয়ে বরফ গলবে না, ও জ্বলবে না। তাই ভিন্ন পথ ধরলাম, উস্কে দিলাম ওর ভালবাসা। ছড়িয়ে দিলাম প্রেমের সুবাস। সরে গেল দুস্তর ব্যবধান, খসে গেল স্বল্প পরিচয়ের ঘোমটা, ও আমার কাছে এলো, ধরা দিল।
জীবনে একবারই প্রেম করা ছিল রসেটির নিয়তি। সে এটা বুঝতে পেরেছিল, আর পেরেছিল বলেই সেই মতো কাজ করল সে।



গ্রাসিওসা, আমিও প্রেমে বন্দী হলাম! আহ্‌ গ্রাসিওসা, এ বড়ো মাতাল করে। সত্যি এমন মিষ্টি জিনিস আর কিছু নেই। মেয়েদের ভালবাসা পাওয়া যে কি পরম রমণীয় তা যদি তুমি জানতে! রাত ঘুম ভেঙে হঠাৎ উঠে যদি দেখি কেউ আমার শিয়রে বসে রয়েছে, চুলে বিলি কাটছে, আমায় ঘিরে স্বপ্ন দেখছে বা আমায় নিয়ে ভাবছে; তা হলে তা কি পরম রমণীয় নয়? আমার সুখে তার সুখ, আমার দুঃখে ভিজে যায় তার চোখ; কোন কথা বললে তাকে বিশেষভাবে নাড়াচাড়া করা, তার মধ্য থেকে বিশেষ অর্থ খুঁজে বের করা, এবং তা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া—এসব ভাবলেই রোমাঞ্চিত হই। আমি হলাম এক নক্ষত্র, আর সেদিকেই ধাবিতা আমার প্রেমিকা, আমার চোখ যেন আকাশ, মুখ আমার স্বর্গের চেয়েও কাঙ্ক্ষিত সুন্দর; যখন আমি মরব তখন আমার কবরের ওপর কারো নরম চোখের জল ঝরবে ফোঁটা ফোঁটা, ফুলে ফুলে ভরিয়ে দেবে কবর, আমার কোন বিপদের কথা শুনলে সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার খুলে কেউ এগিয়ে যাবে, বুক পেতে নেবে সমস্ত দুর্যোগ। আহ্‌ গ্রাসিওসা, প্রেম এমনই স্বর্গীয়, এমন মাধুর্যমণ্ডিত। এই পৃথিবীতে আর কি চাই বলতো?
এরকম ভাবতে বেশ ভাল লাগে, তাই না? কিন্তু আমার মতো পোড়া কপালও তো আর কারো নেই। আমি তো ভালবাসাই নিতে পারি, কিন্তু দিতে পারি না। কেমন

করে দেবো বলতো? আসলে আমার অবস্থা সেই দীনজনের মতো যারা শুধু ধনীর থেকে গ্রহণই করতে পারে প্রতিদানে দিতে পারে না কিছুই। গ্রাসিওসা, আমার অবস্থাটা যদি তুমি বুঝতে। 'স্যার, স্যার' শুনতে শুনতে আমি নিজের মেয়েলি সত্তাটাকে হারাতে বসেছি। প্রথমেই আমার সঙ্গে পুরুষের মতো ব্যবহার করে, সকলেই ধরে নিয়েছে আমি যথার্থই পুরুষ। ফলে আমিও মাঝে মাঝে ভুলে যাই যে আমি মেয়েই, পুরুষ নই। আমার ছদ্মবেশই হয়ে উঠল আমার পরিচয়, আসল সত্তা কোন্ অতলে তলিয়ে গেল।

অনেক লোকের মধ্যেই আমার চেয়ে মেয়ে-মেয়ে ভাবটাই বেশী। তাদের মধ্যে মেয়েলি স্বভাবের উপস্থিতি আমাকেও লজ্জা দেয়। তবু কি আশ্চর্য, তারা পুরুষ! আমার গলাটাই মেয়েদের মতো, আর উঁচু-নিচু কিছু দেহরেখাই জানান দেয় আমি মেয়ে, নইলে কারো পক্ষেই বোঝা সম্ভব হত না আমি ছেলে না মেয়ে? আমার নিটোল উরুতো ঢাকাই থাকে, নইলে সেটাও ঠিক পুরুষের মত নয়। সে যাই হোক, আমার মনে হয়, শরীর আর আত্মা সব সময় একসূত্রে বাঁধা থাকে না। শরীরটা মেয়ের হলেও মনটা পুরুষের হতে পারে, আবার পুরুষের মতো দেখতে হলেও মনটা তো মেয়েদের মত কোমল হতে পারে। মোদ্দা কথা হল, মনে-দেহে বৈপরীত্য মোটেই অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়। তুমি তো জানই আমার কাছে বহু মেয়েলি আচরণই অসহ্য, ফলে সত্যিই যখন পুরুষের ছদ্মবেশ থেকে আমি আমার আসল রূপে হাজির হবো তখন আমার মতো অসুখী বোধহয় আর কেউ হবে না। গ্রাসিওসা, প্রিয় আমার, তুমি জানো আমি ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসি, অসি চালনাও আমার প্রিয়। ছেলেদের মতো কঠিন ব্যায়াম, গাছে চড়া, দৌড় ঝাঁপ ইত্যাদি করতে আমার ভীষণ ভাল লাগে। উল্টোদিকে, হাঁটু মুড়ে বসা, ফিসফিসিয়ে গল্প করা, সেলাই করা, কাপড়ে নক্সা তোলা, উল বোনা আমার কাছে ভয়ংকর বিতিকিচ্ছিরি বলে মনে হয়। এসব কাজ বড্ড একঘেয়ে, ক্লান্তিকর। আমাকে পাগল করে দেবার পক্ষে এই ধরনের অলস কাজই যথেষ্ট। পৃথিবীতে পোষমানা মেয়ে হয়ে থাকতে আমার ঘেন্না করে, আমি লাথি মেরে ভাঙতে চাই নিয়ম কানুন, হতে চাই দুর্বিনীত, জোর করে ছিনিয়ে নিতে চাই আমার পাওনা। আমার মন্ত্রতো একটাই, তা হল, 'চাই, শুধু আমি চাই।' আমি অ্যাকিলিস হতে চাই। বিশ্বাস করো, মেয়েদের একটা জিনিসই আমার পছন্দমাত্র—সেটি হল তাদের সৌন্দর্য।

রসেটির জন্য আমার করুণা হয়। বেচারা আমাকে মনে-প্রাণেই ভালবাসে। তার সমস্ত সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্য উজাড় করে দিতে চায় আমার কাছে। আমারই পদতলে হয়ে উঠতে চায় সে প্রেমের অঞ্জলি। সে চায়, আমিও তাকে ভালবাসি, আমি তাকে ছিনিয়ে নিই আমার বুকে। বলি তাকে যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম। আমার স্বপ্নে যে রসেটির আলোছায়া, তা যদি বাস্তবে পেতে চাই তাহলে তার রূপ যে কি ভয়ংকর হবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারো। বাস্তব বড় রূঢ়, কর্কশ, বিশ্রী। না, অমন দামী খনি আমি নষ্ট করতে পারব না। অমন সুন্দর রূপ, মুক্তোর মত অমন

পবিত্রতার সর্বনাশ ঘটাবে কল্পনা করলেই শিউরে উঠি। না, না, না, তা হতে পারে না। আমি হারাতে পারবো না সুরভিত বাতাস, অমন মধুর দীর্ঘশ্বাস, আর অমন নিষ্পাপ পেমোরুণ ঠোঁট!

এই ভালবাসাই যুবকদের সুখী করে। এরই জন্যে কত মানুষ অসুখী। কত সুন্দর সুঠাম পুরুষ, কত পয়সাঅলা, সাহসী, বুদ্ধিমান হাঁটু গেড়ে এরই জন্যে প্রার্থনা করে। কত কোমল, প্রেমকাতুর হৃদয় এরই জন্যে নিজেকে সঁপে দেয় বুদ্ধিমান, সাহসী যুবকের বুকে, বাঁচাতে চায় সযত্নলালিত ভালবাসা, জ্বালাতে চায় প্রেমের শিখা।

হায়রে, মানুষের কি কপাল! ভাগ্য তো একবারই মাত্র সুপ্রসন্ন হয়। হায়রে মানুষ!

একটা খেয়ালী মেয়ে পুরুষের রূপ ধরে খুঁজতে চলল তার ভবিষ্যৎ প্রেমিককে। সরাইখানায় সে এমনই একজনের সঙ্গে রাত কাটাল যে তাকে নিয়ে গেল একদিন তার বোনের কাছে। বেড়াল বা পায়রার মতো প্রেমে পড়া ছাড়া তখন আর সেই ছদ্মবেশীর অন্য কোন উপায় রইল না। যদি সত্যি সত্যিই আমি যুবক হতাম তাহলে সেই বোনের ভালবাসা আমাকে আর এক মানুষ করে তুলত। ভাগ্যটা এমনিই। যার জুতো নেই তাকে জুটিয়ে দেয় চটি, যার হাতে নেই দস্তানা তাকে এনে দেয় দস্তানা।

সে চাইত আমি ঘন ঘন তার ঘরে যাই, কিন্তু সেটি সম্ভব হতো না সবসময়। তবু একদিন ওর কাছে গেলাম। বিছানায় রসেটি উঠে বসল, বুঝলাম আমায় দেখে সে খুশী হয়েছে। সেই খুশীর কথা আর চাপা রইল না।

রসেটি এগিয়ে দিল ওর কোমল বাহু, যাতে আমি চুমু খাই। স্বীকার করছি, ওর অমন নরম, সুরভিত বাহুতে আমি অনেকক্ষণ ধরে জোরে চুমু খেলাম। আনন্দে ভরে উঠল আমার মন। জলপাইর মত স্বচ্ছ চোখে রসেটি আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আবেগে থর থর করে সে কাঁপছে, বেশীক্ষণ বসে থাকা ওর পক্ষে সম্ভব হল না। বালিশে মাথাটা হেলিয়ে দেবার আগে সে আবার বাহুদুটো এগিয়ে দিল।

ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টাদুয়েক ওর ঘরে ছিলাম। অনর্গল কথা বলে গিয়েছি। কত কথাই না বললাম! অবশ্য প্রেমের ব্যাপারে রসেটিকে বেশ সতর্ক মনে হল। মাঝে মাঝে তার চোখে মুখে ফুটে উঠত প্রেমের দ্যুতি। কিন্তু তা ঢেকে রাখার জন্য কত আপ্রাণ চেষ্টাই না সে করত। মুখের উপর বিষাদের মেঘ ছড়িয়ে সে তার ভালবাসাকে গোপন রাখত, মিষ্টি ব্যবহারের আড়ালে লুকিয়ে রাখত প্রেমের আরতি।

আমার সঙ্গে ওর ব্যবহারে এক ধরনের মায়াবী বাতাবরণ তৈরী হচ্ছিল। ভিতরে ভিতরে তার মধ্যে ডানা মেলছিল হয়তো ভালবাসার বীজ, হচ্ছিল স্পন্দিত, তবু সে সযত্নে সব আড়াল করে রাখছিল। আমার চোখে অবশ্য সেই সুর, ছন্দ, ধরা পড়ছিল অনায়াসেই। অবশ্য, ওর প্রতি আমার মনে তেমন কোন দুর্বলতা তখনো দেখা দেয়নি।

এ-এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, রসৌট অস্বস্তিতে ভুগছে, কিছুতেই সে আর সহজ হতে পারছে না। আমি আমার স্বভাবমত ওর প্রশংসাই করে যেতে থাকলাম, এক হিসেবে তাকে স্তাবকতা বলতে পারো। আমি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলাম ওর ভিতরে আস্থা। সেও যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। আমার মধ্যে সে লক্ষ্য করেছিল দুটি বিপ্রতীপ জিনিস—সে দেখেছিল আমার কথাবার্তার মধ্যে যতখানি উত্তাপ ছড়ানো, ঠিক ততটুকু শীতলতা আমার ব্যবহারে, কার্যকলাপে।

গ্রাসিওসা, আমার প্রিয়তম শোভন হৃদয়, তুমি খুব ভালকরেই জানো আমার বন্ধুত্বের মর্মমূলে কত গভীরভাবেই না থেকে যায় সুতীব্র প্যাশন। এও তুমি ভাল করে জানো আমার সবকিছুই বিচিত্র, এমন কি আমার ঈর্ষাও। রসৌটির সঙ্গে আমার যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তার কিছুটা মিল পাওয়া যাবে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কে। না, ভুল বললাম। কেননা রসৌটি প্রথম থেকেই প্রতারিত। সে যে আমাকে বাইরের রূপে দেখেছে সে যে আসল-আমি নই, তা রসৌটি জানে না। সেটি জানো শুধু তুমিই।

কোন পুরুষকে আজ অব্দি আমি ভালবাসিনি। তাই আমার ভালবাসা ঝরে পড়েছে মেয়েদের মধ্যে, যুবতীদের মাঝখানে। সব লোককেই আমি দুটি ভাগে চিনতে শিখেছি। বরং বলা যায় আমার চোখে মানুষের দুটো শ্রেণী। একদল, যাদের ভালবাসি, আর একদল, যাদের আমি ঘৃণা করি। অন্যদের কোন অস্তিত্বই আমার কাছে নেই। তখনই তো আমি ঘোড়ায় চড়তে চাই যখন দেখি রাস্তাটা চড়াই উৎরাই। সমতল রাস্তার প্রতি বরাবরই বিতৃষ্ণা।

তুমিতো জানোই আমি একটু অমিতব্যয়ী। মাঝে মাঝে আমার ভিতরেও আবেগ উথলে ওঠে, অনেক সময়েই ভুলে যাই যে আসলে আমি মেয়ে। রসৌটির সঙ্গে যখন হাঁটতে থাকি, তখন অনেক সময়েই ওর কোমরটাকে ডান হাতে বন্দী করে নিই, কখনো আবার হাতে হাত রেখে চলে আমার হাঁটা। ও যখন চেয়ারে বসে সামনের দিকে ঝুঁকে একমনে কিছু সেলাই করে চলে তখন হয়তো ওর পিছনে আমি দাঁড়াই, ওর সুন্দর ঘাড়ে হাত বোলাতে থাকি, যেন বেড়ালের তুলতুলে শরীরে হাত বোলাচ্ছি, ওর চুলে বিলি কাটি। জানো ওর চুল আমায় পাগল করে দেয়, আহা কি লোভনীয় কেশরাজি!

আমার এরকম ব্যবহারকে সে-ও ঠিক সাধারণ বন্ধুত্বের নিদর্শন বলে মেনে নিতে পারেনি। বন্ধুত্ব বলতে সকলেই যা বোঝে এ ঠিক তা নয়। সে আমার মধ্যে অন্য কিছুর ছবি দেখল, আমাকে নিয়ে তারও ভাবনার জগতে তোলপাড় শুরু হল। যে আমি কখনো প্রেমে পড়িনি, যে যৌবন কোনদিন প্রেমের সাধ পায়নি, সেই আমি, আমার যৌবন এখন নতুন অভিজ্ঞতার শরিক। সে হয়ে উঠছে আমার অন্ধকারের হৃদয় হতে উৎসারিত আলো।

সে আমায় অনেক সুযোগ দিয়েছে। অন্ধকারের ভিতরেও আমরা মুখোমুখি বসেছি, কত স্বপ্নের জাল বুনেছি। বনের ভিতর দিয়ে, নীল আকাশের নীচে গল্প করতে করতে, কবিতা আওড়াতে আওড়াতে কোন গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে আমরা দুজনে

এক-সঙ্গে হেঁটেছি কতদিন।

একদিন আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলেছি পার্কের নির্জন দিকে। সেখানে লোকজনের আনাগোনা বিশেষ নেই। সারি সারি গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে বহু হৃদয়ের রক্তিম পুষ্পাঞ্জলির স্মৃতি বহন করে। এই নির্জন প্রান্তে একটা ঝর্ণা। চঞ্চলা কিশোরীর মতো, কিশোরীর হৃদয়ের মতো সুন্দরী ঝর্ণার সুর আমাকে ক্ষণিকের জন্যে বিস্ময়াবিষ্ট করল। ইচ্ছে হল আঁজলা ভরে জল খাই। এগিয়ে গেলাম আমি, তেষ্টাও পাচ্ছিল, হাতের কোষে নিয়ে জল পান করলাম। আমায় এভাবে জল খেতে দেখে রসোটিও বলল যে তার তেষ্টা পেয়েছে। সে এগিয়ে গেল, আমি ওর হাত ধরলাম। বললাম, 'আমিই তো এনে দিতে পারি।' সে রাজি হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। দুই হাতের কোষায় জল এনে ওর মুখের সামনে ধরলাম, মনে মনে ইচ্ছে জাগছিল, ও আমার হাতে একটু চুমো খাক। নিঃশেষে সে জল পান করল। না, আমায় সে প্রতারিত করেনি।

যতটা ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব ততটা ঘনিষ্ঠ হয়েই আবার আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। কথা বলতে বলতেই আমরা চললাম সামনের দিকে। মাঝে মাঝে ও এমনভাবে আমার মুখের কাছে মুখ নিয়ে আসত যে আমি ওর শ্বাসপ্রশ্বাস পর্যন্ত টের পেতাম। কখনো অবার আমার বাহুতে ও দুষ্টুমি করে মুখটা ঘষে দিত। ওর অমন টুকটুকে মুখ আমায় মাতাল করত। কিন্তু, পোড়া কপাল আমার, আমিতো ছেলে নই, আমিও যে মেয়ে।

শেষ পর্যন্ত এসে পেঁছিলাম ছোট্ট কুটিরে। দরজাটা ভেজান ছিল। সজোরে লাথি কষাতেই হাঁ হয়ে গেল কপাট। ভিতরে ঢুকলাম আমরা। না, যা ভেবেছিলাম তা নয়। কুটিরের ভিতরটা বেশ ছিমছাম। চারিদিকেই রুচির স্নিগ্ধতা। অনেকগুলো ছবিও টাঙানো রয়েছে। ওভিদের মেটামরফোসিসের দৃশ্যাবলী ঝলমল করছে। দেখতে পেলাম সব প্রেমের চিত্র। রূপকথার প্রণয় কাহিনী চোখের সামনে জবলজবল করছে। আসবাবগুলোও বেশ মনোরম। রুপোর মধ্যে হালকা নীলের ছোঁয়া লেগেছে কোনটার কারুকার্যে, কোনটা বা সোনালী রঙ। চেয়ারগুলোয় বিলাসিতার আমেজ। আর্শিতেও নানান লতাপাতা আর বিন্দু গোলাপের গান। ঘরখানা দেখলেও মনে হবে কার বাসর সাজানো। ঘরের ভিতর একটি মার্বেল ঘড়ি। সময় থমকে রয়েছে সেখানে।

রসোটির দিকে চোখ ফেরালাম। ওর চোখে মুখে কিসের রঙ্‌ লেগেছে। আমিও খুশী হলাম। বললাম তাকে যে এমন সাদাসিধে ঘরের মধ্যে এমন সুন্দর রুচির তারিফ না করে পারছি না। ঘরখানা আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে ওরই জন্যে। কেননা ওর সাজপোষাকে ছিল না ঐশ্বর্যের ছটা, ছিল হৃদয়ে ভালবাসা। আগেই বলেছি ও স্কার্ট পরে এসেছিল। তাতে ছিল এমব্রয়ডারির কাজ। ভারি চমৎকার লাগছিল ওকে। আমার কি মনে হয় জানো সোনার বাক্সে বাদাম রাখার চেয়ে ঢের সুন্দর বাদামের খোলে হীরে রাখা।

রসেটিও আমার কথায় সায় দিল। শুধু সায় দিল বললে ভুল হবে, সে তা প্রমাণও করল। ও তার স্কার্টের নীচের দিকটা একটু তুলে ধরল। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, অধিকতর সুন্দর এমব্রয়ডারি করা আণ্ডার স্কার্ট। আহ্, কি যে সুন্দর ফুল আর পাতার নক্সা সেখানে! বিশেষ করে তার লোভনীয়, মাখনের মত উরুতে তা যেন আরো, আরো সুন্দর হয়ে ঝলমল করছে। এ দেখলেই বোঝা যায়, ওর উপরের আবৃত অঙ্গে অঙ্গে কোন দেবতার লীলা। আমি! হ্যাঁ, মেয়ে হয়েও বলছি, ও আমার ভিতর ঈর্ষা জাগাল। আমি মুগ্ধ।

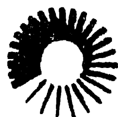
বললাম, 'দ্যাখো এমন সুন্দর অথচ ছোট্ট পা আর কখনো আমি দেখিনি। সত্যি, আমি দেখিনি। ভাবতেও পারি না, কোন মেয়ের এমন সুন্দর গঠন হতে পারে! আহা, চোখে না দেখলে এ বিশ্বাস করা বড়ো কঠিন। এ যেন স্বপ্নের পদযুগল, মায়াবী ঊরু।'

সে বললে 'হয়তো ঠিক।'

তারপর সে দেয়ালের দিকে সরে গেল। ফ্লাস্ক থেকে লিকার বের করল, দুটো প্লেটে কিছু বিস্কুট আর মিষ্টি নিয়ে একটা টেবিলে রাখল। আমরা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম পাশাপাশি। আমি এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওর কোমর। বেশ শক্ত করেই ওকে পেঁচিয়ে ধরলাম। অন্য হাতটা আমার কাঁধের থেকে ঝুলে রইল অসহায়-ভাবে। ওর দুটো হাতই ফাঁকা। ও তাকাল আমার দিকে।

বলল, 'কিছু মনে করো না। আমিই খাইয়ে দিচ্ছি।' বলেই সে নিজেও খেতে শুরু করল আর আমার মুখেও পুরে দিতে লাগল খাবার। আমি গিলে চললাম তা। মাঝে মাঝে ওর লম্বাটে সুন্দর সুন্দর আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ আগেই সে আমার হাতের তালুতে একটা চুমো খেয়েছিল, আমি তা ফিরিয়ে দিলাম ওর আঙুলে আলতো করে কামড় দিয়ে। ও হাসল। ভোরবেলার নরম রোদের মত একরাশ হাসি ছড়িয়ে মুখে। খাওয়ানোর ফাঁকে ফাঁকে ও আমার গাল টিপে দিল দু'তিন তিন বার। আমরা দু'গ্লাস ক্যানারি ওয়াইন গিলেছিলাম, আর এই দু'গ্লাসই দু'জন মহিলাকে উত্তেজিত করার পক্ষে যথেষ্ট। রসেটি আমার বাহুর উপর ঝুঁকে পড়ল। ও তার বাইরের পোষাকটা খুলে ফেলল, আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল ওর শরীরের প্রতিটি ভাঁজ, প্রতিটি রেখা। যতই দেখছি ওকে, ততই অবাক হচ্ছি, ততই ঈর্ষা জাগছে ওর লোভনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কল্পনা করে। মনে মনে ভাবলাম, আমরা মিছামিছি পুরুষকে বেশী সম্মান দিই। অথচ তাদের কি আছে? মাখনের মত এমন মোলা-য়েম চামড়া, রেশমের মত এমন কোমল চুল, প্রজাপতির ডানার মতো এমন সুন্দর ঠোঁট, অঙ্গে অঙ্গে কবিতার এমন ছন্দ, চোখে চোখে সুরমূর্ছনা—এসব কিছুই নেই পুরুষের। নাহ্, ওদের কিছুই নেই, অথচ ওদের কাছেই কিনা আমরা নিজেদের সমর্পণ করি! ওদের আমরা যত আনন্দ দিতে পারি, ওরা তো মেয়েদের তা দিতে পারে না।

না, এক বছর আগেও এধরনের কথা আমি বলতে পারতাম না। বিচার করতে পারতাম না কোন কাঁধ সুন্দর, কোন্‌ কণ্ঠ লোভনীয়, কোন ঠোঁট মাদকতায় ভরা। কিন্তু যেদিন থেকে আমি নিজেকে পুরুষের বেশে সাজিয়ে ফেললাম, ওদের সঙ্গে ওদেরই মত মিশতে লাগলাম, সেদিন থেকে আমার মধ্যে অন্য সেণ্টিমেণ্ট কাজ করতে লাগল। বুঝলাম সুন্দর জিনিসটি কাকে বলে। আমার কাছে স্বচ্ছ হয়ে উঠল সৌন্দর্যের ধারণা। মেয়েরা সাধারণত এ ধারণা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু জানিনা, কেন। অথচ সুন্দরের ধারণা এদেরই মধ্যে বেশী। সাধারণত কোন মেয়ে যখন তারচেয়েও সুন্দরী কোন মেয়েকে দেখে, তখন একজন ভাবে সে কুৎসিত, সে কোন পুরুষের চোখে ধরবে না। অন্যদিকে, পুরুষেরা যদি কোন মেয়েকে খুব সুন্দর দেখে তাহলে তারা তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে শুরু করে। সেখানে তাদের মধ্যে কোন দ্বিমত দেখা যায় না, সবাই বলে, বাঃ কি সুন্দর, কি আনন্দ !



এখন আমি বুঝতে পারি ভালবাসা কি, বুঝতে পারি সুন্দর কাকে বলে। আমার মেয়ে সত্তাটিকে যে পোষাকে ঢেকে রেখেছি, যে অন্য আদলে সবার সামনে হাজির করাচ্ছি, তাতে আমি মর্মে মর্মে বুঝলাম, অন্য অনেকের চেয়েই আমি সৌন্দর্যের ভাল বিচারক। অনেকদিন থেকেই আমি মেয়ে নই, কিন্তু আমি সত্যিকারের পুরুষও তো নই। আমার ইচ্ছা আমায় অন্ধ করেনি, আমার বিচারশক্তিকে শেষ করেনি, ফলে আমিই খাঁটি বিচারক। যাকে আমি বলব, 'মন্দ নয়,' সকলেই আমার সঙ্গে একমত হবে। যাকে বলব সুন্দর, সকলেই তাকে বলবে 'সুন্দর'।

এখন আমি শুধু মানুষের সৌন্দর্যেরই খাঁটি বিচারক নই, এখন আমি শিল্পেরও যথার্থ সমঝদার। আমি নির্ভুলভাবে বুঝতে পারি কোনটা ভাল কোনটা খারাপ; কোনটা সাদা আর কোনটা কাল।

আবার রসেটির কথায় ফিরে আসি। তোমাকে আগেই বলেছি সে আমার বাহুর ওপর ঝুঁকে পড়েছে। আমার কাঁধের ওপর রেখেছে তার মাথা। হালকা হাওয়ায় মাঝে মাঝে তার চুল উড়ছে। মাঝে মাঝে আমার নাক-চোখে-মুখে লাগছে সেই মায়াবী কেশের ঝাপটা। আমি কিসের গন্ধ পেলাম। ওর গোলাপী মুখে বিউটি স্পটটা আরো

সুন্দর লাগছে। যখন হাসে, ওর দাঁতগুলো আরো ঝকমক করে ওঠে, মনে হয় বৃষ্টির ফোঁটা ঝরছে।
আমরা দুজনেই চুপচাপ। এত কাছে ও আমার তবু মনে হয় কত দুস্তর ব্যবধান। অথচ বলতে ইচ্ছে করে—

একদিন তোমার চোখে তাকিয়েছিলুম, তোমার চোখ
ফসলশূন্য মাঠের বিস্তৃতি, নিশিন্দা পাতার
বিষাদ তীব্রতর, বাহু
সমুদ্রের অস্থিরতা, বুক
পাহাড়তলীর নির্জন।
ভোর রাতের শুকতারায় তোমার উজ্জ্বলতা।

ওর শরীর থেকে গলে পড়ছে যেন মোম। ওকে মনে হল কোন শিল্পীর স্কেচ। পোষাকের ভিতর থেকে স্পষ্ট উঠে আসা ওর শরীরের উষ্ণতা, আমায় পাগল করে দিচ্ছে। মনে হল ওর বিগত দিনগুলোয় কথা কয়ে উঠছে আমারই জীবন। ধীরে ধীরে ও আরো, আরো আমার সঙ্গে নিবিড়তর হল। ঝুঁকে পড়ল। দেখতে দেখতে সহসা দেখলাম ওর চোখ থেকে টস টস করে জল ঝরছে। ও কাঁদছে।
আমার অবস্থা তখন বেসামাল। এক ধরনের অস্বস্তি আমায় কুরে কুরে খেতে লাগল। এমন কি নিজেকে ভীষণ বোকা ঠাউরালাম। কি করব ভেবে পাচ্ছি না। অথচ বুঝলাম ওর চোখে-মুখে এখন ভালবাসার রঙ। সেই রঙে ও আমাকেও রাঙিয়ে নিচ্ছে, দুহাতে ছড়িয়ে দিচ্ছে আবেগের আবীর। কি করব ঠিক করতে পারছি না। হায়, আমার অদৃষ্ট! যদি সত্যি সত্যিই পুরুষ হতাম, তাহলে নিজের ভাগ্যে নিজে গর্বিত হতাম। কিন্তু সে কপাল আমার নয়! একবার মনে হল, আমি পুরুষ। মনে হল ও ভুল করেনি। পরেই আমি চমকে উঠলাম, আঁতকে উঠলাম। নিজেকে ধিক্কার দিলাম, কেন এভাবে প্রতারণা করছি? আমার ভিতরটা বেশ তোলপাড় হচ্ছে। ঘন ঘন শ্বাস ঝরছে। না, আমি যে মেয়ে সেকথা প্রাণপণে ভুলতে চাইলাম। ওর কাছে আমি পুরুষ, হ্যাঁ, পুরুষ হয়েই থাকি। আহা, আমি যদি সত্যিই পুরুষ হতাম, তাহলে কত ভাল লাগত!
এভাবেই সময় যখন কাটছিল, তখন হঠাৎ ও উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। ঝড়ের মত গেল দেয়ালের দিকে। খানিক বাদেই আবার ফিরে এলো কাছে। মুখোমুখি দাঁড়াল। তাকাল আমার মুখের দিকে। ভাবলাম, ও কি আমায় করুণা করছে? ও কি আমাকে স্কুলবয় বলে মনে করছে?
হঠাৎ ও বদলে গেল। আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েই দু'বাহু দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল আমায়। জোরে আরো জোরে ও আমায় পিষতে লাগল। ময়দা মাখার মত আমার শরীরটার ওপর ও হামলে পড়ল, মনে হল আমি যেন ফুলের শরীর। যতই বলি ছাড় ছেড়ে দাও, ও ততই আমায় জড়িয়ে ধরে নিবিড়ভাবে। বুঝতে পারছি ওর ভিতর আগুনের শিখা লক লক করে ওকেই পুড়িয়ে মারছে। ও আমার পিঠের

ওপর মুখ ঘষতে লাগল, গালে কামড় বসিয়ে দিল, নাকের ওপর নাক দিয়ে বারবার ঘষতে লাগল ওর নাক। কখনো চোখের ওপর চুমু খাচ্ছে, কখনো আবার কপালে, গালে, ঠোঁটে, ঘাড়ে। ও ঠিক বুঝতে পারছে না আমায় নিয়ে কি করবে, কি করলে ওর ঝড় শান্ত হবে আমিও তা বুঝতে পারছি না।

কিন্তু হঠাৎই সে ঝড় থামল। বাইরে থেকে ভেসে এল কুকুরের চীৎকার। সে আওয়াজ আসতেই ও সম্বিত ফিরে পেল। ঝড় থামল। ওর চোখে মুখে ফুটে উঠল এখন অসম্ভব ব্যর্থতার গ্লানি। বড় করুণ মনে হলো এ সময়। বলল, 'মনটা বড় কাতর।' আমি তাকালাম ওর চোখের দিকে। সে চোখে দেখলাম আপসোসের রঙ।

দরজা ঠেলে একটা সুন্দর সাদা গ্রে হাউন্ড ঘরে ঢুকেই লাফালাফি শুরু করে দিল।

রসেটি দ্রুত উঠে পড়ল। সরে গেল ঘরের একটা কোণে। কুকুরটাও ছুটে গেল ওর দিকে। ওর গা বেয়ে উঠতে চাইছে কুকুরটা। সামলাতে পারছে না তাকে।

এই গ্রে হাউন্ডটা রসেটির ভাইয়েরই প্রিয় কুকুর। রসেটি বুঝতে পারল ভাইও তার কাছাকাছি এসে গেছে। রসেটি বেশ ভয় পেয়ে গেল।

কয়েক সেকেন্ড বাদেই সে ঢুকল। হাতে হিলহিলিয়ে উঠছে একটা চাবুক। ঘরে ঢুকেই সে বলল, 'ও: তুমি এখানে! একঘণ্টা ধরে তোমায় হন্যে হয়ে খুঁজছি, কোথাও তোমার টিকিটি পর্যন্ত নেই। কুকুরটা গন্ধ শুঁকে শুঁকে শেষ পর্যন্ত এ গোপন জায়গাটা খুঁজে বের করেছে। তোমরা কি এখনও থিয়োলোজি নিয়ে কথা বলছিলে?'

রসেটি উত্তর দিল, 'না, না। আমরা এখানে হ্যালক্যাসান নিয়ে সব এলোমেলো আলোচনা করছিলাম, আর একটু চা-মিষ্টি খেয়েছি।'

'মিথ্যে কথা বলছ বলে মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই এমন কিছু আলোচনা করছিলে যা খুব সেন্টিমেন্টাল। তোমার চোখে মুখে আমি সেন্টিমেন্টের রঙ দেখতে পাচ্ছি যে! যাক তুমি আমার সঙ্গেই ফিরে চল। একটা নতুন মাদী-ঘোড়া এনেছি, ওটাকে একটু ট্রায়াল দিতে হবে। হ্যাঁ, তেওদোর, তুমিও ওর সঙ্গে ঘোড়ার পিছে চাপবে। তারপর দেখব ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়।'

আমরা তিনজনেই পাশাপাশি চললাম। অ্যালসিবায়েডস ওর হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে, আমিও আমার একটা হাত বাড়িয়ে দিলাম রসেটির প্রতি। আমাদের তিনজনের দৃষ্টিতে তখন তিন রকমের রঙের আলপনা। অ্যালসিবায়েডস-এর ভিতর একধরনের চিন্তা ও বিষণ্ণতার ছাপ, আমি বেশ সহজ ও স্বচ্ছন্দ, আর রসেটির মধ্যে বিরক্তির ছোপ।

আমার দিক দিয়ে অ্যালসিবায়েডস-এর আগমন দারুণ স্বস্তির, অন্যদিকে রসেটির বেলায় তা ভয়ংকর অস্বস্তিকর। আর যদি মিনিট পনেরো বাদেও তার আগমন ঘটত, তাহলে এ সময়টা আমি কেমন করে সামাল দিতাম ভাবতেও পারি না, এখন। সত্যি কথা বলতে কি অ্যালসিবায়েডস আমায় গভীর সংকটের হাত থেকে নিদারুণভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছে। তখন বারবার আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দিচ্ছিল, আমি আসলে কে? আমি কি? প্রচণ্ড ভয়ে ভয়ে আমি সময় কাটাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম,

শেষমেষ ধরা পড়ে যাবো না তো? যাক, সে ভয় থেকে শেষ পর্যন্ত রেহাই পেয়ে গেছি।

আমি বুঝতে পারছি এই লুকোচুরির বেশী দিন চলবে না। একবার ধরা পড়ে গেলে নাকালের একশেষ। ফলে মনে মনে ঠিক করে ফেললাম তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়তে হবে। এ সিদ্ধান্তের কথা আমি ওদের জানিয়েও দিলাম একসময়। ডিনারে বসে আমি বললাম, কালকেই আমাকে চলে যেতে হবে। আমার ঘোষণা শুনেই রসেটি ক্ষণিকের জন্য জ্ঞান হারাল। ওর হাত থেকে গেলাসটা মেঝেতে ঝনাৎ করে পড়ে গেল। ওর গোলাপী মুখখানা মুহূর্তের মধ্যে বিষণ্ণ হয়ে গেল। আমার দিকে কি এক আশঙ্কায় চেয়ে রইল। তার সেই সকরুণ চাহনির নীরব মিনতি আর কারো চোখে পড়ল না, কিন্তু আমি হঠাৎ অনুভব করে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল ওর বুকের গভীরতর সুর, রঙ, ছন্দ।

এমন সময় আণ্টি কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে শুরু করলেন, 'তেওদোর, তোমার কথা শুনলাম। কিন্তু ব্যাপারটা ভাল হল না। অন্তত তোমার এতখানি নিষ্ঠুর হওয়া কি ঠিক। এই কালকেই তুমি বললে আরো দিন পনেরো তুমি এখানে থাকবে। অথচ আজকেই বলছ তুমি সামনের কালই চলে যাবে। কিন্তু তেওদোর, এর মধ্যে তো কোন চিঠি আসেনি, ফলে কোন ওজরও তো তুমি দিতে পারবে না। তাছাড়া তাকাও দেখি মেয়েটার মুখের দিকে। তোমার ওকথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাছার মুখখানা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে দেখেছ? আমার আবেদন তোমার কাছে, আরো কিছুদিন তুমি থাকো, কথার খেলাপ করো না। আমি এই আটষট্টি বছরের বুড়ী তেইশ বছরের মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তোমার কাছে আবেদন করছি, তুমি কালকে চলে যেয়ো না। তোমার কাছে আমার একটাই মিনতি মেয়েটা যতদিন চায়, ততদিন তুমি এখানে থাকো। প্লিজ, তেওদোর, আমার কথা রাখ।'

অ্যালসিবায়েডসও টেবিলে একটা জোর ঘুঁষি মেরে বলল, আমিও তোমার হঠাৎ চলে যাবার সব দরজা বন্ধ করে দেবো দোস্ত।

রসেটিও আমার দিকে তাকাল একবার। ওর দৃষ্টি এত বিষণ্ণ যে আমি ভাল করে ওর দিকে তাকাতেও পারলাম না। ওর দৃষ্টিতে আমি দেখলাম উপোষী বাঘিনীর ভয়ংকর ছবি, দেখলাম সেই বাঘিনী প্রায় এক হপ্তা কোন খাবার পায়নি, এমনকি তা ছুঁতেও পারেনি। নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। বাধ্য হয়েই কথা দিয়ে ফেললাম, থাকব। রসেটি খুশী হল। উচ্ছল হয়ে উঠল। ওর বিবর্ণ মুখ আবার গোলাপী হল। সে এত খুশী হল যে ঘাড় ফিরিয়ে সজোরে আমায় চুমু খেল। কৃতজ্ঞতা জানাল আমার মহানুভবতায়। অ্যালসিবায়েডসও আমার হাত টেনে নিয়ে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে করমর্দন করল।

রসেটি খুশী হল ঠিকই, কিন্তু আগেকার সতেজভাব আর পুরোপুরি ফিরে আসেনি। আমার ব্যবহারে সে অবাক। সে আমার মধ্যে দেখতে পেল ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলের ছায়া। ও আর আমার উপর পুরোপুরি ভরসা করতে পারছে না।

আমি যদি মেয়ে না হতাম তাহলে বলতাম রসেটির ধারণাই সঠিক। তার ইচ্ছে ছিল আমার চলে আসার আগেই একটা বোঝাপড়া সেরে নিতে! কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর তাগিদ ওকে তাড়িয়ে বেড়াত। সম্পর্ক ভাঙনের মুখে সম্পর্ক আবার আগের মতই জোড়া লাগানো যে কি ভয়ংকর তা অনেকেই কল্পনা করতে পারে না। তবে সে সহজ হতে চাইল, চাইল সম্পর্ক আরো গভীর করে নিতে। অথচ আমার দিক থেকে তাতে পুরোপুরি সাড়া দেওয়া যে কি মারাত্মক ব্যাপার তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারো। একটা কথা বলব, আমিও চেষ্টা করলাম তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হতে। এবং ওর আর আমার মাঝখানে অন্য কারো উপস্থিতিই আমার কাছে অসহ্য লাগল।

আমরা দুজনেই আবার একসঙ্গে বেরুতে শুরু করলাম। নানান বিষয়েই আমরা আলোচনা করতাম, হৃদয়ের দেয়া-নেয়া পালা চলল পুরোদমে। রসেটি আরো সুন্দর হল। এখন থেকে সে দিনে অন্তত তিন চার বার পোষাক বদলায়। সব সময়ই ম্যাচ করে তার সাজের বাহারে আমার চোখ ঝলসায়। একটা সময়েও ওকে আর পুরনো বলে মনে হয় না। রসেটি, সুন্দরী রসেটি, সব সময়েই নিত্য নতুন। অঙ্গে অঙ্গে তার ঝর্ণার সুর, পায়ে পায়ে তার নাচের ছন্দ। রসেটি হয়ে উঠল মায়াবিনী, রসেটি হয়ে উঠল কৌতুকময়ী। কখনো মনে হবে তাকে উচ্ছল, আবার কখনো মনে হবে বিষাদ আতুর। কখনো মনে হবে আবেগমদির, আর কখনো মনে হবে বড়ো শীতল। কখনো তার মধ্যে নিবেদিত প্রাণের শুদ্ধশীলতা রূপ; কখনো বা ছিনালিপনার হেঁয়ালি। সত্যিই রসেটি হয়ে উঠল ছলনাময়ী, বিচিত্র ছলনা জালে সে বিচিত্রময়ী। ক্ষণে ক্ষণে তার পোষাক বদলানো আমাকে বেশ মুগ্ধ করল।

মাঝে মাঝে খুব ভোরে দেখি ওকে বাগানে হাঁটতে। আমার ঘরের জানালা দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। তাকিয়ে দেখতে দেখতে আমার চোখে ভাসে কখনো ভেনাসের ছবি, কখনো বা সাইকি—কিউপিড। ওদের মনে হয় পরম পবিত্র, মনে হয় ভোরের শুকতারা, কবিতার নিগূঢ় ছন্দ। রসেটিই আমার কাছে জীবন্ত কবিতা বলে ভুল হয়।

রসেটির মনটাও খুব উদার। ওর ভিতরে কোন নীচতা, দীনতা, হীনতা নেই। নেই কোন বিশ্রীতা, তুচ্ছতা, বীভৎসতা। সে আত্মমর্যাদায় সচেতন, কিন্তু কখনোই বিদ্রোহিনী নয়। ভিতরে ভিতরে সে হয়তো দুঃখ পায়, যন্ত্রণা ভোগ করে, কিন্তু কারো বিরুদ্ধে কখনো অভিযোগ করে না, কারো বিরুদ্ধে ঝরে পড়ে না সামান্যতম অনুযোগও। অথচ ওকে দেখছি ইদানিং মাঝে মাঝে কাঁদতে। কিইবা করতে পারি আমি? আগের চেয়েও অনেক বেশী মিষ্টি করে কথা বলি, আরো নিবিড় হয়ে চলাফেরা করি, কিন্তু ওর ভিতরে সব সময়ই একটা সন্দেহ, সব সময়েই প্রিয় জিনিসটি হারিয়ে ফেলার ভয়।

মাঝে মাঝে অবশ্য দুচারটে রূঢ় কথা ওকে শোনাই। ও কাঁদে। এটাই ওর এক অস্ত্র। ওর হাসিকে ভয় পাই না, কিন্তু ভয় পাই ওর কান্না। তবে সে কান্নাও এক সময় শুকিয়ে যায়। আমার মনে হয়, রুমাল দিয়ে চোখের জল মোছানোর চেয়ে পরম রমণীয় হল

চুমো দিয়ে সেই অশ্রু মুছিয়ে দেওয়া।

রসেটি কিন্তু উল্টো ভাবতে শুরু করে। সে ভাবে আমি ওকে এড়িয়ে চলি, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। ফলে আমার অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে উঠল। যতই ওকে কাছে ডাকি, কথা কই, ভালবাসি, ওর সন্দেহ তাতেই বাড়তে থাকে, ভাবতে থাকে আমি বোধহয় পালিয়ে যাব, হারিয়ে যাব। ওর সঙ্গেই যখন কথা বলি, ওর কোকিল-কণ্ঠস্বর শুনি, তখন নিজেকে পুরুষ বলেই মনে হয়। রসেটিও জানে আমি পুরুষ, আর পুরুষ হয়ে যদি ওর প্রেমে সাড়া না দিই তাহলে সেটা ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা। মেয়েরা যাকে ভালবাসে, তার কাছ থেকে ভালবাসাই তারা চায়, নির্লিপ্ততা নয়।

কোন এক বিকেলের কথা। আমি সেই আণ্টিকে নিয়ে বাড়ি রয়েছি। তিনি আরাম কেদারায় বসে কাজ করে চলেছেন। আমি সামনে বসে রয়েছি। এক সময় কাজ করা বন্ধ রেখে তিনি আমার দিকে তাকালেন। একবার নয়, বারবারই আমার মুখের ওপর চোখ বোলালেন। আর দেখলাম তিনি যেন কি ভাবছেন। এক সময় একটা দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়ল। তাকালাম ওঁর মুখের দিকে। দেখলাম ওঁর চোখ ছলছল করছে।

উনি বললেন, 'ঠিক হেনরীর চোখ, অবিকল সেরকম চাউনি। তেওদোর, তুমি ভাবতেও পারবে না, তোমার দিকে তাকালেই আমার হেনরীর কথা মনে পড়ে, কিছুতেই বিশ্বাস হয় না সে মারা গেছে। একদম তোমার মতই দেখতে ছিল ওকে। মাঝে মাঝে মনে হয় ও কোথাও বেড়াতে গেছে। অনেক দিন বাইরে থেকে সে আবার ফিরে এসেছে। তেওদোর, তোমায় দেখলেই আনন্দ উথলে ওঠে, আবার দুঃখও হয়। কান্না পায়। বারবার শুধু ভাবি, উফ্! কী কষ্টেই না আমাকে সে একা রেখে চলে গেল। আর তোমার মধ্যে আমি খুঁজে পাই আমার হেনরীকে, হেনরী যেন তোমার মধ্যেই সব সময়ে ঘোরাফেরা করছে। আমি তাই ভাবতেও পারি না, তুমি চলে যাবে। তোমার চলে যাবার কথা শুনলেই মনে হয়, আমার হেনরী আবার আমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছে।'

আমি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম ওঁর দিকে। পরে বললাম, 'আমি এমনিতেই বেশীদিন থেকে গেছি। যদি পারতাম আরো কিছুদিন থাকা যেতো। কিন্তু কতকাল আর এভাবে থাকা চলে? আমাকে তাই যেতেই হবে। তবে ভুলতে পারব না আপনাদের কথা। ভুলতে পারব না এখানকার দিনগুলো।'

উনি বললেন, 'তোমার চলে যাবার ব্যাপারে আমার হয়তো রাগ হবে, দুঃখ হবে, কিন্তু তুমি কি ভেবে দেখেছ রসেটির কি হবে? গোটা সংসারটাই আবার ঝিমিয়ে পড়বে, ঝিমিয়েই ছিল কিছুদিন। তুমি এসে প্রাণ দিয়েছ। মরা গাছের শুকনো ডালে আবার পাতা গজাল, ফুল ফুটল, কিন্তু তুমি চলে গেলে আবার সেই আগের মতই হবে। তুমি তো দেখতেই পেলে অ্যার্লাসবায়েডস কি রকম বাস্ত আর আমার মত অথর্ব মহিলার কাছে গোটা সমাজটাই বড় নিষ্ঠুর, নির্দয়।'

'কেউ যদি অপরাধ করে থাকে তাহলে তিনি আর যেই হোন আপনি নন, রসেটিও নয়,

সে হল আমি। আপনারা যা হারাবেন সে সামান্য, কিন্তু আমি হারাব অনেক বেশী। আপনারা আমার জায়গা ভরাট করে নিতে পারবেন, কিন্তু আমি পারব না আপনার স্থান ভরাট করে নিতে। রসেটিকেও ভুলতে পারব না কোনদিন। আমার মনের ভিতর ওর জায়গা কেউ পূরণ করতে পারবে না।'

'আমি তোমার সঙ্গে তর্ক জুড়তে চাই না। তবে বুঝতে পারি রসেটিকে সামলানো দায় হবে। তুমিই ওর বিষণ্ণ মুখখানায় আলো ফেলেছিলে, ওকে ঝরঝরে টাটকা করে দিয়েছিলে। এখন যদি তুমি চলে যাও, তাহলে ওকে আর বাঁচানো যাবে না। যাক, তোমার যা ভাল মনে হয় তুমি তাই করো। রসেটির কথা ভেবে তোমার যা করতে ইচ্ছে সেটাই তুমি করবে। এর চেয়ে বেশী কিছু বলার আর আমার নেই।'

'আমি কথা দিচ্ছি ও যাতে সুখী হয় তার চেষ্টা আমি করব।'

'আঃ, কি সুন্দর কথা শোনালে তুমি! আমি জানি তুমি খুবই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। জানো, রসেটি সব দিক থেকেই মুক্ত। ওর কোন বাঁধন নেই। কারো কাছে ও দায়বদ্ধ নেই। ওর নিজস্ব আয়ও রয়েছে। আশি হাজার ফ্রাংক আয় হয় ওর সম্পত্তি থেকে। তুমি নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারো ওর অবস্থা। তেওদোর, তুমি যুবক, আমি নিশ্চিত যে তুমি বিয়ে-থা করোনি। রসেটির একটা হিল্লে তুমি করো।'

'না না না। এসব কি বলছেন। আমি জানি রসেটি সুন্দরী। ওর চেহারাও যেমন সুন্দর, তেমনি সুন্দর ওর মন।'

'কিন্তু, দেখো খারাপ হতে তো সময় লাগে না। আমিও চাই ওর সঙ্গে থাকুক একজন সৎ মানুষ। আর সেই মানুষটি হতে পারো তুমিই। তোমার হাতে ঐ যে আংটিটা ঝকমক করছে তা বেশ মানাত কিন্তু রসেটির আঙুলে। আর আমি জানি রসেটি এতে খুশীই হত, আনন্দে উছলে উঠত।'

এরপর কিছুক্ষণের জন্য থামলেন বৃদ্ধা। তাকালেন আমার মুখের দিকে। নিরীক্ষণ করলেন আমার অভিব্যক্তি। জানি না, উনি আমার মুখে কি দেখলেন। জানি না, উনি তাতে খুশী হলেন কিনা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি দারুণ অস্বস্তি বোধ করছি। ভেবে পেলাম না, কি জবাব দেব। আমার তো উত্তর দেবারও কোনো উপায় নেই। আমি যে মেয়ে সে কথা আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি। অথচ একথা এখনো কাউকে বলা যাচ্ছে না, বলা যায় না। নিজের ওপর মাঝে মাঝে ধিক্কার হচ্ছে। রসেটি সুন্দরী, আশি হাজার ফ্রাংক তার আয়। এরকম উপার্জিতা সুন্দরী যে কোন পুরুষের কাছে কাঙ্ক্ষিতা।

আমি ওকে ভালবাসি। একজন মেয়ে আর একটি মেয়েকে যতখানি ভালবাসতে পারে আমি তার চেয়েও বেশী ভালবাসি। কিন্তু কেমন করে হাত থেকে রেহাই পাব সে কৌশল ভাঁজতে লাগলাম মনে মনে। ঠিক করলাম, ওর কাছে ভয়ংকর দুঃখ প্রকাশ করে বলব, বাড়ির কনিষ্ঠতম সদস্য হিসাবে আমাকে পারিবারিক কাজে বাইরে যেতে হবে, সেজন্য ওকে এখন বিয়ে করা আমার সম্ভব হবে না।

রসেটির সঙ্গেও সে রাতে আমার অনেক কথা হল। তার ফলও হল সুদূরপ্রসারী।

না, সেকথা এখন আমি তোমায় বলছি না। অন্য সময়ে তা লেখা যাবে। তবে এটুকু শুধু বলতে পারি, আমি আরো বেশী রোমাঞ্চকর হয়ে উঠলাম। যাক, আজ আর বেশী কিছু লিখছি না। এখানেই শেষ করছি এই চিঠি। তুমি আমার ভালবাসা নিও। তোমার প্রতি রইল আমার সহস্র চুম্বন। বিদায় বন্ধু বিদায় আজ। এরপর সরাসরিই তোমাকে জানাব আমার জয়দৃপ্ত জীবনকথা।

কবিতার চেয়েও রমণীয়

জানিনা তোমায় কি নামে ডাকব। তোমাকে কি বলে সম্বোধন করে চিঠি লিখব বুঝতে পারছিনা। তোমাকে তেওদোর বলব, না রোজালিন বলব ধরতে পারছি না। যাই হোক তোমার মেয়ে নামটাই আমার পছন্দ। এ নামে মধু! এ নাম বড় মায়াময়। কবিতার চেয়েও সে নাম সুন্দর, সে নাম মিষ্টি, সে নাম রমণীয়।
তোমাকে কিছু বলার আমার সাহস নেই। জানিনা, নীরবতায় আমায় ঝরে যেতে হবে কিনা। সবার অলক্ষ্যেই আমি একা একা মরে যাব কিনা। কেউ বুঝবে না আমার অবস্থা। কেউ ধরতে পারবে না কি অশান্তিতে আমার দিন কাটছে। ভিতরে ভিতরে আমি কেমন অতৃপ্ত, কেমন বিতৃষ্ণা-রাগ খুবলে খাচ্ছে আমায়, তা কাউকে বোঝাতে পারব না।
ওহ্ রোজালিন! তোমায় আমি ভালবাসি! তোমার প্রতি বিমুগ্ধ আমি। রোজালিন তুমি আমায় মোহিত করেছ, তুমি আমায় অবাক করেছ। আমার তো ভাষা নেই যা দিয়ে আমার আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করতে পারি! তোমাকে ছাড়া কাউকে কোনদিন আমি ভালবাসিনি, কাউকে প্রসংসা করিনি। তোমার কাছেই আমি বড় খোলসা হয়ে গেলাম, তোমার কাছেই আমি বড়ো বিনীত হয়ে পড়লাম। দুনিয়ার সবাইকে আমার সামনে হাঁটু গাড়তে বাধ্য করেছি, আর আজ আমি তোমার সামনেই অসহায়। তুমি আমার কাছে ভগবানের চেয়েও বড়ো হয়ে উঠলে, সবার সেরা তুমিই। তুমি না থাকলেই সব কিছু মরুভূমি হয়ে যায়, সব কিছু মৃত বলে মনে হয়, অন্ধকার; গাঢ় অন্ধকার বলে অনুভব করি। সারা পৃথিবীতে তুমিই আমার কাছে একমাত্র জনতা; তুমিই জীবন, সূর্য—তুমিই আমার সব। তোমার হাসি আমার দিবস; তোমার দুঃখই আমার রজনী। তোমার চলাফেরায় বিশ্বপ্রকৃতির লীলা; তোমার শরীরেই বিশ্বভুবনের ছন্দ। হে আমার সুন্দরী সম্রাজ্ঞী, হে আমার প্রিয়তমা; তুমিই সুন্দর; তুমিই উজ্জ্বল উত্থার। হে আমার স্বপ্ন, হে আমার বাস্তব, তুমিই শীত; তুমিই কাল মধুমাস। তুমিই আমার কল্পনা; তুমিই ঈশ্বরী।

মাত্র মাস তিনেক তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়। অথচ মনে হয় লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ তবু হিয়ে জুড়ণ না গেল। তোমাকে দেখার আগের থেকেই আমি শিখে নিয়েছি প্রেম নিবেদনের কবিতা। তোমাকে ডেকেছি, তোমাকে খুঁজেছি, হাজার হাজার মাইল ঘুরেছি তোমারই আশায়, তোমারই অন্বেষণে। তোমাকে দেখার পর থেকেই বুঝেছি তুমিই প্রেম, তুমিই প্রণাম; তুমিই কবিতা। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে আমি শিখিনি, কাউকেই ভালবাসতে জানি না। যখন তুমি অলিন্দে দাঁড়িয়ে থাকতে তোমায় মনে হত সবচেয়ে রহস্যময়ী। তোমাকেই মনে হত আমার জীবনের আলো, মনে হত ধ্রুবতারা। যখন জনঅরণ্যে পথ হারাই, তখন তুমিই সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলেছ, পথিক, তুমি কি পথ হারিয়েছ? আহ্ কী পরম রমণীয় তোমার বাহুযুগল, যেন প্রজাপতির মখমল ডানা। কী অপূর্ব তোমার চাহনি, যেন পাখীর নীড়! তোমার চুলে যেন লীলায়িত সফেন সমুদ্র! তুমি স্বপ্ন না তুমি মায়া! কবির কল্পনা হার মানে তোমার কাছে, শিল্পীর রঙ তুলি তুচ্ছ হয়ে, যায় তোমার কাছে। তুমিই ঝর্ণা, তুমিই বসন্ত, তুমিই ফুলের জলসা।

ও রোজালিন! আমি অসুখী! আমার দুঃখের শেষ নেই। কেননা তোমাকে জানার আগেই তুমি চিনে ফেলেছ আমায়।

ও তেওদোর! তোমার জন্য আমি অসুখী কেননা তুমিই তোমাকে জেনেছ। তেওদোর, যদি তুমি চাও তাহলে আমার কাছে মেলে ধরতে পারো আমার স্বপ্নের স্বর্গ। তুমিই দেবদূতী। তোমার সুন্দর হাতেই রয়েছে সোনার চাবি। কথা কও রোজালিন, কথা কও, তোমার একটা কথার উপরে নির্ভর করছে আমার নিয়তি। ঠিক করে বলো তুমি কে? তুমি কি অ্যাপোলো না অ্যাফ্রোডাইটি? ওগো ছিমছাম যুবক, তুমি সাইপ্রেস বা অ্যাডনিসের চেয়ে ঢের বেশী আকর্ষণীয়, তাবৎ মহিলার চেয়ে তুমি অনেক বেশী ভালবাসার পাত্র।

কিন্তু তুমিও মেয়ে। তোমার অঙ্গ সৌষ্ঠবেই আমি দেখেছি গ্রীক ভাস্কর্যের বিলসিত ছন্দ। তোমার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী, তোমার চালচলন সব কিছুই তোমার অজান্তে আমি নিপুণভাবে লক্ষ্য করেছি। তোমার অমন শঙ্খগ্রীব ঘাড়, কামরাঙা চামড়া, গানের কলির মতো ঠোঁট—সবই আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছি। এমন নিপুণ ভাবে আর কাউকে আমি কখনো দেখিনি, দেখার চেষ্টা করিনি। ভিতরে ভিতরে উত্তেজনা বোধ করেছি, আমি টের পেয়ে গেছি নিজেকে তুমি আড়াল করে রেখেছ দারুণ নিপুণ মুখোশে।

আজ তোমাকেই আমি সব লিখছি। হ্যাঁ তোমাকেই এসব কথা। ওগো মেয়ে, আর কত নিজেকে লুকোবার চেষ্টা করবে? পারবে না, পারবে না আর আমার কাছে ছদ্ম-বেশে হাজির হতে। আমি তোমার প্রেমে পাগল, আমি মুগ্ধ, গ্রহণ করো তুমি আমার পূজার ফুল।

মাঝে মাঝে ঈর্ষায় আমি জ্বলে পুড়ে যাই। মাথায় আগুন চড়ে। যখন কোন পুরুষ তোমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভবে কথা বলে তখন নিজেকে সামলাতে পারি না।

কেন জানো ? আমি তো তোমার মধ্যে মেয়েরই চেহারা দেখি। আমার তো মনে হয় অন্যরাও তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখে। বিচিত্র ভাবনা আমাকে কুরে কুরে খায়, কেন খায় তা অবশ্য আমি জানি না। নিজের উপর নিজে রাগ করি। কাঁদতে পারি না বলে দুঃখ হয়। তোমাকে অভিশাপ দিতে ইচ্ছা করে, তুমিই আমার সবচেয়ে প্রতিভাধর শয়তান। কিন্তু, রোজালিন, আমি আরো নিশ্চিত হয়ে গিয়েছি, তুমি মেয়ে। তুমিই সুন্দরীতমা। আমার স্বপ্নে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে তোমার রূপ। আমি দেখেছি তোমার গোলগাল কাঁধ, তোমার বাহু। আলটপ্‌কা দেখেছি তোমার স্তনের একটু অংশ। যতই তুমি তাকে সযত্নে আড়াল করবার চেষ্টা করো না কেন, আমি ঠিক তার চেহারা একটুখানি দেখে ফেলেছি তোমারই অসাবধানতায়। তুমি তা টেরও পাও নি, বুঝতেও পারো নি। তোমার কসট্যুমের ভিতর থেকে যা আমি দেখেছি তাতে বলতে পারি অমন জিনিস কোন পুরুষের থাকতে পারে না। তা শুধু যুবতী মেয়েরই সম্পদ। ভিতরে ভিতরে আমি টালমাটাল। তোমার প্রতি আমার লোভ বাড়ল, তোমার দিকেই আমি ছুটলাম। হ্যাঁ, তুমি মেয়েই। রোজালিন, ধূপের মতোই আমি ভিতরে ভিতরে পুড়ছি, অঙ্গারের মতো সবার আড়ালে জ্বলছি, আর তুমি আমার ভালবাসাকে উপেক্ষা করতে চাও। কিন্তু কেন ? আমি তো বুঝতে পারছি, যতই আমাকে উপেক্ষা করো না কেন, ভিতরে ভিতরে তুমিও আমার আকর্ষণ বিন্দু বিন্দু উপলব্ধি করছ। অবশ্য, এতে অবাক হবার কিছু নেই। তোমায় কখনো ঘৃণা করতে পারিনি, তোমাকে ভালবাসি। রোজালিন, আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে আমি বলতে চাই, তোমাকেই ভালবাসি। তুমিও কি আমাকে ভালবাসবে না ? কিছুই জানি না, শুধু ভিতরে ভিতরে আমি কাঁপছি, আর কাঁদছি। আমার অসুখ আরো বেড়ে চলছে। আমি অসুখী, আগের চেয়ে ঢের বেশী এখন আমি অসুখী। জানি, তুমি আমায় ঘৃণা করো না, বরং আমাকে বোধ হয় ভালই বাসো। আমি তো দেখেছি অভিনয়ের সময়, যখন আমি বলেছি, তোমায় যদি খুশী করতে পারতাম তখন তোমার চোখে মুখে খেলে গিয়েছিল অদ্ভুত অনুরাগের ছন্দ। তোমার চোখেই দেখেছিলাম সেদিন আশ্রয় দেবার প্রতিশ্রুতি, তোমার হাসিতেই খুঁজে পেয়েছিলাম ভবিষ্যতের ভরসা। আমি কি প্রতারিত হয়েছি ? হে ঈশ্বর ! না, সে কথা খুলে বলতে পারছি না। আজ তোমাকে এত কথা লেখার সাহস জুগিয়েছো তুমি, তুমিই দিয়েছো আমাকে নতুন পৃথিবী, জাগিয়েছো স্বপ্ন। আজ আমি স্থির বিশ্বাসেই এ সব বলছি এমন মহিলাকে যে নিয়েছিল পুরুষের ছদ্মবেশ, যে আমাকে পীড়া দিচ্ছিল সেই কস্ট্যুমে, কিন্তু এখন তার প্রতিই আমি অনুরক্ত। রোজালিন, হে আমার প্রিয়তমা, হে আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যত !

যদি তুমি আমাকে ভালও না-বাসো, আমি তোমায় করুণা করব। তুমি শুধু মনে রেখো, একজন তোমাকে ভালবাসে, তোমাকে শ্রদ্ধা করে। তার সমস্ত চিন্তা ভাবনার কেন্দ্রে তুমি, তার মর্মে মর্মে তোমারই গান, তোমারই সুর, তোমারই আলো আর তোমারই ছায়া। রোজালিন, হে আমার শুশ্রূষাকারিণী, দাও, আমাকে ওষুধ

দাও। আমি অসুস্থ, আমি অসুখী, দাও আমাকে মৃত সঞ্জীবনী সুধা। রোজালিন, এখন তুমি তোমার ভূমিকাটি পালন করো। খসিয়ে ফেলো তোমার আবরণ। চুকিয়ে দাও খোলস। সুন্দর ভৃত্য গানিমেডের পোশাক ছুঁড়ে ফেলে দাও, সাহসী নাইট রোলা দ্য বয়-এর কনিষ্ঠতম পুত্রের কাঁধে রাখো তোমার সুন্দর বাহু। রোজালিন, মুক্ত হও, মুক্ত করো এই অন্ধকারের দ্বার।

তেওদোরের বিস্ময়

জানালার সামনে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখছিলাম স্বর্গের নন্দনকানন। তাকিয়ে ছিলাম আকাশে, দেখছিলাম তারাদের জেল্লা। রাত বরাবরই সুরলোকের। অসীম আঁধার দেবসভার আস্তরণ। রাতেই দেবতা দেখা দেন আমাদের বাতায়নে। আঁধার রাতই কাজলকালো, আঁধার রাতই নিরঞ্জন। বাতাস বইছিল। নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই নিচ্ছিলাম ঘরে-আসা বাতাসের উপর রাতের ছড়ানো সুরভি। খোলা জানালা দিয়ে বাতাস ঢুকছিল ঘরের ভিতর। নিবিয়ে দিল এক সময় তা সরাইখানার আলো। সরিয়ে নিল আরেক ঘরের স্মৃতি-দীপ। অন্ধকারে ঢাকা পড়লাম। দেখলাম অতল স্পর্শ অন্ধকারের আরেক রূপ।

এলোমেলো চিন্তা আমাকে খাবলে খাচ্ছিল। দেখতে দেখতে এক সময় নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল সব। ঘুম-ঘুম ভাবে আমি প্রায় ডুবে যাচ্ছিলাম। তবু, রাতের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম নিকষ কালো পাথরের মতো। ঘরের ভিতর তখন অন্ধকারের আস্তরণ। রসেটি, বিস্মৃতিশীল-অসামান্যা রসেটি, টের পায়নি আমার উপস্থিতি। সে ভেবেছিল আমি ঘুমোতে গেছি; কেননা ঘরের প্রদীপটা নিভে গিয়েছিল অনেক আগেই। দরজা খুলে সে ঘরে ঢুকল। এত নিঃশব্দে সে ঢুকেছিল যে আমি তা টেরও পাইনি। সে যখন আমার থেকে মাত্র হাত দুয়েক দূরে তখনই অনুভব করলাম ওর উপস্থিতি। রসেটি অবাক হল। সে ভাবতেও পারেনি আমি জেগে আছি। সেই বিস্ময়-বিহ্বলতা কাটতে অবশ্য তার দেরি হল না নিজেকে সামলে নিল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই। ঘোর কাটিয়ে সে এগিয়ে এলো আমার কাছে; আলতো করে উচ্চারণ করল; 'তেওদোর, তেওদোর।'

'এ কি! এমন সময়ে আলো ছাড়াই তুমি এখানে এক-একা এসেছো; রসেটি?'

'সেটা কি ভুল হয়েছে তেওদোর? এটা কি অনুতাপের ব্যাপার? না কি এ তোমার আবেগেরই প্রকাশ? হ্যাঁ, আমিই রসেটি; সেই সুন্দরী রমণী; তোমার সঙ্গে তোমার

ঘরেই হাজির; এবং আমার যেখানে থাকা উচিত সেই আমার ঘরেও নয়। তাও আবার রাত এগারোটায় বা মাঝরাতে, সখি-সহচরী ছাড়া, এটা খুবই আশ্চর্যের, তাই না? আমিও তোমার মতই অবাক হয়ে গেছি, এবং তোমায় যে কি বলব ভেবে পাচ্ছি না।'—বলতে বলতে সে তার একটা হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরল।

আমি নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বললাম, 'রসেটি, আলোটা জ্বালতে হবে। অন্ধকার ঘর ছাড়া দুঃখের আর কিছুই হতে পারে না। উপরন্তু আমি বঞ্চিত হব আমার মহান সৌভাগ্যের হাত থেকে। রসেটি এমন ভাগ্য কজনের হয়, বলো? আমি দেখতে চাই তোমার রূপ; দেখতে চাই তোমার হৃদয় ভোলানো আলো। কিন্তু এই নিকষ কালো অন্ধকারে কেমন করে সেই রূপ আমি দেখব? তাই আলো জ্বালতে দাও, সুযোগ দাও তোমার সৌন্দর্য দেখার, নইলে তা আমার কাছে আত্মহত্যারই সামিল হবে। তোমার সৌন্দর্য দেখার থেকে বঞ্চিত হওয়া নিহত হওয়ার মতনই দুর্ভাগ্যের। আমাকে যেতে দাও রসেটি, আমাকে একটুখানি অনুমতি দাও শুকনো কাঠ আর দেশলাই নিয়ে আসতে, যাতে করে আমি একটু আলো জেলে দেখতে পাই ঈর্ষাময়ী রাত তার ছায়ার আড়ালে কি লুকিয়ে রেখেছে।'

'এ আর এমন কি। কিন্তু, আমি চাই না তুমি আমার রক্তারুণ রূপ দেখ। আমি বুঝতে পারছি, আমার গাল দুটো জ্বলে যাচ্ছে; আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি।'

সে আমাকে আরো কাছে টেনে নিল। আমার বুকের উপর মুখ রেখে যেন দম বন্ধ করল। ভয়ংকরভাবে চাপ দিতে লাগল বুকে, মুখ ঘষতে লাগল। তারপর এক সময় ওকে ক্লান্ত মনে হল। কিন্তু মুখ সরিয়ে নিল না। আমিও অবাক। বোধ-শক্তি তখন প্রায় হারিয়ে ফেলছি, যন্ত্রচালিতের মত তার ঢলে-পড়া কোঁকড়া চুলের ভিতর আঙুল চালিয়ে দিলাম। বিলি কাটতে লাগলাম। ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তি বোধ করছি, তার হাত থেকে রেহাই পাবার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও কোন কিছুর হদিশ পেলাম না। প্রতিরোধ করবার কোন ক্ষমতা আমার নেই, আমিও অসহায় হয়ে পড়েছি আচমকা পরিস্থিতিতে। রসেটিকে দেখে মনে হল যে তার অবস্থা আরো সঙ্গীন। ওর উঠবার কোন লক্ষণ নেই। আমার গায়ে তখন শুধু ড্রেসিং গাউন। নিজেকে পুরোপুরি আড়াল করে রাখতে পারিনি। ফলে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

'ভেওদোর, শোনো।' রসেটি ডাকল আমায়। খোলা জানালার ভিতর দিয়ে ঘরের ভিতর সামান্য আলো আসছে। একফালি চাঁদের আলোয় তখন ঘরের মধ্যে মায়াময় পরিবেশ। রসেটি কিছুক্ষণ থামল। কপালের দুপাশে উড়ে আসা চুলগুলো একটু ঠিক ঠাক করে নিল। তারপর বলতে লাগল, 'আমি যে কাজ করছি তাতে হয়তো তুমি অবাক হয়েছ। হয়তো ভাবছ আমি কত বেহায়া। জানি; অনেকের চোখেই কাজটা নিন্দনীয়, এর জন্যে গালাগাল খাওয়াই হয়তো আমার কপালে জুটবে। কেউবা আমার এই দুঃসাহসের জন্যে বলবে আমি বোকা, বুরবক। কিন্তু তেওদোর, আমি [illegible] পারলাম না। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারিনি। তাই, এত

রাতে একা একা, সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়েও তোমার কাছে চলে এসেছি।'
আমি কি বলব ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ইচ্ছে করছিল ওকে ভীষণ ভাবে আদর করি। ইচ্ছে করছিল ফুলের মত ওর শরীরটাকে দলে-পিষে ফেলি। কিন্তু না; সে ক্ষমতা আমার নেই। আমি বললাম; 'বলে যাও, রসেটি; তোমার কথা বলে যাও। থেমো না, থেমে থেকো না, খুকুমণি আমার।'



আবার শুরু করল রসেটি তার কথা। বলল, 'তেওদোর, তুমি খুব তাড়াতাড়িই চলে যাচ্ছ। কিন্তু, আজ, এই শেষ মুহূর্তে আর আমি সংযম রাখতে পারছি না, নিজের সঙ্গে আর লুকোচুরি করতে পারছি না। তেওদোর; আমি তোমায় ভালবাসি, হ্যাঁ, তোমাকে ভীষণ ভালবাসি। আর সেজন্যেই তোমার কাছে এসেছি এত রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে। আমি তোমার সঙ্গে সব কিছু বোঝাপড়া করতে চাই, খোলসা করতে চাই সমস্ত সম্পর্ক। সব কিছু পরিষ্কার না হলে আমি তোমাকে এখান থেকে যেতে দেব না। হয়তো, তুমি আর কোনদিনই ফিরবে না। হয়তো এখনই তোমাকে এমন ভাবে প্রথম বার ও শেষ বারের মতো দেখব। কে জানে তুমি কোথায় যাচ্ছ? কিন্তু, তুমি যেখানেই যাও, তুমি আমার মন ও প্রাণকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যেয়ো। তেওদোর, যদি তুমি থাকতে এখানে, তাহলে হয়তো আমি এত দূর আসতাম না। তোমার কাছে কাছেই আমি থাকতে চাই, তোমার সঙ্গে সঙ্গেই ছায়ার মতো নিবিড় হয়ে থাকতে চাই। তোমার স্তুতি করে, তোমার কথা শুনে, সেই সঙ্গে তোমার পাশে থাকাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হত। আমি এর চেয়ে আর বেশী কিছু দাবি করতাম না। আমার ভালবাসাকে আমি তাহলে হৃদয়ের মধ্যেই বন্দী করে রাখতাম—তুমি আমাকে একজন তোমার যথার্থই ভাল বন্ধু বলে মনে করতে।
'তুমি বলছ, তোমাকে একেবারেই চলে যেতে হবে—সেটাই আমাকে ক্লান্ত করছে। তুমিও কি ক্লান্ত নও? তেওদোর, ভেবো না আমি কোন প্রণয়াসক্ত ছায়া; যে তোমাকে অনুসরণ না করতেও পারে এবং তোমার দেহের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে পারে। তোমার পিছনে সেই একই অনুনয়কারী চোখ আর তোমার পোশাকের খুঁট ধরার জন্যে সেই একই হাত দেখতে তুমি নিশ্চয়ই খুব খুশী হতে না। আমি তোমাকে জানি,

তবে; এতে আমার আটকাবে না। তা ছাড়া তুমিও কোন অভিযোগ করতে পারো না। এটা কি তোমার নিজেরই দোষ নয় ? তোমাকে জানবার আগে আমি তো শান্ত, সুস্থির —প্রায় সুখী ছিলাম। তুমি এলে, ঝলমলে সুঠাম তরুণ, মনোহর দিবসের মতই ঝকমকে। আমার দিকে তাকিয়েছো, তোমার চোখে ছিল নতুন কিছু আবিষ্কারের বিস্ময় বিমুগ্ধতা। খুঁটে খুঁটে তুমি আমায় দেখতে, কখনো চোখের আড়াল করতে চাওনি। আমার প্রতি তোমার আনুগত্যও ছিল সীমাহীন। বিশ্বাস করো; তেওদোর, তুমি আমায় অবাক করেছো, তুমি আমায় বিচলিত করেছো। তুমি চোখের সামনে এনে দিয়েছ স্বর্গ, আবার নরকের ছায়াও তুমি দেখাতে ভুল করোনি। তোমার মধ্যেই আমি খুঁজে পেয়েছি এক অবিশ্বাস্য পুরুষ। কোন পুরুষকেই তোমার মতো এমন ধর্মপ্রাণ আর এত সাহসী দেখি নি। তোমার মুখ থেকে ঝরে পড়ে প্রতিনিয়তই কত অমূল্য রত্ন—সব কিছুই যেন জীবন্ত কবিতা হয়ে ওঠে। একেবারে ছেঁদো কথাকেও কত সুন্দর করে বলা যায়—সেই কৌশলটিই তোমার আয়ত্তে। তুমি যাই বলো, তাই হয়ে ওঠে সুন্দর, রমণীয়। যে রমণী প্রথম দর্শনেই তোমাকে ঘৃণা করেছে, সেও শেষ পর্যন্ত তোমায় ভালবেসে ফেলেছে। আর আমি; তোমাকে ভালবেসেছি প্রথম থেকেই। তুমি অবাক হচ্ছ, না ?

'কিন্তু কেন ? এতদিন এত প্রিয় হয়ে, এত গভীর ভাবে ভালবাসা পেয়েও তুমি বিস্মিত ? এটা কি স্বাভাবিক নয় ? আমি বোকা নই, অবিবেচক নই, সামান্য মাত্রায় রোমান্টিক মেয়েও আমি নই যে প্রথম দেখা পুরুষের সঙ্গেই প্রেমে পড়ে যাব। পৃথিবীটা যে কী, এবং জীবন কাকে বলে তা আমি জানি। আমি যা করছি সেটা সব মেয়েই— এমন কি সবচেয়ে পবিত্র এবং পরিণামদর্শী যে, সে-ও এতখানি করে। আচ্ছা; তেওদোর, তোমার মতলবটা কি বলো তো ? তুমি কি চাও ? আমাকে খুশী করতে কি তুমি আদৌ চাও না ? না; তেওদোর, আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। আমি বুঝতে পারছি না কেন তুমি এমন মনমরা ? আমার কোন কথায় কি তুমি আঘাত পেয়েছো ? আমার কোন আচরণে কি তুমি দুঃখ পেয়েছো ? যদি ভুলবশতঃ আমার কোন ব্যবহার বা কার্যকলাপ তোমাকে দুঃখ দেয়, তেওদোর, লক্ষ্মীটি আমার; ক্ষমা করো। আমি কি যথেষ্ট সুন্দরী নই ? না কি, আমার মধ্যে শুধু বর্জনীয় দোষই দেখলে ? তুমি হয়তো অল্পে তুষ্ট নও, হয়তো আরো বেশী বেশী করে সব চাও, কিন্তু আমি জানি, আমি সুন্দরী। আর যদি তুমি বলো, না আমি সুন্দরী নই; তাহলে বলব তুমি সত্য বলছ না। তেওদোর, আমি বুড়িয়েও যাই নি, তোমার মতই আমি তরুণ, টাটকা, তরতাজা। বিশ্বাস করো, আমি তোমায় ভালবাসি; ভীষণ ভালবাসি। তবে কেন তুমি এমন অবজ্ঞা করছ ?

'অথচ তুমি আমার কাছে কাছে থাকতেই সব সময়ে চাইতে। মাঝে মাঝেই আমার কাঁধে রাখতে তোমার হাত, কখনো তোমার হাতের মধ্যে গুঁজে নিয়ে ধীরে ধীরে চাপ দিতে; করুণ শঙ্খের মতো কখনো কখনো তাকিয়ে থাকতে আমার মুখের দিকে। আচ্ছা তেওদোর, সত্যিই কি তুমি আমায় ভালবাস না ? যদি তাই হবে তাহলে এই

সব ভনিতায় প্রয়োজন কি? ঘটনাচক্রে তুমি কি এতই নিষ্ঠুর হয়ে উঠবে যে, একটি হৃদয়ে ভালবাসার শিখা জ্বালিয়ে সেই হৃদয়কেই তুমি পরে উপহাস করবে? ওহ্, সেটা হবে চরম পরিহাস, অভক্তি, অপরাধ। সেটা হবে শুধুমাত্র বুদ্ধিভ্রংশের আনন্দ —তোমার সম্বন্ধে আমি তা বিশ্বাস করি না। তাহলে তোমার এই হঠাৎ-পরিবর্তনের কারণ কি? আমার দিক থেকে তো আমি কোনো কারণই খুঁজে পাচ্ছি না। এ রকম ভাবলেশহীনতার পিছনে কি রহস্য লুকিয়ে আছে?

তুমি যে আমাকে ঘৃণা কর না, তার প্রমাণ তুমি যথেষ্ট দিয়েছ—কারণ কেউই তার অ-ভালবাসার পাত্রীর কাছে এত সাগ্রহে প্রণয়-প্রার্থনা করে না--তা করতে গেলে একজনকে দুনিয়ার সবচেয়ে ঠগ হতে হবে। ওগো তেওদোর, আমার বিরুদ্ধে তোমার কি অভিযোগ আছে? কে তোমাকে এ রকম বদলে দিয়েছে? আমি কি দোষ করেছি? আমার প্রতি তোমার ভালবাসা যদি চলেও গিয়ে থাকে, তোমার প্রতি আমার ভালবাসাকে আমি তো হৃদয় থেকে নির্বাসন দিতে পারব না। আমি খুবই অসুখী, তেওদোর, আমার প্রতি করুণা কর। অন্ততঃ পক্ষে আমার প্রতি সামান্যতম ভালবাসাটুকুও দেখিও এবং কয়েকটা নরম কথা বলতে কার্পণ্য ক'রো না—শুধু এইটুকু প্রমাণ করার জন্য যে আমার প্রতি তোমার বিদ্বেষ অনতিক্রম্য নয়।'

এই মর্মস্পর্শী সংবেদনের সময় কান্নায় তার গলা প্রায় রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। তার দুই হাত আমার কাঁধের উপর ঘুরিয়ে, হতাশের মত তার মাথাটাকেও কিছুক্ষণ সেখানেই আশ্রয় দিল সে। এতক্ষণ সে যা বলেছে তার কোনোটাই অতিমাত্রায় ন্যায্য ছিল না এবং আমারও উত্তর দেবার মত কিছু ছিল না। আমি গলায় কোনো হতাশার সুর ফোটাতে পারলাম না—সেটা বোধহয় সেইখানে সব চেয়ে বেমানানও হত। যাদের খুব হাল্কা ভাবে নেওয়া চলে রসেটি সেই জাতের, সেই ধাঁচের নয়, এবং আবেগহেতু আমারও তখন তা করার উপায় ছিল না। একজন সুন্দরী রমণীর হৃদয় নিয়ে খেলা করার জন্য আমার নিজেকেই খুব দোষী বলে মনে হল—আমি পেলাম পৃথিবীর সবচেয়ে জীবন্ত এবং অকপট অনুতাপ। আমাকে নিরুত্তর দেখে রসেটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠবার চেষ্টা করল, ভাবাবেগে পুনরায় বসে পড়ল। তারপর সে আমাকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে, আমার মুখে তার মুখ ঠেকিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকল। সেই সজীব উপস্থিতি এবং গাল বেয়ে অঝোরধারায় চোখের জল গড়িয়ে পড়ে আমারও একটি মাত্র প্রতিক্রিয়া ঘটাল। আমার অশ্রুর সঙ্গে তার অশ্রু মিশতে বিলম্ব হলো না—সত্যিই তখন প্রচুর জল ঝরেছিল--দিন চল্লিশেক থাকলে তা থেকে বন্যাও হয়ে যেতে পারত।

চাঁদটা এসে পড়েছিল একেবারে জানালার উপরে---শুধু মাত্র একটা ক্ষীণ, নীলাভ আলো আমাদের নিস্তব্ধ ঘরটিকে দীপিত করে রেখেছিল। তার এলোচুল এবং বিষাদময় দৃষ্টি দেখে রসেটিকে মনে হচ্ছিল, স্ফটিকে গড়া দুঃখের মূর্তি।

আমি নিজে যে কিরকম দেখতে হয়েছিলাম তা বলতে পারব না, কারণ আমার সামনে কোনও আয়না ছিল না, তবে আমার মনে হয় অনিশ্চয়তার ব্যক্তিত্ব আরোপিত হলে

যেরকম হত, আমিও সেই রকমই দেখতে হয়েছিলাম। আমি সত্যিই অস্বস্তিতে পড়েছিলাম--তাই রসেটির সোহাগগুলি আমি আগের চেয়ে অনেক কোমলভাবে গ্রহণ করছিলাম।

যাই হোক, নিজেকে সংযত রাখার প্রচণ্ড চেষ্টা করে আমি রসেটিকে বললাম, আমার ঘরে এরকম সময়ে এসে এবং এতক্ষণ কাটিয়ে সে নিজের সঙ্গে কি ভয়ানক আপসেই না এসেছে। তাকে জানালাম যে, এতটা সময় এভাবে কাটানো তার পক্ষে খুব ভাল হচ্ছে না হয়তো। সকলেই জানতে পারবে যে সে নিজের ঘরে রাত্রি যাপন করেনি। আমি কথাগুলি এত নরম আর আলতো ভাবে বলেছিলাম যে হতভাগ্য রসেটি বিশ্বাস করেছিল, যে শুভ সময়টার জন্য সে এত কষ্ট স্বীকার করেছে, সেই ক্ষণ আগতপ্রায়। আমার অবস্থাটা খুবই সংকটময় হয়ে উঠল যখন দরজাটা আস্তে আস্তে কব্জার উপর ঘুরে গেল এবং ঘরের মধ্যে আবির্ভূত হল শেভ্যালিয়র অ্যালসিবায়েড্স। তার এক হাতে ধরা ছিল একটি লণ্ঠন, অন্য হাতে ছিল তরোয়াল। সোজা আমাদের দিকে এগিয়ে এসে; আলোটা বিহ্বল রসেটির নাকের কাছে এনে, পরিহাসের গলায় সে বলে উঠল, 'শুভদিন, বোন!'

হতভাগ্য রসেটির পক্ষে প্রত্যুত্তরে একটি কথা বলারও শক্তি ছিল না।

'আমার প্রিয় এবং শুদ্ধশীলা বোন, মনে হচ্ছে তুমি নিজের বুদ্ধিতে এই বিচার করেছো যে, তেওদোরের সাহচর্য তোমার নিজের থেকেও মধুর—আর তাই কি তুমি তার কাছে এসেছো? নাকি তোমার ঘরে ভুতের আবির্ভাব হয়েছে আর তাই তুমি মনে করেছো যে উক্ত সীনিয়রের আশ্রয়েই তুমি নিরাপদ হবে? চিন্তাটা ভালই। তাহলে মঁসিয়ে, সেরানেসের 'নাইট,' তুমি আমার বোনের দিকে মধুর চোখে তাকিয়েছ এবং তুমি বিশ্বাস কর যে এর সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধ নেই। আমি যদি এখন তোমার গলাটা একটু কেটে দিই, সেটা নিশ্চয়ই খুব বেমক্কা হবে না, এবং তুমি যদি ততখানি ভাল হও, তাহলে আমি তোমার প্রতি অপরিমিত ভাবে কৃতজ্ঞ থাকব। তেওদোর, তুমি আমার বন্ধুত্বের অপব্যবহার করেছো এবং তোমার চরিত্রের আনুগত্য সম্বন্ধে আমি এতদিন যে ভাল ধারণা করেছিলাম, সে জন্য আমাকে এখন অনুশোচনায় বাধ্য করছো। এটা সত্যিই খুবই দুঃখের।'

আমি সফলভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারলাম না—ঘটনাচক্রে বাস্তব চিত্রখানি হল আমার প্রতিকূল। কেই বা বিশ্বাস করত যদি আমি বলতাম সত্যিই কি ঘটেছে -যে রসেটি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার ঘরে এসেছে এবং আমি, তাকে খুশী করার চেষ্টা তো করিই নি, বরং চেয়েছি তাকে ফিরিয়ে দিতে। আমি তাকে শুধু মাত্র একটা কথাই বলতে পারতাম। আমি বললাম, 'অ্যালসিবায়েড্স, তুমি যখন চাইছ তখন আমি, লড়তে পারি।'

রসেটি অনেক আগেই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল। আমাদের কথাবার্তায় ও ভবিষ্যতের কালোছায়া দেখতে পায়। একসময় ওর দিকে তাকিয়ে দেখি ও পড়ে আছে, নিচে। সে মূর্চ্ছা গেছে। এটাই স্বাভাবিক ছিল। আমি কি করব ভেবে

পাচ্ছিলাম না। অ্যালসিবায়েড্‌সও চুপচাপ। বাধ্য হয়েই আমাকে এগোতে হল। একটা স্ফটিক কাপে জল নিয়ে এলাম। তাতে একটা মস্ত বড়ো ফুটন্ত গোলাপ ডুবিয়ে সেই গোলাপ জল ওর চোখে মুখে ছিটোতে লাগলাম। এক সময় ও চোখ মেলল— ধীরে ধীরে ওর জ্ঞান ফিরল। বিছানায় শুইয়ে দিলাম ওকে। ঘুমিয়ে পড়ল রসেটি। পাখী যেন তার নীড়েই আশ্রয় পেল।

আমরা দুজনেই হতচকিত। কি করব বুঝে উঠতে পারছি না। কিভাবে কথা বলব ঠাওর করতে পারছি না। এক সময় অ্যালসিবায়েড্‌সই ভাঙল স্তব্ধতা, নম্রকণ্ঠে সে বলল, আমাদের পক্ষে এ সময়ে আর গলা কাটাকাটিতে মেতে ওঠা যাবে না। আমি জানি লড়াইয়ে নামলে তুমি হেরে যাবে। তুমি সবে যৌবনে পা দিয়েছ, আমার মতো বলিষ্ঠও তুমি নও, ফলে লড়াইতে তুমি মারাও যেতে পারো, নিদেন পক্ষে তোমাকে এমন ঘায়েল করে ফেলব যে তোমার আদলটাই বিকৃত হয়ে যাবে। অন্যদিকে তুমি আমার কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু ভয় হল বোনটিকে নিয়ে। রসেটি হয়তো ছেড়ে কথা কইবে না, তুমি কাহিল হয়ে পড়লে ওর ভিতরে আশা ভঙ্গের বেদনা জাগবে। তাতে ক্ষিপ্ত হবে। তখন সে-ও আমার জীবন নেবার জন্য বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তুমি জানো না ওকে। তোমাকেই সে বরণ করে নিয়েছে প্রিন্স গালাওর হিসেবে। রসেটি মুক্ত, তুমিও স্বাধীন। ফলে তোমার সঙ্গে, এ মুহূর্তে চরম শত্রুতা করা আমার সাজে না। ওকে তুমি বিয়ে করো; একা একা ও আর থাকতে চাইছে না, থাকতেও পারছে না বোধ হয়।'

'এরকমটা যদি হয় তার চেয়ে আর কিছু আমার কাছে মর্যাদাসম্পন্ন নয়। যে কোনও যুবকের কাছে এটা লোভনীয় প্রস্তাব। নিজের ভাগ্যকে এর জন্যে ধন্যবাদ দিই। কিন্তু, তোমার কথা থেকে বোঝা যায় আমার কাছে তুমি বিকল্প প্রস্তাব রাখছ। তা হল, হয় দ্বৈতযুদ্ধে নেমে পড়া, নয় তো বিয়ে করা। এবং এ ক্ষেত্রে রয়েছে আমার নির্বাচনের স্বাধীনতা। আমি বরং বিয়ে করার বদলে দ্বৈতযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াটাকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছি। বেশীর ভাগ লোকই আমার এই নির্বাচনে হো হো করে হেসে উঠবে, হাসুক তারা, তবু আমি তা-ই চাই।'

এ সময়েই রসেটি একটুখানি মাথা উঠিয়ে কি যেন প্রলাপের মতো বলল। বোঝা গেল না।

'তার মানে এই নয় যে আমি মাদাম রসেটিকে ভালবাসি না, আমি তার অপরূপতাকে ভালবাসি সীমাহীন, কিন্তু আমি তাকে বিয়ে করতে চাই না; এর পিছনে আমার যুক্তিও রয়েছে অঢেল। কিন্তু তা আমি তোমাকে বলতে পারছি না। আমি জানি তোমার বোন শুদ্ধশীলা, তার বন্ধুত্বও আমার ঈপ্সিত, তবু বিয়ে করা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। মঁসিয়ে অ্যালসিবায়েডস, এইবার বলো, কখন আর কোথায় তোমার সঙ্গে লড়তে হবে।'

অ্যালসিবায়েডস ক্ষেপে উঠল। চিৎকার করে বলল, 'এখানেই, এক্ষুণি!'

'কি, রসেটির সামনেই?'

'তৈরী হও, নইলে এক্ষুণি তোমায় খুন করব।' সে তার তরোয়াল বের করে নিজের মাথার উপর দিয়ে ঘোরাতে লাগল। লক লক করে উঠল ওর তরোয়াল।

'অন্তত পক্ষে চেম্বারে চল।'

'ও সব কথা থাক। তুমি যদি তৈরী না থাকো আমি এক্ষুণি তোমার ডানা খসিয়ে দেবো, চামচিকে কোথাকার!' সে আমার দিকে খেয়ে আসতে চাইছে। রসেটি এ সময় ধড়ফড় করে উঠে পড়ে। সে ঝড়ের বেগে আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। উভয়কেই নিরস্ত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করল। দুজনেই তার প্রিয় মানুষ। কিন্তু ক্ষমতায় কুলোল না। সে আবার জ্ঞান হারাল। আমরা দুজনেই এবার মেতে উঠলাম দ্বন্দ্বে। ওর রক্তে তখন খুনের নেশা। কয়েকবারই সাপের ফণার মতো লক লক করে ওর তরোয়াল ঝলসে উঠল আমার সামনে। আমি যদি প্রতিরোধ করবার কৌশলটা ভাল মত আয়ত্ত না করতাম, বা না জানতাম, তাহলে ওর তরোয়ালের ঘায়ে অনেক আগেই কুপোকাৎ হতাম। আমি তখনো আক্রমণাত্মক হইনি। অ্যালসিবায়েডসই এক তরফা আক্রমণ হানল, আমি শুধু প্রতিরোধ করে চললাম। এরই ফাঁকে ফাঁকে অবশ্য ওকে আঘাত হানার অনেক সুযোগও আমার এসেছিল, কিন্তু নানা কারণেই আমি তখনো তার পুরো সদ্ব্যবহার করিনি, বা করতে চাইনি। এক সময় ও আমায় আঘাত হানল জোরে, সেই আক্রমণ ধাঁ করে করে খুন চাপাল আমার মাথায়, আমি ভুলে গেলাম ও রসেটিরই ভাই। পাল্টা মার দিতে শুরু করলাম। ওর ক্ষমতা ছিল না তা রোধ করার। আমার তলোয়ারের ঘায়ে ঘায়েল হল অ্যালসিবায়েডস। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগল ওর হাত থেকে, খসে পড়ল তলোয়ার, ধুপ করে পড়ে গেল সে মেঝেতে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম, মরে যায় নি তো সে? একদিকে ভাইয়ের এই অবস্থা, আর একদিকে বোনের ঐ অবস্থা। দুয়ের মাঝখানে পড়ে আমাকে আমারই মনে হল, আমি পৃথিবীর নির্দয়তম ব্যক্তি। বুঝলাম, এখন পালানো দরকার। ছুটে এলাম নিচে। দৌড়ে গেলাম আস্তাবলে। আমাকে দেখেই ঘোড়াটা লেজ নাড়তে শুরু করল, মাথাটা বাঁকাল। এগিয়ে গেলাম। ঘোড়া নিয়ে বাইরে এলাম। চেপে বসলাম ওর পিঠে। দুলকি চালে চলতে লাগল আমার বাহন। এগোতে লাগলাম সামনের দিকে। পার্ক ছাড়িয়ে ছুটতে লাগল ঘোড়া। অন্ধকার চিরে চিরে আমার ঘোড়া চলল কোন অজানার দিকে। এই হল আমার প্রথম সৌভাগ্যের ইতিহাস, আমার প্রথম দ্বৈতযুদ্ধের ইতিকথা।

যখন শহরে পেঁছিলাম তখন ভোর পাঁচটা। সবে মাত্র লোকজন জাগতে শুরু করেছে। ঘরের জানালা খুলতে শুরু করেছে গৃহস্থেরা। ঘোড়ার আওয়াজে অনেকেই ঘুম-জড়ানো চোখে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল আমাকে। আমি একটা সরাইখানার সামনে এসে থামলাম। সোজা ঢুকে গেলাম। সেখানের একটা ছেলেকে কিছু পয়সা দিতেই সে আমাকে শোবার ব্যবস্থা করে দিল। বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুমিয়ে পড়ি।

যখন ঘুম ভাঙে তাকিয়ে দেখি ঘড়িতে তখন তিনটে বাজে। এতক্ষণ ঘুমিয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছি। সারারাত ঘুমহারা অবস্থা, দ্বৈতযুদ্ধ, তারপর দ্রুত পালিয়ে আসা—সব স্মৃতি একের পর এক ভিড় করতে লাগল। অ্যালসিবায়েডসকে আমি ঘায়েল করেছিলাম, ওর ক্ষত নিয়ে চিন্তিতও ছিলাম। পরে অবশ্য জানতে পারি সে ভালই ছিল। এ খবর আমায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচায়, অন্ততঃ একজনকে মেরে ফেলার অপরাধ বোধ আমার বুকে ভার হয়ে ছিল, তা সরে গেল। যদিও জানতাম, এর জন্যে আমার কোন দায় ছিল না। লড়াই আমি চাইনি, বরং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সেদিন আমাকে লড়তে হয়েছিল, অমন অস্বস্তিকর পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে।

গ-এর কাছে ফিরে এলাম। এক সময় যাদের সঙ্গে ঘুরতাম তাদের অনেকের সঙ্গে দেখা হল। বেশ লাগলো। আবার ফিরে এলাম আমার পুরণো জীবনে। ঘুরে বেড়িয়ে কাটালাম সময়, শিকার করে পেলাম আনন্দ। জার্মানদের মতো না হলেও ভাল মতই মদ গিলতে শিখে গিয়েছি, একবারে দু-তিন বোতল গিলতে আর অসুবিধে হয় না, সরাইখানায় ইচ্ছে করেই মেয়েদের চুমু খেতে আর আমার সঙ্কোচ হয় না। এক কথায়, আমি একেবারে হালফ্যাসানের মানুষ হয়ে উঠি। অন্য দিকে মর্যাদাবোধও এত জোরালো হয়ে ওঠে যে রোজই প্রায় দ্বৈতযুদ্ধে নেমে পড়ি। দেখতে দেখতে আমার মস্তানির কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ সব সত্ত্বেও, আমার গোড়ার দিকের

কথা আমি ভুলে যাইনি। মানুষের আসল সমস্যা জানার আগ্রহে এতটুকু ভাটা পড়েনি। আমি আমার পরিকল্পনা ভাঁজতে লাগলাম। তা হচ্ছেঃ আমার এই পুরুষালি পোশাকের আড়ালে আমি সেই যুবকের সঙ্গে মিশতে চাই যার বাইরের চালচলন আমায় আনন্দ দেয়। তার সঙ্গে আমি মিশব, তাকে জানব, তার কাছে কাছেই থাকব, তারপর তার কাছ থেকে হঠাৎ উধাও হব। মাস তিন চারেক বাদে আবার ফিরে আসব। ফিরে আসব অবশ্য পুরুষের বেশে নয়, মেয়েলি পোষাকেই, মেয়ের চেহারায়। তখন দেখব সে আমায় কেমন ভালবাসে, যদি দেখি সে আমায় সত্যি-সত্যিই ভালবাসে, তাহলে তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেব, কোন কিন্তু রাখব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার ইচ্ছা ফলবতী হবে কি না জানি না। ঈশ্বরের ইচ্ছা মেয়েদের ইচ্ছা অনুসারে চলে না। তবে মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে যাই মেয়েদের কথা ভেবে। কেমন করে তারা পুরুষদের অনায়াসেই বিছানায় সঙ্গী করে নেয়। মেয়েদের আচরণ অদ্ভুত, তাদের আকৃতিও নানা রকম। বেশীর ভাগ মেয়েরই গঠন বিকৃত, ব্যস এই পর্যন্তই।

তবে, আমার মন্তব্য সব সময় বাস্তব নাও হতে পারে। আমি তো মেঘের উপর ভেসে বেড়াই, আমার পা মাটিতে থাকে না। আমার স্বপ্নে ঘোরে বীরের ছবি, বিশ্বস্ত ও সম্মানিত প্রেমিক, তাদের প্রেম-গভীরতা-আত্মত্যাগই আমাকে আকর্ষণ করে সবচেয়ে বেশী।

পুরুষের সঙ্গে থাকতে আমি দেখেছি তারা কিভাবে প্রতারিত করে মেয়েদের। কত নিষিদ্ধ ও বিচিত্র সম্পর্কই না পেতে রাখে চার দিকে। সত্যিকারের ভালবাসা পাওয়া যায় ঘোটকীর মধ্যে। আমি দেখেছি সুন্দরী মিসট্রেসের বদলে কত যুবকই না বেশ্যার কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে বসে থাকে। তবু বলব, আমি এখনো ভালবাসা চাই, প্রেম ছাড়া জীবনটাই বৃথা, কারো ভালবাসা না পেলে এ জীবনের কোন মানেই হয় না। পুরুষেরাও সব শয়তান না হলেও, কেউ দেবদূত নয়। তাদের কাছ থেকেও ওরা অনেক দূরের। ওদের মাথায় বেশী শিরোপা পরানোর কোন মানেই হয় না। ছেলেদের কাছে জীবনটা খুব হাল্কা। কয়েক বোতল মদ, আর কয়েকটি অল্প বয়সী মেয়ে পেলেই ওরা খুশী।

সত্যি কথা বলতে কি, আজ পর্যন্ত কোন পুরুষই আমায় তেমন আন্দোলিত করেনি। আমার স্নায়ুতে ছড়াতে পারেনি কোন রকম উত্তেজনা। তার না আছে মেয়ের মত সৌন্দর্য, না আছে ঈশ্বরের মত হৃদয়। আমার কাছে চিত্রকরেরাও খাঁটি নির্বোধ। সাতটা রঙের বাইরে কি তারা কিছু দেখতে পায়? বিশ্বাস করো, রসেটির মধ্যে আমি অনেক কিছু দেখতে পেয়েছিলাম। দেখতে পেয়েছিলাম ভালবাসার রূপ, তার স্বভাবটিও আমার পক্ষে বেশ মানানসই হত। কিন্তু দুর্ভাগ্য হল ওর সঙ্গে আমার ভালবাসা ঐশ্বরিক। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না।

আমার জীবনে আর একটা অ্যাডভেঞ্চার ঘটেছিল। একটা বাড়িতে আমি মাঝে মাঝেই যেতাম। সেখানে পনেরো বা তার চেয়ে কিছুটা বেশী বয়সের একটি মেয়ে ছিল।

কি অদ্ভুত সুন্দর ওর গঠন; ঝকমকে সোনার মত ওর রঙ্; চুলগুলো সোনালী আর তাতে যেন রুপোর গুঁড়ো ছড়ানো; ভুরুতে তার রামধনুকের ভঙ্গিমা; এক ধরনের ছেলেমানুষি ভাবও রয়েছে। এক কথায়; সে অপূর্ব, অদ্ভুত! পাখীর মত তার পায়ের পাতা, তার চলনে বলনে ঝরে পড়া ছন্দের সৌরভ আমায় মুগ্ধ করেছিল।
আমি ওকে নানা রকম মিষ্টি খেতে দিতাম। যখন আমি ওদের বাড়ি যেতাম, ও দৌড়ে আমায় কাছে আসত; পকেটে হাত দিয়ে দেখত কি টফি এনেছি ওর জন্যে। কিন্তু একদিন ওর আচরণে দেখলাম অস্বাভাবিকতা। সে আমার কাছে এলো না। আমি অবাক হলাম।
'আহা। নিনন, তুমি আর আসো না কেন? তুমি কি ভেবেছে, বনবন বা মিষ্টি খেলে তোমার দাঁত ক্ষয়ে যাবে?' এই বলে পকেট থেকে মিষ্টির বাক্স বের করে খুলে ধরলাম ওর সামনে। ওর চোখ দুটো বেশ চক চক করছে। ইচ্ছে হচ্ছে বোধ হয় খাবলে তুলে নেয় ওর প্রিয় মিষ্টি। আমি বললাম, 'কি হলো, আর মিষ্টি ভাল লাগে না?'
ও বলল, 'অনেক বড়ো হয়ে গিয়েছি তো।' তারপরই ঝরে পড়ল একটি দীর্ঘশ্বাস। আমি বললাম, 'এক সপ্তাহেই তুমি অনেক বড়ো হয়ে গেলে? কাছে এসো দেখি; মেপে দেখব কত বড়ো হয়েছ।'

বেশ সপ্রতিভ হল মেয়েটি। বলল; 'যতো খুশী পারো হাসো। তবে সত্যিই বলছি, আমি আর খুকুটি নই। বড়ো হয়ে যাচ্ছি।'
'বাঃ, বেশ তো সিদ্ধান্ত নিয়েছ। কিন্তু মহাশয়া জানতে পারি কি; আপনার এরূপ সিদ্ধান্তের কারণটা কি? গত সপ্তাহেও আপনি ছিলেন প্রাণবন্ত, হঠাৎ কে এমন দুর্বুদ্ধি আপনার মাথায় ঢোকাল যার ফলে আপনি খুব বুড়োটেপনা দেখাচ্ছেন?'
মেয়েটি আমার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। দেখে নিল কাছে কেউ আছে কিনা। যখন দেখল আর কেউ নেই, তখন সে কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমার একজন প্রেমিক আছে।'
'হা হতোস্মি! আমি বুঝতেই পারছিলাম না কেন মিষ্টিতে তোমার এত অরুচি এলো! এবার খোলসা হল।' তারপর আবার বললাম, 'কে সে ভাগ্যবান পুরুষ যে তোমার ভালবাসার পাত্র? আর্থার; না হেনরী?' এই দুজনের সঙ্গে ও অনেক সময় খেলা করত। ওদের কখনো কখনো স্বামী বলেও সম্বোধন করত।
সে বলল; 'না, আর্থার নয়; হেনরীও নয়। একজন ভদ্রলোক।' এরপর সে হাত দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে সেই মানুষটি বেশ লম্বা।
'অ্যাঁ! এতখানি লম্বা। তাহলে তো সাংঘাতিক ব্যাপার। তাহলে এই দীর্ঘাকার প্রেমিকটি কে?'
'আমি তোমাকে বলব সব। কিন্তু মঁসিয়ে তেওদোর, এ ব্যাপারে তুমি আর কাউকে কিন্তু ঘুণাক্ষরে কিছু বলতে পারবে না। না মাকে, না পলিকে। এমনকি তোমার

বন্ধুদেরও নয়; যে আমাকে নেহাতই ছোট্ট বলে মনে করে তাকেও নয়।'
যতদূর সম্ভব ওর আস্থা পেতে চেষ্টা করলাম। কথা দিলাম, দ্বিতীয় কেউ এসব কথা জানবে না। কাউকেই আমি কোন কথা জানাব না। তারপর ও চেয়ার ছেড়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালে, কানের কাছে মুখটা লাগিয়ে বলল যে সে হল, 'জি'।
আমাদের কথাবার্তা চলছিল বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই। কিন্তু মাঝপথেই তা থামিয়ে দিতে হল। কয়েকজন ঘরে ঢুকল। আমি এক কোণে সরে গেলাম। চুপচাপ বসে লক্ষ্য করতে লাগলাম আগন্তুকদের। নিননের মা ঘরে ঢুকলেন ওদের সঙ্গেই। তাঁর চালচলন আমার ভাল লাগল না। আগন্তুকদের সঙ্গে তাঁর খুনসুটিপনা আমাকে বিস্মিত ও বিব্রত করল। নিননকে তাঁর মা ব্যবসায়ে নামাতে চান, তার সৌন্দর্যকে করতে চান মূলধন। এত অল্প বয়সেই কোন মা যে তার সন্তানকে নরকের দরজায় পেঁছে দিতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না।
লোকগুলো এক সময়ে চলে যায়। মা-ও।
নিননের সঙ্গে শুরু হলো আমাদের কথাবার্তা। ওর কাছে জানতে চাইলাম কেন সে এই পিচ্ছিল পথে এগিয়ে যাচ্ছে?
নিনন জানাল, তার উপায় নেই।
আমি বললাম, 'এর থেকে পরিত্রাণ আছে। তুমি আমার সঙ্গে বেরোবে?'
বলাই ভাল, নিনন কখনো ভাবতে পারেনি যে আমি আসলে মেয়ে। সে আমাকে বরাবরই পুরুষ ভেবে এসেছে। নিনন রাজি হলো। সে আমার সঙ্গে পালিয়ে এলো।
এবার নিননের চেহারা বদলে ফেলা দরকার। আমি ছেলেদের পোষাক কিনলাম। ওকে তাই পরালাম। এখন আর দেখলে ওকে কেউ মেয়ে বলে ভাবতেও পারবে না। হ্যাঁ, ওকে যখন পোষাক বদলানোর কথা বলেছিলাম, তখন সে খুবই আপত্তি করেছিল, পরে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাই।
নতুন চেহারায় দারুণ লাগছিল নিননকে। সে আমার চেলা হল। যেখানেই আমি যাই সেখানেই ও সঙ্গে সঙ্গে চলে ছায়ার মতো। দুজনের মিলটাও অদ্ভুত। আমি লম্বা আর কালচে, নিনন ফর্সা আর বেঁটে। ওকে বেশ ছোট ছেলে হিসেবে মানাল। এরকম ভবঘুরে জীবনে সে খুশী হল। আমিও ওর আচরণে নিত্য মুগ্ধ। রোজই ওর ভিতরে কিছু না কিছু নতুনত্ব দেখি।
ওহ্, আমি তোমাকে রসেটির কথা বলতে ভুলে গেছি। এর মাঝখানে সে আমার আস্তানা খুঁজে বের করে একখানা লম্বা চওড়া চিঠি লিখল। সে আমন্ত্রণ জানাল একবার দেখা করার জন্য। আমি তাতে সাড়া না দিয়ে পারিনি। ফলে ওর কাছে একদিন ছুটে গেলাম। পর পর কয়েকবার ওর কাছে গেছি তারপর থেকে। ধীরে ধীরে ওর মন থেকে মুছে গেছে আমার প্রতি ওর গভীর অনুরাগ। ও বুঝতে পেরেছে, আমাকে ভালবেসে ওর লাভ নেই। আমি এখানেই পরিচিত হলাম দ্য'আলব্যয়রের সঙ্গে। দ্য'আলব্যয়রকে সে ভালবাসতে শুরু করেছে কিন্তু আলব্যয়র তাকে সেভাবে নেয়নি। অবশ্য রসেটির প্রতি তার শ্রদ্ধার অভাব নেই; কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালবাসার

একটা যে পার্থক্য আছে সেটি আর কেউ না বুঝুক, আমি বুঝি।

প্রথম প্রথম আলব্যয়র আমাকে সন্দেহের চোখে নিল। ধীরে ধীরে ওতে-আমাতে বন্ধুত্ব হল। আলব্যয়র আমার মধ্যে পেল নতুন জগতের সন্ধান। তার মনে ভিড় করল সংশয়ের মেঘ। সে ভাবতে শুরু করল, আমি সত্যিকারেরই ছেলে, না মেয়ে? আমার চলাফেরায় ওর সন্দেহ জাগল; আমার কেশগুচ্ছ ওকে সংশয়াকুল করল। ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করত আমার প্রতিটি আচরণ। আমার চোখের পাতাগুলো নাকি মেয়েদের মতোই—ও বলত। আমার ঠোঁটের কোণে যে দীপ্তি ঝলমলিয়ে উঠত তা নাকি ছেলেদের মধ্যে কখনো দেখা যায় না। এভাবেই সে বিচার করতে শুরু করে আমার প্রতিটি আচরণ, আমার অঙ্গ সংস্থান, আমার কেশগুচ্ছ আমার ওষ্ঠদ্বয়, আমার পদযুগল—সবকিছুই। আমি এ-ও টের পেলাম, রসেটির প্রতি ওর কোন আনুগত্য নেই। উল্টোদিকে, আলব্যয়র আমাকে পুরোপুরি মেয়ে বলেই ঠাওর করছে। এবং এ-ব্যাপারে যে সে নিশ্চিত তাও প্রকারান্তরে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। এ-ও বুঝলাম, আমাকে সে মনে মনে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছে। প্রায়ই আমার ঘরে আসে। কিন্তু যা বলতে চায়, মুখ ফুটে তা বলতে পারছে না। সত্যিই, মুখ ফুটে ভালবাসার কথা বলা অনেক সময় অসম্ভব। তাও বড্ড স্থূল, বড়ো অশ্লীল মনে হতে পারে। শেষ পর্যন্ত ও আমাকে একটা চিঠি লিখল। বিরাট লম্বা চিঠি, যাকে বলতে পারো পিণ্ডারিক চিঠি। আমি বুঝতে পারছিলাম না কি করব। ওকে প্রত্যাখ্যান করব; না স্বীকৃতি দেব? প্রথমটা তো ঠিক সত্য নয়। একথাও ঠিক নয় ওকে আমি ভালবাসি। হ্যাঁ, ভালবাসা বলতে আমি যা বুঝি সেই প্রেম ওকে ঘিরে আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি, তবে ওর প্রতি আমার একধরনের অনুরাগ জন্মেছে, দুর্বলতা রয়েছে। আমি যা যা চাই; যা যা পছন্দ অপছন্দ করি তা ওর মধ্যে সব নেই; তবু অনেক আছে। ওর যে জিনিসটা আমাকে মুগ্ধ করেছে তা ওর কোমলতা। অন্যান্য পুরুষের মধ্যে যে ধরনের নির্দয়তা নৃশংসতা দেখি তা ওর মধ্যে কখনো দেখিনি। রসেটির সঙ্গে ওর ব্যবহারেও দেখেছি ওর হৃদয়ের সততা। এ জিনিসটাও অনেকের মধ্যে দুর্লভ। ওর দৃষ্টির তীক্ষ্নতা ও গভীরতাকেও তারিফ জানাতে হয়। ও-ই প্রথম ধরতে পেরেছে আমার ছদ্মবেশ। ওর কাছেই প্রথম স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলাম, আমি পুরুষ নই, আমি মেয়ে। ওর এই আবিষ্কারের জন্যেও ওকে পুরস্কৃত করা দরকার। তাহলে দ্য'আলব্যয়রই হল প্রথম পুরুষ যে আমাকে দিল ভালবাসার প্রথম পাঠ। সেই শেখাল ভালবাসার অ-আ-ক-খ।

আমি ওর চিঠির উত্তর দিলাম না। বরং ওকে লুকিয়ে লুকিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। দেখলাম ও কেমন ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে। চোখে কেমন ধূসরতার ছায়া। ওকে এভাবে দেখতে দেখতে আমিও ঠিক করলাম, দূর ছাই করে ছুঁড়ে ফেলে দেব এই গাধার পোষাক, আমি হয়ে উঠব রোজালিন, তারপর ওর কাছে যাব, মেলে ধরব ময়ূরের মতো ভালবাসার পেখম, তারপর ধীরে ধীরে প্রেমের আর্তি ফুটিয়ে তুলব কণ্ঠে। ওকে বলব, 'ওগো যুবক আমি তোমার অনুরাগী, তোমাকেই আমি বারে বারে

খুঁজেছি; আর তুমি যার অনুসন্ধান করেছ দিন-রাত আমিই সেই সুন্দরী। আমিই তোমার সেই সুন্দরীতমা, যে তোমার উজ্জ্বল উদ্ধার।' মনে মনে এও ঠিক করলাম, একদিন আমি রসেটির সঙ্গে দেখা করতে যাবো আমার আসল পোষাকেই। ও যাতে কোনদিন আমাকে ভুল না বোঝে, ও যাতে মনে না করে আমি ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, তাই ওর সঙ্গে দেখা করা আমার অত্যন্ত জরুরী। ও যখন আমাকে আমার আসল চেহারায় দেখবে তখন ওর বিস্ময়ের শেষ থাকবে না। ও নিশ্চয়ই তাজ্জব বনবে।

দ্য'আলবেয়রের ক্ষতি

প্রায় এক পক্ষকাল আলব্যয়রের চিঠি পেয়েছিল তেওদোর। কিন্তু সে তার জবাব দেয়নি। আলব্যয়র হতভম্ব। সে বুঝে উঠতে পারছিল না কি করবে। তাহলে কি আলব্যয়রই ভুল করল? তেওদোর কি সতি সত্যিই পুরুষ? তাহলে সে মেয়ে নয়? আর যদি সে মেয়ে, তাহলে কি মেয়েলিসুলভ লজ্জার জন্যই চিঠির উত্তর দেয়নি?

আমাদের মতো না হলেও দ্য'আলব্যয়র মপ্যার সুন্দরী গ্রাসিওসার সঙ্গে যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন রাখল না। সে বুঝে উঠতে পারছিল না কি করবে। নানান প্রশ্নই তার মাথার মধ্যে জট পাকাচ্ছিল। নানান সম্ভাবনা, অসম্ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছিল। ফলে তাকে আরো বিষণ্ণ লাগল।

একদিন বিকেল বেলায় ঘরের মধ্যে সে বসে রয়েছে। তাকে দেখলে মনে হয় পার্কের ভিতর কোন এক বাদাম গাছ, যার পাতা লালচে হয়ে গিয়েছে, যার শিরায় শিরায় শুরু হয়ে গিয়েছে বিদায় বেলার গান। আলব্যয়রের চারিদিকেই বিষণ্ণতার কুয়াশা। একবার তার মনে হল নদীতে ঝাঁপ দেয়, কিন্তু নদীর জল এখন কালো আর ভীষণ ঠাণ্ডা। পিস্তল থাকলে হয়তো নিজেকেই গুলিবিদ্ধ করে বসত। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। ভাবল, আরেকখানা চিঠি লিখবে। হায়রে গবেট কোথাকার!

সে বসেই আছে এমন সময় একটা কোমল হাতের স্পর্শ পেল সে কাঁধে। হাত তো বাহুর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, বাহু তো কাঁধের সাথেই সম্পর্কিত হয়ে থাকে। যে হাত তার কাঁধে পড়ল সে হল তেওদোর, বা রোজালিন, বা মাদমোয়াজেল দ্য'অবিগনি, বা মাদেলিন দ্য' মপ্যার। বলাই বাহুল্য, এরকম পরিস্থিতি আমাদের কাছে খুব আকস্মিক ছিল না। আলব্যয়র চমকে উঠল। তার সামনে সুন্দরী রোজালিন। অপূর্ব লাগছে রোজালিনকে। সে এমন কিছু পরেও আসেনি যাতে তার চেহারার কোন অংশ অস্বচ্ছ থাকে। হ্রস্ব পোষাকে চমৎকার লাগছিল ওকে।

'আঃ অরল্যান্ডো, তুমি কি তোমার রোজালিনকে মনে করতে পার? না কি তুমি

তোমার প্রেম আরেডন-ঝোপে তোমার সনেটের সঙ্গেই ফেলে রেখেছ ?'
'না, রোজালিন, না। আমি আর সইতে পারছি না। আমি ক্ষত-বিক্ষত, আমি মরে যাচ্ছি, রোজালিন, আমি মরে যাচ্ছি।'
'মৃতলোকের পক্ষে তোমাকে তো বেশ ঝলমলে দেখাচ্ছে। অনেক জীবন্ত মানুষও মরা মানুষের চেয়ে কালচে মেরে যায়, ক্লান্ত—ধূসর লাগে।'
'রোজালিন, তুমি ভাবতে পারবে না, কেমন করে এ-কদিন আমি কাটিয়েছি। আচ্ছা, সেই যদি এলে তাহলে আরো আগে কেন উত্তর দিলে না ?'
'কেন ? তার পিছনে আমার তিনটি কারণ ছিল। বলব সে সব ?'
'থাক এখন। তবে আজ এসে তুমি ভালই করেছ। কালকে এলে আমায় পেতে না।'
'সত্যিই ! যাক, আমি তোমাকে তিনটি কারণের কথা বলতে চাচ্ছিলাম, এখন তার বদলে তোমাকে মিষ্টি করে তিনবার চুমু দেবো।'
এই বলে সে চুমু দিল। তারপর আলব্যয়রের হাঁটুর ওপর বসে আলব্যয়রের চুলের ভিতর দিয়ে আঙুল দিয়ে বিলি কাটতে লাগল। বলতে শুরু করল :
'বন্ধু, আমার সমস্ত নিষ্ঠুরতার অস্ত্র শেষ হয়ে গিয়েছে। এই একপক্ষ আমি আমার ভয়ংকরতাকে খুশী করেছি। আমি তোমার কাছে প্রেমের শপথ বাক্য শুনতে চাই না। আমি শুধু বলি আমাকে ভালবাসো, যেমন ঈশ্বর ভালবাসেন আমাদের। এর চেয়ে বেশী কিছু বলবার আমার নেই। যদি কোনদিন তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি হয় তাহলেও তোমার উপর কোনদিন দোষ চাপাব না, বলব না তুমি বদ্, তুমি বর্বর। তুমি আমার প্রেমের সনেট, আমি সেই সনেটেরই একটা স্তবকমাত্র। যাই ঘটুক না কেন, আমি শুধু বলতে পারি তোমার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে, আর আমি যদি তোমার মিসট্রেস না-ও থাকি, আমি তোমার বন্ধু থাকব, যেমন আছি তোমার কমরেড। আজকের রাতের জন্য আমি সরিয়ে রাখব আমার পুরুষ-পোষাক, কাল থেকে আবার তা পরতে শুরু করব। রাতে অন্তত আমাকে রোজালিন বলে স্বপ্ন দেখো। আর দিনে, সারাদিনেই আমি শুধু তেওদোর দ্য'সেরানস।'
আরো অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তা আর বলা হল না। মাঝখানেই তা থামিয়ে দিল আলব্যয়রের একটি চুমো। তার ঠোঁটের উপর সে বসিয়ে দিল দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন-চারা। আলব্যয়র এমনভাবে ঠোঁটে চুমু দিল যে উজ্জ্বলিত হল সে। তেওদোরের খোলস চুকিয়ে নারীসত্তার কামনা দেখা দিল। থরো থরো কেঁপে উঠল ওর শরীর। জিভের ডগায় জিভ লাগিয়ে দুজনেই খেলা করল, তারপর জড়িয়ে ধরল সমস্ত শক্তি উজাড় করে। ঠোঁটের উপর একটুখানি কামড়ও বসিয়ে দিল আলব্যয়র, চোখের পাতায় মুখ ঘষতে লাগল তারপর, নাকের ডগা দিয়ে ওর নাকের ডগাকেও এলোমেলো করে দিতে চাইল।
'ওগো রাণী আমার, তুমি কেন এত নিষ্ঠুর ?'
'আলব্যয়র, আমি বরাবরই শিকারিণী ডায়নাকে যে ভালবাসি। হ্যাঁ, আমি ছেলেবেলা থেকেই ছেলেদের পোষাক পরতাম। কেন পরতাম সে আজ খুলে বলা যাবে না।

শুধু জেনে রেখো, আমি পরতাম। এবং সেই পোষাকে আমাকে কেউই বুঝতে পারত না আমি ছেলে না মেয়ে। কিন্তু ধরা পড়লাম তোমার কাছেই। তুমিই প্রথম ধরতে পারলে আমার সেক্স। তবে একথা বলব, ঐ পোষাকের আড়ালে আমি অন্তত আমার কুমারীত্বকে নিপুণভাবে, পবিত্রভাবে রক্ষা করতে পেরেছি। দুঃখ হচ্ছে আজ আমি যেরকম আছি, কাল সে চেহারায় থাকব না। এ ভাবলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়।

একথা বলেই সে তার দুহাত দিয়ে আলব্যয়রের চুল ধরে ওর কপালে চুমু খেল। আলব্যয়রও ওর হাত কাছে টেনে নিল। একের পর এক, সবগুলো আঙুলেই চুমু খেল। এক সময়ে দুই অনিন্দ্য সুন্দর অবয়ব একাত্ম হয়ে গেল। মনে হল গ্রীক ভাস্কর্যের চূড়ান্ত সৌন্দর্য ছন্দায়িত হয়ে রয়েছে ওদের শরীরে। রূপ, রঙ, রেখায় সে এক মনোরম মুগ্ধতা।

রোজালিন নিজের ঘরে না ফিরে সোজা গেল রসেটির কাছে। তেওদোরের আর দেখা পাওয়া গেল না। দ্য' আলব্যয়র আর রসেটি এতে খুব অবাক হয়নি। ভোর না হতে হতেই তেওদোর তার সঙ্গী বালক-ভৃত্যটিকে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে কোথায় উধাও হয়ে যায়, রাস্তার পাশে বসে থাকা একটা লোককে শুধু জানিয়ে যায় তারা যেন ওদের জন্যে অপেক্ষা না করে। এর কিছুদিন বাদে তেওদোরের কাছ থেকে একটা চিঠি এলো। জানি, এভাবে ঘটনার শেষ করা পাঠক বা পাঠিকা কারোই মনোমত হবে না, অথচ এছাড়া আমার উপায়ও নেই।

'আলব্যয়র, তুমি খুব অবাক হচ্ছো না? আমি জানি এছাড়া কোন পথ ছিল না। আমি জানি তোমার কাছে আমিই হয়ে উঠেছিলাম তোমার স্বপ্নের প্রতিমা, সৌন্দর্যের আদর্শ। যে জিনিস আমি তোমাকে দেখিয়েছি তা আর কাউকে দেখাতে পারব না। না, দেখাতে চাইও না। তবু আমাকে সরে যেতে হল। তুমি কি একে নিষ্ঠুরতা বলবে? বলো তাতে আমার কিছু করার নেই। সংসারের বাঁধনে কোনদিন বন্ধ হব না এই ছিল অনেক দিনের ইচ্ছা। আমি দেখতে চেয়েছিলাম পুরুষদের জগৎটাকে। তুমি যাই মনে কর না কেন, আমি বলে রাখছি, তোমার ভাবনা আমি আর ভাবতে পারব না। যা হবার তাতো অনিবার্যই ঘটবে। ফলে শেষের জন্যে অপেক্ষা করে লাভ কি? মনে রেখো, মেয়েরা খাঁচা নয়। নারীকে ঘিরে যে মাধুর্যলোক বিস্তৃত তার প্রসার দেখতে ছোট হলেও অন্তরে তার গভীরতার সীমা নেই। রাগ করো না এসব কথায়। আজ সত্যিকথাই বলছি, তোমার মধ্যে হৃদয় বলে কোন পদার্থ নেই। তোমার মধ্যে আত্মাও নেই। সে কারণেই প্রেমের ক্ষেত্রে যেমন অন্যকে ভুল বোঝো, তেমনি অন্যের কাছে নিজেকে ধরা দিতে চাওনি। জানি; তুমি আমায় ভক্তি করো, আমিও তোমাকে শ্রদ্ধা করি। আমার কাছে পেঁছনোর জন্য তুমি কোনদিন চেষ্টা করোনি, আমারও নেই তোমার প্রতি কোন অভিযোগ। কোনদিক থেকেই আমি তোমায় প্রতারিত করিনি। আমি কোন কিছু নিয়েই মিথ্যে বড়াই করিনি, তা পছন্দও করি না। তোমার কল্পনার চেয়েও আমি সুন্দর কেননা একদিন দেখেছ তুমি সেই সৌন্দর্যের

অমরাবতী। যাই হোক; আজ দুজনার দুটি পথ ওগো দুটি দিকে যায় বেঁকে। তুমি একদিকের যাত্রী, আমি আরেক দিকের। হয়তো একদিন আমরা অ্যান্টিপোডসে মিশে যাবো। সেই আশা নিয়েই বেঁচে থাকা যাক। তোমাকে আমার ছাড়তে হল। এ জন্যেই তুমি হয়তো ভেবে বসেছো যে আমি তোমায় ভালবাসিনি। কিন্তু তা নয়। একদিন তার প্রমাণ পাবে। তোমার জন্যে তো আমি কিছু কম করিনি। তোমাকে নিয়ে তো আমি কম ভাবিনি। যদি কোন ব্যাপারে ঘাটতি থাকতো তাহলে আমি চলে যেতাম না, থেকে যেতাম এবং তলানি পর্যন্ত পানসে মদটুকু চেটেপুটে শেষ করতাম। একদিন দেখতে দেখতে তোমার ভিতর আসতো ক্লান্তি, নামত একঘেয়েমির সুর, সব কিছু তখন ভ্যাপসা লাগত, সব কিছুই মনে হত ছিবড়ে; সেদিন ক্লান্তির কাছে ঘটত তোমার ভালবাসার অপমৃত্যু। তারপর একদিন ভুলে যেতে। বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতাম আমি। তারপর চলত তোমার বিজয়রথ। একের পর এক বিজয় কাহিনীতে ভরে যেত তোমার জীবন-কথা। কোন একসময় তোমার বিজয়কাহিনী পড়তে পড়তে কোনদিন বিজিত-দের তালিকায় আমার নাম দেখে তুমি জিজ্ঞেস করতে, ইনি কে? আমার অন্তত এটুকু সান্ত্বনা রইল যে, তুমি অন্যজনের চেয়ে আমাকেই বেশী করে মনে রাখবে। তোমার অতৃপ্ত বাসনা এখনো ডানা মেলে আমার কাছে উড়ে আসতে চায়। আমি যেন দেখতে পাই আমার বাহুতে দুই ডানা মেলে কে যেন ছুটে আসছে। আতসবাজির আশ্চর্য রূপসজ্জায় অপরূপ হয়ে উঠছে। যেখানেই তোমার কল্পনা খেলা করে বেড়াবে সেখানেই আমি হয়ে থাকব তোমার কাম্য। যে প্রণয়িনীই তুমি পাওনা কেন, তার সঙ্গে একশয্যায় শুয়ে তুমি হয়তো কখনো কখনো আমার স্বপ্ন দেখবে। সেই রোমা-ন্টিক সন্ধ্যের মতো তুমি হয়তো আর কোনদিন অমন সদয়; অমন রোমান্টিক হতে পারবে না। যদি হও-ও, তবু কিছুমাত্রায় কম হবে, কেননা কবিতার মত ভালবাসাতেও এক জায়গায় থাকা মানে পিছিয়ে পড়া। সেই বিশ্বাস কে ধরে রাখো, তুমি ভাল করবে। তুমি করেছ প্রেমিকেরই কাজ, কিন্তু আমার ভূমিকা তার চেয়ে আলাদা। শুধু স্বতন্ত্রই নয়; দুরূহও। জানি, আমার মন থেকে কেউই তোমার স্মৃতি মুছে ফেলতে পারবে না। তারা হোক আলেকজন্ডারের উত্তরাধিকারী। তুমি যদি দুঃখ পাও; যদি বুকের ভেতর থেকে বেদনা উথলে ওঠে; এই চিঠি পুড়িয়ে ফেলো। তবে এই চিঠিই প্রমাণ যে তুমি আমাকে পেয়েছিলে, এবং তোমার মনে পড়বে যে একদিন তুমিও আমায় ঘিরে সুশ্রী স্বপ্ন দেখেছিলে। তোমার আর কোন বাধা রইল না। এখন এগোও; সামনের দিকে এগোও। দিনের আলো ফোটবার আগেই তো সেই দৃশ্য হারিয়ে গিয়েছে। অথচ সেই সময়েই স্বপ্নেরা খেলে বেড়ায়, তারা ভেসে বেড়ায়; শিঙায় ফুঁ দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। অনেকেই তোমার চেয়ে অসুখী রয়েছে। তারা একটি বারের জন্যে তাদের স্বপ্নের সুন্দরীটিকে চুমু দিতে পারেনি। এদিক থেকে অন্তত তুমি ভাগ্যবান; তুমি সুখী; কি তাই না? আমি খেয়ালী নই; উন্মাদও নই, নই আত্মাভিমানী গরবিণী। আমার সমস্ত কাজই সুপরিকল্পিত; সব কাজই রয়েছে গভীর আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। তোমাকে তাতিয়ে দেবার জন্যে আমার এই বিদায় নয়।

আমি কোন সুচতুর ছিনালও নই যে হিসেব কষেই একাজ করছি। আমাকে কোথাও খুঁজবার চেষ্টা করো না। আমাকে ফিরে পাবে না কখনো। তোমার কাছ থেকে কেমন করে সরে থাকতে হয় তা আমি জানি। সবার আড়ালে কেমন করে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হয় তাও আমার অজানা নয়। তবে তুমি এই ভেবে আশ্বস্ত হতে পারো যে তুমি আমার কাছে আর দশজনের মতো নও। তুমিই খুলে দিয়েছ আমার কাছে এক নতুন অনুভূতির জগৎ। তুমি তাই আমার প্রিয় নাম, শ্রদ্ধেয় মানুষ। মনে রেখো, মেয়েরা সেইসব অনুভূতির কথা কোনদিন ভুলতে পারে না, আমিও পারব না। যদিও তুমি আমার কাছে নেই তবু তুমি আমার চারদিকেই রয়েছ। আমার চিন্তা-ভাবনায় তুমি সততই হাজির। বরং কাছাকাছি থাকলে যতখানি জীবন্ত হয়ে আমার উপর ছায়া বিস্তার করতে তার চেয়েও তুমি আমার কাছে অনেক বেশী প্রত্যক্ষ সচল, ছন্দোময়। আমার অস্তিত্বে তোমার নিত্য আসা যাওয়া। দুর্ভাগিনী রসেটিকে সব বোলো। ওকে তোমার সাধ্যমতো সান্ত্বনা দিও। শেষ মিনতি আমার, আমাকে মনে মনে অন্তত ভালবেসো। হ্যাঁ, দুজনেই আমাকে একটু মনে রেখো। ভুলে যেও না, একদিন আমায় ঘিরেই তোমাদের ভালবাসা উথলে উঠেছিল। আমায় নিয়েই স্বপ্ন দেখেছিলে! তোমরা দুজনেই তাই মনে রেখো আমায়; কেননা দুজনেই ভালবাসতে আমাকে। আর একটাই মিনতি, চুম্বনের তপ্ত নিঃশ্বাসের মধ্যে আমার নামটা অন্তত উচ্চারণ করো। পারলে আমার নামে তোমরা একটু চুমু খেয়ো।